অলৌকিক নয়, লৌকিক

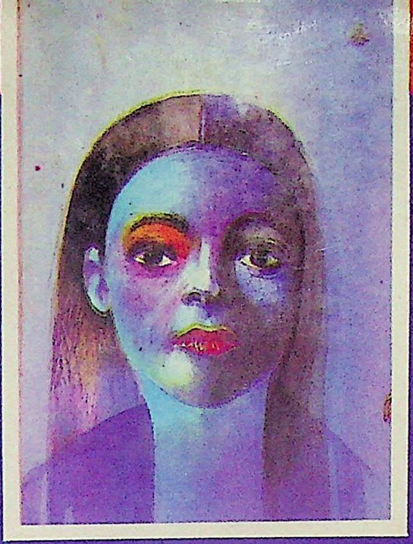

জাতিস্মর
আত্মা
অধ্যাত্মবাদ

প্রবীর ঘোষ

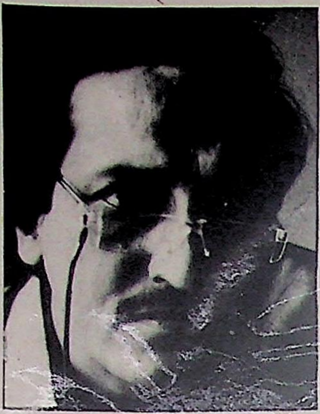

প্রবীর ঘোষ 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী-চিন্তা' আজ ব্যক্তি গন্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে ; আন্দোলিত হয়েছেন সমাজের লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী-সংস্থা, নাট্য-সংস্থা, বিজ্ঞান-ক্লাব সহ বহু সংগঠন ; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী-চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টিতে।

আন্দোলিত হয়েছে সমাজের দর্পণ সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি। আজ বহু জনপ্রিয় লেখকের গল্প-উপন্যাস-নাটকে বিরাজ করে প্রবীরের আদলে গড়া একটি চরিত্র, অথবা হাজির হয় বুজরুকি ফাঁসের কাহিনী। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে, কি সম্পাদকীয়তে বার বার ঘুরে ফিরে যে ভাবে 'যুক্তিবাদী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে, মাত্র কয়েক বছর আগেও তা ছিল অকল্পনীয়। যুক্তিবাদী-চিন্তার এই সার্বজনীনতার পিছনে রয়েছে প্রবীরের জনগণকে আন্দোলনে শামিল করার দক্ষতা, আপসহীন লড়াই, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, বলিষ্ঠ লেখনী এবং চ্যালেঞ্জ, প্রলোভন ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নিরবচ্ছিন্ন জয়।

এ-সবই তাঁকে করেছে জীবন্ত কিংবদন্তি, তাঁর সৃষ্টি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক', একটি দর্শন, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের দর্শন। প্রবীর ঘোষ 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যনির্বাহী সভাপতি, যে মানবতাবাদী সমিতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে, 'ধর্ম' হিসেবে 'মনুষ্যত্ব' লেখার আইনি অধিকার ছিনিয়ে এনেছে, যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে চিরকালের সর্বাধুনিক 'নারীবাদ'— 'মানবতাবাদী নারীবাদ'।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

[চতুর্থ খণ্ড]

যুক্তিবাদী সমিতির পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব, ৭ মার্চ ২০১০, যুবকেন্দ্র কলকাতা

অলৌকিক নয়, লৌকিক

[চতুর্থ খণ্ড]

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ALOUKIK NOY, LOUKIK Vol-IV
(Natural, not Supernatural)
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : (033) 2241-2330/(033) 2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 250.00

ISBN : 978-81-295-3271-8

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১
নবম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১০, বৈশাখ ১৪১৭
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৮, মাঘ ১৪২৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ধীরেন শাসমল

২৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথী
শ্রীদেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাচ্চু-দা)
ও
নীলাভ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু
গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি
মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা
মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন
জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (১ম, ২য়)
আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...
স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
পিংকি ও অলৌকিক বাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্বে কুইজ
The Mystery of Mother Teresa and Sainthood.

প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

সুমিত্রা পদ্মনাভন সম্পাদিত
প্রসঙ্গ প্রবীর ঘোষ

© PRABIR GHOSH 72/8 DEBINIBAS ROAD, KOLKATA700 074, INDIA.
SUMITRA PADMANABHAN P2 BLOCK-B KOLKATA 700 089
All rights reserved throught the World Reproduction in any manner
in whole or part, in Bengali or other languages, probihibited.

e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com
website : www.srai.org. • online magazine : www.thefreethinker.tk

সূচিপত্র

● কিছু কথা ১১
● প্রথম পর্ব ১৩–১০০
আত্মা : বিভিন্ন ধর্ম মতে ১৩
অধ্যায় : এক ১৫-১৮
যুক্তি কেন জাতিস্মর মানে না ১৫/নিত্য আত্মা ছাড়া জাতিস্মর হয় না ১৫/ ঈশ্বরে আত্মায় বিশ্বাস : সত্যের চেয়ে অনেক দূরে ১৬ /প্রকল্প (Hypothesis)১৬
অধ্যায় : দুই ১৯-২২
যুক্তি কেন 'আত্মা' মানে না ১৯/ 'আত্মা' নিয়ে নানা মুনির নানা মত ১৯
অধ্যায় : তিন ২৩-৩০
'আত্মা' নিয়ে বারো রাজপুত্তুরের তেরো হাঁড়ি ২৩
অধ্যায় : চার ৩১-৩৩
আদিবাসীদের আত্মা চিন্তা ৩১
অধ্যায় : পাঁচ ৩৪-৫৮
ভিড় করে আসা প্রশ্নমালা ৩৪/ সানন্দা'র দপ্তরে প্ল্যানচেটের আসর ৩৬/ ঘাড়ে চাপল প্ল্যানচেটের আত্মা ৩৯/ প্ল্যানচেটের রকমফের ৪৩/ রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট চর্চা ৪৪/ স্বামী অভেদানন্দের সামনে আত্মা লিখল শ্লেটে ৪৮/ ভূতের ভরে হাজার হাতির বল ৫০/ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া ৫১/ হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূতে পায় ৫২/ সিজোফ্রেনিয়া ও ভূতে ধরা ৫৫/ ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ : গ্রামে ফিরলেই ফিরে আসে ভূতটা ৫৬
অধ্যায় : ছয় ৫৯-৬৭
'আত্মা' নিয়ে ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মগুরু ৫৯
অধ্যায় : সাত ৬৮-৭৪
থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেতচর্চা ৬৮/ থিওসফিস্ট অ্যানি বেশান্ত ৭০
অধ্যায় : আট ৭৫-৮৬
থিওসফিস্ট বনাম জাদুকর ৭৫/ উনিশ শতকের সেরা মিডিয়ামদ্বয় ও দুই জাদুকর ৭৮/ থিওসফিস্টদের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই ৮২/ থিওসফিস্টদের প্রতি বিজ্ঞানী হাক্সলের মজার চিঠি ৮৫

অধ্যায় : নয় ৮৭-৯১

অধ্যাত্মবাদী ঋষি অরবিন্দ ৮৭

অধ্যায় : দশ ৯২-৯৫

যুক্তির নিরিখে 'আত্মা' কি অমর? ৯২

অধ্যায় : এগারো ৯৬-১০০

অসাম্যের বিষবৃক্ষের মূল শিকড় অধ্যাত্মবাদ, পরমাত্মা ও আত্মা ৯৬/ ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ : একই টাকার দুটি পিঠ ৯৮

● দ্বিতীয় পর্ব ১০১—১৮৮

সিস্টেম ভাঙতে হলে সিস্টেমকে জানতেই হবে ১০১

অধ্যায় : এক ১০২-১০৫

সিস্টেম'কে পালন ও পুষ্ট করতেই ছদ্ম যুক্তিবাদী ১০৩/ আকাশবাণীর করিশমা ১০৩

অধ্যায় : দুই ১০৬-১৫৬

'সমাজ কাঠামো' বা 'সিস্টেম'কে জানুন : সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে ১০৬/ সমাজ কাঠামো একটা গতিশীল প্রক্রিয়া ১০৭/ শোষিতদের দুর্নীতির গণভিত্তি ১০৮/ সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের চারটি পায়া ১১০/ এক: সরকার ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ১১১/ দুই : প্রশাসন-পুলিশ-সেনা ১১৫/ পুলিশ (এক) ১১৮/ পুলিশ (দুই) ১২০/ পুলিশ (তিন) ১২১/ সেনা (এক) ১২৮/ সেনা (দুই) ১২৮/ একটি নিস্তরঙ্গ ট্রেন ও কিছু সন্ত্রাসবাদী ১৩১/ সেনা (তিন) ১৩২/ তিন : প্রচার মাধম ১৩৪/ 'দূরদর্শন' জনগণের টাকায় শাসকশ্রেণির প্রচার মাধ্যম ১৩৪/ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৩৬/ হলদে সাংবাদিকতার অনন্য নজির 'ট্রেন ভ্যানিশ' ১৪১/ চার : বুদ্ধিজীবী ১৪৭/ পুরস্কার কি প্রতিভার স্বীকৃতি? ১৪৮/ বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা ১৫১/ মগজবেচা বুদ্ধিজীবী ১৫৪

অধ্যায় : তিন ১৫৭-১৬৩

নিরপেক্ষতা'র মোড়কে ১৫৭/ মুখোশ হটাও, দেখি কতটা নিরপেক্ষ ১৫৮/ বুদ্ধিজীবীদের 'নিরপেক্ষতা' ও আনুগত্য ১৫৯/ প্রধানমন্ত্রীও 'ডিসিশন মেকার' নন ১৬২

অধ্যায় : চার ১৬৪-১৬৭

নৈরাশ্য একটি সামাজিক ব্যাধি ১৬৪/ মধ্যবিত্তদের চালিত করেন বিদ্বজ্জন, বিদ্বজ্জনকে....১৬৫/ খোলামেলা মত প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলে ভেঙে যায় 'মিথ' ১৬৬

অধ্যায় : পাঁচ ১৬৮-১৭৪

Discourse (সর্বত্র আলোচনার ঢল) ১৬৮

অধ্যায় : ছয় ১৭৫-১৮৪

সাংস্কৃতিক জগতে হচ্ছেটা কী? ১৭৫/ যুক্তিবাদীদের উদ্দেশে পত্র-পত্রিকার উপদেশামৃত ১৭৮/ হ্যালডেন-সত্যেন্দ্রনাথ-রাহুল সাংকৃত্যায়নকে সিস্টেমের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা ১৮১

অধ্যায় : সাত ১৮৫-১৮৮

সব আন্দোলনই সিস্টেম ভাঙার আন্দোলন নয় ১৮৫/ অসাম্যের কাঠামো ভাঙতে ১৮৫

● তৃতীয় পর্ব ১৮৯-৩৩৬

জাতিস্মরদের নিয়ে সত্যানুসন্ধান ১৮৯

অধ্যায় : এক ১৯০-১৯৩

হিন্দু ছাড়া কেউ জন্মান্তর মানে না ১৯০

অধ্যায় : দুই ১৯৪-২০০

আত্মার অস্তিত্বে আঘাত হেনেছিল চার্বাক দর্শন ১৯৪

অধ্যায় : তিন ২০১-২০৪

তবু জাতিস্মর ঘুরে ফিরে আসে ২০১/ জাতিস্মররা হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক ২০১

অধ্যায় : চার ২০৫-২৯০

জাতিস্মর কাহিনির প্রথম পর্যায় ২০৫/ তদন্ত ১ : দোলনচাঁপা ২০৫/ তদন্ত ২ : অগ্নিশিখা ২২৭/ তদন্ত ৩ : সুনীল সাক্সেনা ২৩৯/ তদন্ত ৪ : রামু ও রাজু ২৫২/ তদন্ত ৫ : পুঁটি পাত্র ২৫৭/ তদন্ত ৬ : রাজুল ২৬৩/ তদন্ত ৭ : রিনা গুপ্ত ২৮০/ তদন্ত ৮ : রাজেশ কুমার ২৮৬

অধ্যায় : পাঁচ ২৯১-৩০১

জাতিস্মর কাহিনির দ্বিতীয় পর্যায় ২৯১/ তদন্ত ৯ : জ্ঞানতিলক ২৯১/তদন্ত ১০ : প্রদীপ ২৯৭/ তদন্ত ১১ : ত্রিশের দশকে কলকাতায় জাতিস্মর ৩০০

অধ্যায় : ছয় ৩০২-৩৩২

অবতারদের পুনর্জন্ম ৩০২/ তদন্ত ১২ : সত্য সাঁইবাবা ৩০২/ তদন্ত ১৩ : দলাই লামা ৩১০/ তদন্ত ১৪ : সপার্ষদ রামকৃষ্ণ ৩১৯

অধ্যায় : সাত ৩৩৩-৩৩৬

২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ ৩৩৩

অধ্যায় : নয় ৮৭-৯১

অধ্যাত্মবাদী ঋষি অরবিন্দ ৮৭

অধ্যায় : দশ ৯২-৯৫

যুক্তির নিরিখে 'আত্মা' কি অমর? ৯২

অধ্যায় : এগারো ৯৬-১০০

অসাম্যের বিষবৃক্ষের মূল শিকড় অধ্যাত্মবাদ, পরমাত্মা ও আত্মা ৯৬/ ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ : একই টাকার দুটি পিঠ ৯৮

● দ্বিতীয় পর্ব ১০১–১৮৮

সিস্টেম ভাঙতে হলে সিস্টেমকে জানতেই হবে ১০১

অধ্যায় : এক ১০২-১০৫

সিস্টেম'কে পালন ও পুষ্ট করতেই ছদ্ম যুক্তিবাদী ১০৩/ আকাশবাণীর করিশমা ১০৩

অধ্যায় : দুই ১০৬-১৫৬

'সমাজ কাঠামো' বা 'সিস্টেম'কে জানুন : সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে ১০৬/ সমাজ কাঠামো একটা গতিশীল প্রক্রিয়া ১০৭/ শোষিতদের দুর্নীতির গণভিত্তি ১০৮/ সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের চারটি পায়া ১১০/ এক: সরকার ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ১১১/ দুই : প্রশাসন-পুলিশ-সেনা ১১৫/ পুলিশ (এক) ১১৮/ পুলিশ (দুই) ১২০/ পুলিশ (তিন) ১২১/ সেনা (এক) ১২৮/ সেনা (দুই) ১২৮/ একটি নিস্তরঙ্গ ট্রেন ও কিছু সন্ত্রাসবাদী ১৩১/ সেনা (তিন) ১৩২/ তিন : প্রচার মাধম ১৩৪/ 'দূরদর্শন' জনগণের টাকায় শাসকশ্রেণির প্রচার মাধ্যম ১৩৪/ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৩৬/ হলদে সাংবাদিকতার অনন্য নজির 'ট্রেন ভ্যানিশ' ১৪১/ চার : বুদ্ধিজীবী ১৪৭/ পুরস্কার কি প্রতিভার স্বীকৃতি? ১৪৮/ বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা ১৫১/ মগজবেচা বুদ্ধিজীবী ১৫৪

অধ্যায় : তিন ১৫৭-১৬৩

নিরপেক্ষতা'র মোড়কে ১৫৭/ মুখোশ হটাও, দেখি কতটা নিরপেক্ষ ১৫৮/ বুদ্ধিজীবীদের 'নিরপেক্ষতা' ও আনুগত্য ১৫৯/ প্রধানমন্ত্রীও 'ডিসিশন মেকার' নন ১৬২

অধ্যায় : চার ১৬৪-১৬৭

নৈরাশ্য একটি সামাজিক ব্যাধি ১৬৪/ মধ্যবিত্তদের চালিত করেন বিদ্বজ্জন, বিদ্বজ্জনকে....১৬৫/ খোলামেলা মত প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলে ভেঙে যায় 'মিথ্' ১৬৬

অধ্যায় : পাঁচ ১৬৮-১৭৪

Discourse (সর্বত্র আলোচনার ঢল) ১৬৮

অধ্যায় : ছয় ১৭৫-১৮৪

সাংস্কৃতিক জগতে হচ্ছেটা কী? ১৭৫/ যুক্তিবাদীদের উদ্দেশে পত্র-পত্রিকার উপদেশামৃত ১৭৮/ হ্যালডেন-সত্যেন্দ্রনাথ-রাহুল সাংকৃত্যায়নকে সিস্টেমের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা ১৮১

অধ্যায় : সাত ১৮৫-১৮৮

সব আন্দোলনই সিস্টেম ভাঙার আন্দোলন নয় ১৮৫/ অসাম্যের কাঠামো ভাঙতে ১৮৫

● তৃতীয় পর্ব ১৮৯-৩৩৬

জাতিস্মরদের নিয়ে সত্যানুসন্ধান ১৮৯

অধ্যায় : এক ১৯০-১৯৩

হিন্দু ছাড়া কেউ জন্মান্তর মানে না ১৯০

অধ্যায় : দুই ১৯৪-২০০

আত্মার অস্তিত্বে আঘাত হেনেছিল চার্বাক দর্শন ১৯৪

অধ্যায় : তিন ২০১-২০৪

তবু জাতিস্মর ঘুরে ফিরে আসে ২০১/ জাতিস্মররা হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক ২০১

অধ্যায় : চার ২০৫-২৯০

জাতিস্মর কাহিনির প্রথম পর্যায় ২০৫/ তদন্ত ১ : দোলনচাঁপা ২০৫/ তদন্ত ২ : অগ্নিশিখা ২২৭/ তদন্ত ৩ : সুনীল সাক্সেনা ২৩৯/ তদন্ত ৪ : রামু ও রাজু ২৫২/ তদন্ত ৫ : পুঁটি পাত্র ২৫৭/ তদন্ত ৬ : রাজুল ২৬৩/ তদন্ত ৭ : রিনা গুপ্ত ২৮০/ তদন্ত ৮ : রাজেশ কুমার ২৮৬

অধ্যায় : পাঁচ ২৯১-৩০১

জাতিস্মর কাহিনির দ্বিতীয় পর্যায় ২৯১/ তদন্ত ৯ : জ্ঞানতিলক ২৯১/তদন্ত ১০ : প্রদীপ ২৯৭/ তদন্ত ১১ : ত্রিশের দশকে কলকাতায় জাতিস্মর ৩০০

অধ্যায় : ছয় ৩০২-৩৩২

অবতারদের পুনর্জন্ম ৩০২/ তদন্ত ১২ : সত্য সাঁইবাবা ৩০২/ তদন্ত ১৩ : দলাই লামা ৩১০/ তদন্ত ১৪ : সপার্ষদ রামকৃষ্ণ ৩১৯

অধ্যায় : সাত ৩৩৩-৩৩৬

২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ ৩৩৩

কিছু কথা

'অধ্যাত্মবাদ' কাঠামো।
তার উপর নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণের
পলেস্তারা চাপালেই 'ধর্ম'।

এ'ভাবেই গড়ে উঠেছে 'ধর্ম'
'হিন্দু', 'মুসলিম', 'খ্রিস্ট' থেকে
কুঁচোটি পর্যন্ত

'অধ্যাত্মবাদ' অর্থ—আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ
যার হাত ধরা-ধরি করে
'পরমাত্মা'—'ঈশ্বর'—'আল্লা'
যে নামেই ডাকুন...
পরলোক, পরলোকের বিচার,
কর্মফল, জন্মান্তর, ভাগ্য...
আত্মার সুতোয় টান দিলেই
জাপানি ঘুড়ির মত একে একে সারি সারি
লেজ নাড়তে নাড়তে চোখের সামনে দোল খায়।

অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে যা উঠে এসেছিল,
আজ তাই লোভী ও প্রাজ্ঞ মানুষের
কারিগরি জ্ঞানের ছোঁয়ায়
হাঙরের দাঁত।

সে আজ হাজার দু'য়েক বছর আগের কথা
অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে চার্বাকবাদ
পাথরের ভল্লের বিরুদ্ধে পাথরের ভল্ল
ঠোকা-ঠুকি, চক্‌মকি
লড়াই জমেছিল
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির।

দু'হাজার বছর পেরিয়ে অধ্যাত্মবাদের স্পনসরের ছড়াছড়ি
বহুজাতিক স্তরে,
অফুরন্ত নিত্য-নতুন অস্ত্রের আমদানি
ঢাকা আজ রাষ্ট্রীয় কিংখাবে।

সারি সারি রকেটের বিরুদ্ধে
ভল্লকে ভরসা করা বোকার শামিল
ফুটে থাক যত তাতে অতীত গৌরবের ফুল।

অসম লড়াই—

শুরুর বাঁশি বাজার আগেই
বলে দেওয়া যায়
জিতবে কোন দল।

সাম্যের জন্য, শান্তির জন্য শেষ যুদ্ধ জিততে
আত্মা আর পরমাত্মার যত অস্ত্র,
অবয়বহীন যত ভয়,
ঐতিহ্যবাহিত যত নির্বোধ ধারণার
অভিজাত ধোঁয়াশা,
সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীর
মস্তিষ্কের উপরকার তুতেনখামেনী
ধুলো,
সব কিছু;
এই সব কিছু
রেণু রেণু করে ধুলোয় মেশাতে
ভল্ল ছেড়ে
আমাদের পা রাখতে হবেই লেসার রশ্মির যুগে।

আর তাই...

প্রবীর ঘোষ ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০০৭৪

প্রথম পর্ব

আত্মা : বিভিন্ন ধর্ম মতে

অধ্যায় : এক

যুক্তি কেন জাতিস্মর মানে না

নিত্য আত্মা ছাড়া জাতিস্মর হয় না

চাল ছাড়া ভাত হয় না
আটা ছাড়া রুটি
নিত্য আত্মা ছাড়া জাতিস্মর হয় না
এ'কথাটা খাঁটি।

এই ছড়াটি রামকৃষ্ণ মিশনের এক ছাত্র আমাকে পাঠিয়ে ছড়ার তলায় লিখেছিলেন, "জাতিস্মরের অস্তিত্বই প্রমাণ করে আত্মা নিত্য, শাশ্বত, অমর"।

হ্যাঁ, সত্যি! খুব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কথাটি লিখে পাঠিয়ে ছিলেন পত্রলেখক। জাতিস্মরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে যেমন আত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয়; তেমনই আত্মা অমর নয় প্রমাণিত হলেও জাতিস্মরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

আত্মা সম্বন্ধে গীতায় বলা হয়েছে :

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভুত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়েং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

অর্থাৎ, ইনি (আত্মা) কখনও জন্মান না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করে আবার জন্মাবেন না,—এমনও নয়; ইনি জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি; শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।

এই অবস্থায় জাতিস্মরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে আত্মা বলতে বিভিন্ন ধর্মমত কি বলছে, আত্মাকে কি সংজ্ঞায় বাঁধা হয়েছে, আত্মার একাধিক জন্মের বিশ্বাস অর্থাৎ 'জন্মান্তর' প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতগুলোই বা কি বলে, এ'গুলো জেনে নেওয়া খুবই জরুরি। জরুরি ভাবার কারণ কী? সেটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস : সত্যের চেয়ে অনেক দূর

ধর্মগুরু, আধ্যত্মবাদী দার্শনিক এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ তোলেন। অভিযোগগুলোর মূল সুর এই ধরনের :—

গরুর গাড়ির চাকা থেকে মহাকাশ বিজয়—বিজ্ঞানের প্রতিটি জয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের চিন্তা—যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রয়োগ। প্রয়োগ মানেই সফলতা নয়। প্রয়োগে ব্যর্থতা আসতে পারে। আবার ব্যর্থতা মানে অনেক সময়ই সাফল্যের ধাপও; এটাও মনে রাখতে হবে।

আদিম মানুষ গতি বাড়াতে চাকা বানিয়েছে। এই চাকা বানাবার আগে একটি কল্পিত বিশ্বাস নিয়ে চিন্তার জগতে কাজ শুরু করেছিল। একটা কাঠামোর সঙ্গে দুটো বা চারটে চাকা জুড়ে দিলে কেমন হয়? একটা গৃহপালিত পশু তার পিঠে বোঝা চাপালে যতটা বোঝা বইতে পারে, চাকা লাগানো কাঠামোটা পশুর পিঠে জুতে দিলে তার চেয়ে অনেক বেশি বইবে। এই চাকার গড়নটা যে গোল করলে সুবিধে হবে, সেই ভাবনাটা, বিশ্বাসটা আগে চিন্তায় এসেছে, তার পর প্রয়োগে।

চাকা থেকে মারণ রোগের ওষুধ, মহাকাশ গবেষণা—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আগে গবেষকদের মাথায় চিন্তা এসেছে, একটা কল্পিত বিশ্বাস এসেছে। তারপর তার প্রয়োগ এসেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের কল্পিত পরীক্ষার শুরু হয় কোনও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই।

যুক্তিবাদীরা বিজ্ঞানের এই বিশ্বাস নির্ভরতাকে দোষণীয় মনে করেন না; আর আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের বেলায় যত দোষ! এ'হল যুক্তিবাদীদের কোনও পরীক্ষা না চালিয়েই বলে দেওয়া—ঈশ্বর নেই। এও তো তাঁদের বিশ্বাসের কথা।

প্রকল্প (Hypothesis)

বিজ্ঞানের 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। বিজ্ঞানের জগতে এই ধরনের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে কোনও কাজই হয় না। 'বিজ্ঞান' বলতে 'পরীক্ষা' পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত' নামের যে অতি সরলীকৃত একটি সংজ্ঞা চালু আছে, সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। বিজ্ঞানে তত্ত্ব আছে, অঙ্ক আছে, আবার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণও আছে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা বলতে শুধুমাত্র গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা বোঝায় না। বিজ্ঞানের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে একটি কল্পিত প্রস্তাবনা বা যে প্রস্তাবনা যাচাই শেষে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রস্তাবনায় পৌঁছতে অঙ্কের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি রয়েছে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা হবে, সেই বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত যে-সব গবেষণা ইতিপূর্বে হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলো জানা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সেগুলোর সঙ্গতির পরীক্ষা। প্রস্তাবনার সঙ্গতি পরীক্ষা। প্রয়োজনমতো কল্পিত

প্রস্তাবনার পরিবর্তন করা। এরপর আসে কল্পিত প্রস্তাবনা বা তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে ফলাফলের পরীক্ষা।

খুব সংক্ষেপে 'পরীক্ষা' শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করেছি। বাস্তবে অসংখ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানে তত্ত্বকে যাচাই করা হয়, তারপর আসে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রশ্ন। এ'ভাবে যাচাই করার আগে বিশ্ব বিখ্যাত বিভিন্ন গৃহীত তত্ত্বও ছিল প্রস্তাবনা মাত্র।

বিজ্ঞানের কল্পিত প্রস্তাবনার সঙ্গে জড়িত বিশ্বাসগুলো এসেছে পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও নানা গবেষণা থেকে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যের একটা সম্পর্ক থাকে।

ঈশ্বরকে নিয়ে বা পক্ষিরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞান কেন গবেষণার প্রথম পর্যায়—কল্পিত পরীক্ষায় যাবে না, তার পিছনে অবশ্যই জোরালো কারণ আছে। ঈশ্বর বা পক্ষিরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব শুধু বইয়ের লেখা আর আঁকা ছবিতে পাওয়া গেছে। তেমন লেখা ও ছবি তো হাঁসজারু, বকচ্ছপ থেকে রাক্ষস অনেক বইতেই পাওয়া যায়। কল্পনার ওপর ভিত্তি করে আর যাই হোক বিজ্ঞানের কল্পিত প্রস্তাবনায় নামতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানেরই একটি শাখা মনোবিজ্ঞানের কাছে ঈশ্বর-দর্শনের কার্য-কারণ সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিকতা থেকেই মানুষ অলীক দেখে। অলীক দর্শনে ঈশ্বর এলে মানুষটি পুজো পায়, আর অভিনেত্রী করিশমা এলে পাগল বলে গাল খায়।

যদি কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবিদার প্রকাশ্যে, নিরপেক্ষভাবে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার কাছে হাজির করতে পারতেন, শুধু তবেই বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর নিয়ে কল্পিত পরীক্ষায় নামার প্রশ্ন আসত।

ঈশ্বর নিয়ে বিজ্ঞানের কল্পিত পরীক্ষায় যাওয়ার বড় বাধা হল বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলো। মুসলিমরা যদি বলেন, ঈশ্বর নিরাকার; তো হিন্দুরা কয়েক হাজার দেব-দেবীর মূর্তি পুজো করে বুঝিয়ে দেন ঈশ্বরের আকার আছে। আবার জৈনরা মনে করেন, মানুষ জৈন ধর্মের নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে দেবতা হতে পারেন।

এ তো যত ধর্ম মত, তত বিভাজন। ঈশ্বর নিয়ে উপাসনা-ধর্মগুলোর মধ্যেকার বিরোধিতা আমাদের কাছে তাদের বিশ্বাসের বিভেদ স্পষ্ট করে দেয়। ধর্মমতগুলো নিজেদের মধ্যে বসে 'ঈশ্বর'-এর একটা সর্বধর্মমত-গ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি করার প্রাথমিক কাজটুকু আগে শেষ করে ফেলুক।

তারপর ধর্মগুরুরা নামবেন পরবর্তী বাধাগুলো অতিক্রম করতে। খুঁজে হাজির করবেন এমন ধর্মগুরু, যিনি প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাবেন। তখন বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ঈশ্বর নিয়ে কল্পিত পরীক্ষায় নামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন।

এ সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে বোঁকা বোকা চেঁচাবেন না যে—যুক্তিবাদীরা কোনও পরীক্ষা না চালিয়েই বলে ঈশ্বর নেই।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে 'ঈশ্বরে বিশ্বাস', 'আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস' এর পার্থক্য কোথায়।

এখন প্রিয় পাঠকরা নিশ্চয় মানবেন,

আত্মার অবিনশ্বরতার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ না পাওয়া গেলেও জাতিস্মর নিয়ে গবেষণা চালানো, আর 'কাকে কান নিয়ে গেল' শুনেই কানে হাত না দিয়ে কাকের পিছনে ছোটা একই ব্যাপার।

এবার আসুন, আমরা দেখি আত্মার অমরত্বের সপক্ষে কী কী যুক্তি আছে।

অধ্যায় : দুই

যুক্তি কেন 'আত্মা' মানে না

আত্মার সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত

যে আত্মার অমরত্বেই অধ্যাত্মবাদের প্রাণ-ভ্রমরা বন্দি, সেই 'আত্মা' বস্তুটি কী? অথবা আদৌ সেটা বস্তু কি না! এ'বিষয়ে অধ্যাত্মবাদের স্রষ্টা ধর্মগুরু ও ধর্মমতগুলো কী বলছে? আসুন, সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করি।

ভারতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আসুন হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসে 'আত্মা' প্রসঙ্গে কি বলছে, তাই নিয়েই আলোচনা শুরু করি।

হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' তেরোটি। বিভিন্ন সময়ে এগুলো রচিত হয়েছিল।

খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ থেকে ৪০০ বছর আগে রচিত হয়েছিল কঠ-উপনিষদ। ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার অনেক কিছুই কঠ-উপনিষদ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কঠ-উপনিষদেই আছে যম ও নচিকেতা'র বিখ্যাত কাহিনি। নচিকেতা যমের কাছে গিয়েছেন। যম তখন অন্যত্র। যমের পরিবার নচিকেতাকে বিশ্রাম ও খাদ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। যমের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত নচিকেতা খাদ্যগ্রহণে রাজি হলেন না। তৃতীয় দিনে যম বাড়ি ফিরে অতিথি নচিকেতাকে অভুক্ত দেখে খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বর দিতে চাইলেন। নচিকেতা প্রার্থনা করলেন, "মৃত ব্যক্তির বিষয়ে মানুষের সন্দেহ থাকে। কেউ মনে করেন আত্মা আছে। কেউ মনে করেন নেই। আপনি আত্মার বিষয়ে আমাকে জ্ঞান দান করুন।" যম বললেন, "এ বিষয়ে দেবগণও সন্দিগ্ধ। একে জানা সম্ভব নয়। অতএব এ বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ না করে অন্য বর প্রার্থনা করো।"

নচিকেতা যখন বার বারই যমের অনুরোধ ঠেলে রেখে জানালেন, "এই বর ছাড়া অন্যকিছু প্রার্থনা নেই।" তখন যম নচিকেতাকে উপদেশদানে স্বীকৃত হলেন।

কঠ-উপনিষদে রথের দৃষ্টান্ত এনে আত্মার অবিনশ্বরতাকে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। এবং একই সঙ্গে আত্মাকে ইন্দ্রিয়গণের চালক, অর্থাৎ মন বা চৈতন্যের

চালক বলা হয়েছে : "আত্মা রথী, শরীর রথ স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মন রশি, বুদ্ধি তার সারথি।"

এই সুর গীতাতেও লক্ষ করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, "সেই জ্ঞানীর জন্ম-মৃত্যু নেই, তিনি কোথা হতেও আসেননি, কোথাও হননি। ইনি জন্মাননি, শাশ্বত, প্রাচীন। শরীরের বিনাশ হলেও এর বিনাশ হয় না।"

এ যুগের হিন্দু দার্শনিকরা যেমন নিজেদের বিচারকে নির্ভুল প্রমাণ করতে উপনিষদের দোহাই দেন, তেমনই বৃহদারণ্যক উপনিষদও বেদের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এই প্রচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, "মনো বৈ ব্রহ্মোতি অমনসো হি কি স্যাৎ?" (৪/১/৬) অর্থাৎ "মনই ব্রহ্মা; মন-হীনের কি সিদ্ধ হতে পারে?"

উপনিষদগুলির অন্যতম মৈত্রী-উপনিষদে আত্মা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "যিনি শুদ্ধ... শান্ত... শাশ্বত, অজাত... তাঁর দ্বারাই এই শরীর চেতন-রূপে থাকে।" অর্থাৎ ... আত্মা শুধু শাশ্বতই নয়, আত্মার দ্বারাই চেতনার উৎপত্তি।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের আটান্ন সূক্তে আছে :

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসী-হ ক্ষয়ায় জীবসে।।১
যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসী-হ ক্ষয়ায় জীবসে।।২

অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

১। তোমার যে মন অতিদূরে বিবস্বনের পুত্র যমের নিকট তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, জীবিত হয়ে ইহলোকে বাস কর।

২। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে এসে বাস কর।

এখানে 'মন' ও 'আত্মা' সমার্থক।

সাংখ্যমতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ [সাংখ্যসূত্র ৫/৬৯] ও [সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—২/৪২/৪৭]

আচার্য শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, "মন হল আত্মার উপাধিস্বরূপ।"

জৈনদর্শনে বলা হয়েছে, "চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম" [ষড়দর্শনসমুচ্চয়— পৃষ্ঠা ৫০ (চৌখাম্বা সং)]

ভাট্টমীমাংসকগণ মতে "মন সর্বত্রগামী হলেও মন হল কর্ম, কর্তা হল আত্মা।" [মণিমেয়োদয়—পৃষ্ঠা ১০২, (ত্রিবান্দ্রম্ সং)]

শ্রীভাষ্যকার রামানুজের মতো "আত্মা চৈতন্যস্বরূপ।" [যতীন্দ্রমতদীপিকা, পৃষ্ঠা ৯৮ (আনন্দ আশ্রম সং)]

বৌদ্ধমতে আত্মা দেহ অতিরিক্ত নয়, দেহেরই গুণ বা ধর্ম। বৌদ্ধ মতে 'মন' বিজ্ঞানেরই একটি রূপ। বিজ্ঞান যেমন ক্ষণিক, তেমনই 'আত্মা' এবং 'মন'ও ক্ষণিক। [লঙ্গবতারসূত্র, পৃষ্ঠা ২১ (কিয়োটো সং)] এবং [সবদর্শনসংগ্রহ—বৌদ্ধ]

বুদ্ধদেব 'আত্মা' প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বলেছেন, "ভিক্ষুগণ!—'আমার আত্মা যা অনুভব করছে তা আমার একান্ত নিজস্ব ভালো-মন্দ অনুভূতির বিষয়; সেখানে আমার আত্মা নিত্য = ধ্রুব = শাশ্বত = অপরিবর্তনীয় = চিরকাল ধরে তা এ'রকমই থাকবে'—এই চিন্তা বালসুলভ মূর্খ-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ।" [মহামালুঙ্ক্যসুত্ত, মজ্ঝিমনিকায়, ১/১/২]

ব্রাহ্মধর্ম আত্মা প্রসঙ্গে বলেছে, "এই 'আমি' শরীর নই, রক্ত মাংস নই, চক্ষু কর্ণ বা কোন ইন্দ্রিয় নই। কিন্তু আমিই চক্ষুর দ্বারা দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করি, শরীরের দ্বারা সমুদয় অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করি। যে আমি এইরূপ দর্শন করি, শ্রবণ করি, চিন্তা করি, যে-আমি হিতাহিত বুঝিতেছি, যে-আমি সৌন্দর্য অনুভব করিতেছি, যে-আমি পূর্ণের দিকে যাইবার জন্য লালায়িত, সেই আমিই আত্মা।" [ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পৃষ্ঠা ৪]

অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম ইন্দ্রিয়সমূহের চালিকাশক্তিকে আত্মা বলে চিহ্নিত করেছে।

শাক্তদর্শনে বলা হয়েছে, "মন অন্য নয়, আত্মাই মন" [ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র ১৮/১১৭, ৪৭]

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বলা হয়েছে "স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই যখন মননশক্তি ধারণ করে, তখন মন বলে অবহিত হয়।" অর্থাৎ চৈতন্য বা মনই আত্মা। [যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, উৎপত্তিপ্রকরণ—১০০/১৪]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা। [বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখণ্ড সং—প্রকাশক, নবপত্র, পৃষ্ঠা ১৬২]

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিপুল জনপ্রিয় গ্রন্থ 'মরণের পারে'তে মন বা চিন্তা অথবা চৈতন্যকেই 'আত্মা' বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আত্মা বা মন মস্তিষ্কের বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়" [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-৯৮] তিনি এও বলেছেন—মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে 'মন' বা 'আত্মা' নামের কোনও জিনিস খুঁজে না পেলেই তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তুমি যখন বলবে, "আত্মা বলে কোনো জিনিস নেই, আর এটি বলা মানেই তুমি আর একটা মন বা আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিলে; কেননা তুমি যা জানছ 'মনের বা আত্মার সত্তা নেই'—তাও জানছ মন দিয়ে"... "যদি বলো যে, মনের বা আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে সেটা হবে কেমন—যেমন এখুনি যদি বলো যে তোমার জিহ্বা নেই। আমি কথা কইছি জিহ্বা ব্যবহার করে অথচ যদি বলো যে জিহ্বা নেই, তাহলে সেটাতে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।" [মরণের পারে, পৃষ্ঠা ১০১]

আর এক অধ্যাত্মবাদী নেতা, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 'মরণের পারে'

বইটির ভূমিকায় মনকেই আত্মা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণায় "ইহলোক—স্থূল ইন্দ্রিয়ের রাজ্য, আর পরলোক—সূক্ষ্ম-মনের ও মানসিক সংস্কারের রাজ্য।" [পৃষ্ঠা—এগারো]

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ আরও বলেছেন, " 'মরণের পারে' এক রহস্যময় দেশ—যে দেশে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, যে দেশে স্থূল নাই, কেবলই সূক্ষ্ম-ভাবনা ও সূক্ষ্ম-চিন্তার রাজ্য। এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য বলে"..."মনের সেখানে বিলাস—চলা, বসা, খাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, এই সমস্ত পরলোকবাসী জীবাত্মা ভোগ করে মনে তাই মনেরই সেটা রাজ্য, মনেরই সেটা লোক।" [ঐ বইয়েরই পৃষ্ঠা-এগারো]

বহু মতের থেকে নির্যাস হিসেবে
বেরিয়ে এল প্রধান চারটি মত।

এক : চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনই আত্মা।
দুই : চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মন আত্মারই কাজ-কর্মের ফল।
তিন : 'আত্মা' নিত্য, শাশ্বত।
চার : আত্মা অনিত্য, ক্ষণিক।

আসুন, পরের পর্যায়ে আমরা দেখি 'আত্মা'কে কেমন দেখতে? এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগুরু ও ধর্মীয় বিশ্বাস কী বলে?

অধ্যায় : তিন

'আত্মা' নিয়ে বারো রাজপুত্তুরের তেরো হাঁড়ি

আত্মা দেখতে কেমন? স্বামী অভেদানন্দের মতে মেঘের মত, কুয়াশার মত। [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-২৮] স্বামী অভেদানন্দ আরও এক জব্বর খবর জানিয়েছেন— বিজ্ঞানীরা এই কুয়াশার মত আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, ঐ "বস্তুটির নাম দিয়েছেন 'এক্টোপ্লাজম' বা সূক্ষ্ম-বহিঃসত্তা, এটি বাষ্পময় বস্তু এর কোন একটি নির্দিষ্ট আকার নেই। একে দেখতে একখণ্ড ছোট মেঘের মতো, কিন্তু যে-কোন একটি মূর্তি বা আকার নিতে পারে।" [মরণের পারে, পৃষ্ঠা—২৮-২৯]

স্বামী অভেদানন্দের এই বক্তব্য বিষয়ে মাত্র দুটি কথা এই মুহূর্তে বলতে চাই এক : বিজ্ঞান কুয়াশার মত আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি। দুই : বিজ্ঞান 'এক্টোপ্লাজম বলতে মেঘের মত, কুয়াশার মত কোনও বস্তুকেই নির্দেশ করে না। এক্টোপ্লাজম (Ectoplasm) বলতে বিজ্ঞানীরা কোষ-এর (cell) অভ্যন্তরস্থ 'সাইটোপ্লাজম' নামের জেলির মত বস্তুর বাইরের দিকের অংশকেই নির্দেশ করে।

আত্মাকে দেখতে যে মেঘের মত, কুয়াশার মত, এই যুক্তির সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে কার্পণ্য করেননি অভেদানন্দ। আর প্রমাণ বলতে রস-কষহীন নিছক যুক্তিজাল বিস্তার নয়, বা কোনো অপ্রত্যক্ষ প্রমাণও নয়, হাজির করেছেন একেবারে যাকে বলে 'হাতে গরম' প্রমাণ। যারই প্রমাণ পাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে, তাকে সামান্য খরচা করে এক্সরে মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছবি তুলতে হবে শুধু। ভাবছেন, ছবি তুললে কী প্রমাণিত হবে? স্বামী অভেদানন্দের কথায় বলি, "আমার দেহের কোন অংশ যদি এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখি, দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি কুয়াশাময় পদার্থকণায় পরিপূর্ণ চারিদিকে যেন তারা ঝুলছে। সুতরাং যে দেহকে আমরা জড় পদার্থ বলি আসলে সেটা জড় নয়, তা মেঘের বা কুয়াশার মতো এক পদার্থ বিশেষ।" [মরণের পারে, পৃষ্ঠা-৩২]

হায় স্বামী অভেদানন্দ !

যাকে তিনি আত্মার কুয়াশাময় রূপের অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করেছিলেন, তা যে তাঁর নিজের অজ্ঞতারই অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল!

তিনি যদি শারীর-বিদ্যার স্কুলের গণ্ডির জ্ঞানটুকুও রাখতেন, তবে জানতে পারতেন, শরীরের হাড়, মাংস, পেশি ইত্যাদির ঘনত্বের ভিন্নতার জন্য এক্স-রে'র ছবিতে সাদা-কালো রঙের গভীরতারও বিভিন্নতা দেখা যায়। আর এই রঙের গভীরতার বিভিন্নতাকেই আত্মার কুয়াশারূপের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি।

মজাটা কোথায় জানেন? এমন 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানো, বিতিকিচ্ছিরি রকম বিজ্ঞান-বিরোধী এই বইটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা রয়েছে—

মরণের পারে (বৈজ্ঞানিক আলোচনা)

আরও মজা কী জানেন—এমন বস্তাপচা ভুলে ভরা এক্টোপ্লাজমীয় ধারণাকে সগর্বে তুলে ধরলেন আর এক অধ্যাত্মবাদী লেখক নিগূঢ়ানন্দ। তিনি 'আত্মার রহস্য সন্ধান' বইটির ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও ধরা পড়েছে, যে মৃত্যুর পর দেহের চতুর্দিকে ধোঁয়াকৃতি একটা কিছু আবরণ সৃষ্টি করে থাকে। একে আধুনিক বিজ্ঞান একটোপ্লাজম নাম দিয়েছে।" জানি না এঁরা আসলে অজ্ঞ না মতলববাজ!

আত্মার কুয়াশামার্কা রূপের সরাসরি বিরোধিতা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বললেন—আত্মার কোনও রূপই নেই। তাঁর কথায়, "কোন অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত নয় বলে আত্মা অবিনশ্বর...আত্মা কোনোরূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়।",[স্বামী বিবেকানন্দ, রচনা সমগ্র, অখণ্ড, প্রকাশক : নবপত্র। পৃষ্ঠা-২৫৪]

মজাটা কী জানেন? স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইটির প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ওই জনপ্রিয় বইটির ২৮ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন—আত্মার 'ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ"। 'তিনভাগ' বলতে চার ভাগের তিনভাগ বলতে চেয়েছিলেন, এটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতে আত্মা মোটেই অমন বিশাল ওজনদার কোনও বস্তু নয়। আত্মা ত্রসরেণুস্বরূপ ভৌতিক দ্রব্য। [পদার্থতত্ত্বসার—পৃষ্ঠা ১০১ (জয়নারায়ণ তর্কালংকার, কলকাতা সং)]

'ত্রসরেণু' শব্দের অর্থ—গৃহমধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করলে তাতে যে সূক্ষ্ম পদার্থ উড়তে দেখা যায়, সেই একটি সূক্ষ্ম পদার্থ। আর একটি অর্থ হল, ছয় 'পরমাণু'

বা তিন 'দ্ব্যণুক'-তে এক ত্রসরেণু।

পূর্বমীমাংসকদের দুটি প্রধান সম্প্রদায় প্রভাকর ও ভাট্টমীমাংসক। প্রভাকর সম্প্রদায়ের মতে 'মন' অণুপরিমাণ দ্রব্যবিশেষ। [প্রকরণপঞ্জিকা—পৃষ্ঠা .১৪৯, (চৌখাম্বা সং)] ভাট্টমীমাংসকদের মতে—মন পরমাণুপরিমাণও নয়, কিন্তু সর্বব্যাপী।

আবার সাংখ্যমত কী বলছে দেখুন—মন বা বুদ্ধি কোনোটিই সর্বব্যাপী বা অণু নয়, মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট। বুদ্ধি ও মন জড় ও অনিত্য বা নশ্বর। [সাংখ্যকারিকা—পৃষ্ঠা ২০] এখানে সাংখ্যদর্শন সোজাসুজি আঘাত হেনেছে সেইসব মতের উপর, যারা বিশ্বাস করে মন বা আত্মা নিত্য বা অবিনশ্বর।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে—চিত্ত, মন বা বুদ্ধি সর্বব্যাপী।

আয়ুর্বেদের চরক সংহিতায় মনকে অণুপরিমাণ বস্তু বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্রীভাষ্যকার রামানুজনও আত্মাকে অণুপরিমাণ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—মন হল একই সঙ্গে 'কর্তা' ও 'কর্ম' অর্থাৎ, একই সঙ্গে করায় ও করে। মনের দেহগঠন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট। [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১/২/১, ১/৫/৩]

ছান্দোগ্যোপনিষৎ থেকে আমরা আর এক নতুন তথ্য জানতে পারছি। তাতে বলা হয়েছে—'মন অন্নময়'।

বলা হয়েছে, "ভুক্ত যে অন্ন, অর্থাৎ খাদ্য, তা তিনটি রূপ প্রাপ্ত হয়। স্থূল অংশ মলরূপে দেহ থেকে নির্গত হয়। মধ্যাংশ শরীরকে পুষ্ট করে এবং খাদ্যের যা সূক্ষ্মতম সারাংশ তাই মনকে পুষ্ট করে।" [ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ—৬/৫/১] এই বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণরূপে শ্বেতকেতুর কাহিনি টেনে বলা হয়েছে—শ্বেতকেতু দীর্ঘদিন কোনও খাদ্য না খেয়ে শুধুমাত্র জল পান করে থাকায় তার মন অত্যন্ত ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হওয়ায় ঋক্, সাম, যজু ইত্যাদি কোনও বেদই তাঁর মনে প্রবেশ করছিল না। আবার অন্ন গ্রহণের পর দেখা গেল সবই তাঁর মনে প্রবেশ করছে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মন খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ মতে—মন সূক্ষ্ম ও জড় পদার্থ।

মৈত্রী-উপনিষদে আছে, বালখিল্যগণ প্রজাপতির কাছে আত্মার স্বরূপ জানতে চাইলে প্রজাপতি বললেন, "দেহের একাংশে অধিষ্ঠিত অণু হতেও অণীয়ান (সূক্ষ্ম) এই আত্মাকে ধ্যান করে পুরুষ পরমত্ব লাভ করে।"

'শ্বেতাশ্বতর' তেরোটি উপনিষদের সর্বশেষ। এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ বছর থেকে ১০০ বছর। শ্বেতাশ্বতরের দ্বৈতবাদে আত্মার স্বরূপ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কেশ ও নখকে শতভাগ করে যদি প্রতিটি অংশকে পুনরায় শতভাগ করা যায়, তবে তার মাত্রা হবে আত্মার সমান।"

উপনিষদের অগ্রণী দার্শনিকগণের অন্যতম আরুণি শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিতে গিয়ে আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলছেন, সেদিকে একটু ফিরে তাকানো যাক।

আরুণি : "এই লবণখণ্ড জলপূর্ণ পাত্রে রাখো সৌম্য! কাল সকালে পাত্রটি আমার কাছে আনবে।"

পরের দিন শ্বেতকেতু পাত্রটি নিয়ে প্রবেশ করতে আরুণি বললেন, "লবণখণ্ডটি জল থেকে তুলে দাও।"

শ্বেতকেতু : "লবণ তো দেখতে পাচ্ছি না ভগবন্।"

আরুণি : "এখন জল পান করে দেখ, কেমন স্বাদ?"

শ্বেতকেতু : "লবণাক্ত।"

আরুণি : "সৌম্য? তুমি লবণ দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু লবণ জলে বিলীন হয়ে রয়েছে, তেমনই আত্মাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, অথচ আত্মা দেহে বিদ্যমান। তিনিই সেই...তৎ ত্বম্ অসি (তত্ত্বমসি)!"

আরুণির মতে আত্মার স্বরূপ, আকারহীন, অদৃশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ আত্মা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা বোঝা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। এই যেমন ধরুন, উনি একবার বলছেন, "আমি (আত্মা) চৈতন্যস্বরূপ। ধ্যান প্রণালী হলো—আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার উপায়।" [বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ—প্রকাশক : নবপত্র, পৃষ্ঠা-৫৩৫] অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। এই চৈতন্যরূপ আত্মা কেমন দেখতে? রূপহীন, আকারহীন। কারণ, "আত্মা কোনোরূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়," [ঐ বইয়ের পৃষ্ঠা—২৬২-২৬৩]। বিবেকানন্দই আবার চেতনা থেকে মনকে পৃথক করেছেন। দুটিকে ভিন্ন সত্তা বলে ধরে নিয়েছেন। এবং 'মন' বিষয়ে যে মতামত জ্ঞাপন করেছেন, তা হলো—মন উপাদান দ্বারা গঠিত। মন বিষয়ে বিবেকানন্দের মত আর সব ধর্মগুরু ও আধ্যাত্মিক নেতাদের চেয়ে একেবারে আলাদা, এবং যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক; কৌতুক-উদ্দীপকও বটে। বিবেকানন্দ মনে করতেন, "মন জড়ে রূপান্তরিত হয় এবং জড়ও মনে রূপান্তরিত হয়, এটা শুধু কম্পনের তারতম্য।" তাঁর থিয়োরি অনুসারে, "একটি ইস্পাতের পাত গড়ে তাকে কম্পিত করতে পারে এ রকম একটা শক্তি এতে প্রয়োগ কর। তারপর কি ঘটবে? যদি একটা অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, প্রথম তুমি শুনতে পাবে একটি শব্দ—একটি গুন্‌গুন্ শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত করো, দেখবে ইস্পাতের পাতটি আলোকময় হয়ে উঠছে। শক্তি আরও বাড়িয়ে দাও, ইস্পাতটি

স্বামী বিবেকানন্দ

একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইস্পাতটি মনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।" [ঐ বইয়েরই পৃষ্ঠা—২৬৪]

বিবেকানন্দের এইজাতীয় বক্তব্যগুলো থেকে আমরা কী কী জানতে পারলাম একটু দেখা যাক।

এক : চেতনাই আত্মা, যাঁ কোনও উপাদানে গঠিত নয়, তাই শরীর নেই।

দুই : মন চেতনার থেকে ভিন্ন কিছু। মনের সূক্ষ্ম শরীর আছে।

তিন : স্রেফ ইস্পাতে কম্পন সৃষ্টি করেই আলো তৈরি করা যায়। (বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে সরকার একটু মনোযোগ দিলে বিদ্যুৎ ঘাটতির একটা সুরাহা হতে পারে।)

চার : এইচ জি ওয়েল্স-এর 'দি ইন্ভিজিবল্ ম্যান' উপন্যাসটি পড়ে যাঁরা ভেবেছিলেন—অদৃশ্য হওয়া এবং দৃশ্যতে ফিরে আসা গল্পেই সম্ভব, তাঁদের সমস্ত চিন্তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে বিবেকানন্দের এই যুগান্তকারী কম্পনের দ্বারা অদৃশ্য করার তত্ত্ব।

পাঁচ : 'চিন্তা, চেতনা বা মন মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের ক্রিয়াবিক্রিয়ার ফল'—শারীর বিজ্ঞানের এই জাতীয় সিদ্ধান্ত (তা যতই কেন না বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পর গৃহীত হোক) বিলকুল ভুল।

ছয় : মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের সাহায্য ছাড়াই স্রেফ লোহা-লক্কড়কে কাজে লাগিয়েই মন তৈরি সম্ভব। (এমনটা সত্যি হলে, পাষাণকে নাড়িয়েও মন তৈরি সম্ভব হতেই পারে? সম্ভবত কেউ এমনটা তৈরিও করেছিলেন। তাই থেকেই 'পাষাণ হৃদয়' কথাটা হয় তো চালু হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য উদ্যমী গবেষকরা এগিয়ে আসতে পারেন।)

বিবেকানন্দের এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ ছাড়া মন তৈরির বৈপ্লবিক-তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণ করতে উদ্যোগ নিতে পারেন সেইসব বিবেকানন্দভক্তরা, যাঁরা বিবেকানন্দকে 'বিজ্ঞানীদেরও বিজ্ঞানী' বলে সোচ্চার-ঘোষণা রাখেন নামী-দামি পত্র-পত্রিকায় ও ঝাঁ-চক্চক্ সেমিনারে।

এইসব প্রাজ্ঞ ভক্তরা এই বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার জন্য বিবেকানন্দভক্ত বিজ্ঞান পেশার মানুষদের বাছতে পারেন। এই পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র ও ডাক্তারদের যৌথ উদ্যোগকে কাজে লাগাতে পারলে আরও ভাল হয়। ইস্পাতের পাত তৈরি করা, পাতে কম্পনের সৃষ্টি করা এবং 'মন' তৈরি হওয়ার পর ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাম

(E.E.G) মেশিনের সাহায্যে ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ বা ট্রেসিংটা তৈরি করে ফেলা। আর তাহলেই বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায়—'মন' এ ভাবেও তৈরি করা সম্ভব। তারপর কী হবে? একজন ভারতীয় হিসেবে ভাবতে গেলেই উত্তেজনায় গা শির্‌শির্ করে উঠছে! গবেষণায় নিযুক্ত গোটা ভারতীয় দলটারই নোবেল পুরস্কার বাঁধা! এবং বিবেকানন্দের মরণোত্তর ভারতরত্ন!

'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত একটি বই 'মন ও তার নিয়ন্ত্রণ' লেখক : স্বামী বুধানন্দ। অনুবাদক : স্বামী ঈশাত্মানন্দ। প্রকাশকাল ১৯৮৬। টাটকা তাজা এই বইটিতে বেদান্ত মতে মন কী—সে বিষয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, "মন জড় ও আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ"।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী বারাণসীর 'কালিকা বেদান্ত আশ্রম' এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বীকৃত বেদান্ত-পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থ 'সত্য দর্শন' এর ১০৯ পৃষ্ঠায় 'মনস্তত্ত্ব' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন, "মনে কর আমি একটি শব্দ শুনিতেছি; এখানে বাইরের কর্ণ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কস্থ ইন্দ্রিয়ে পৌঁছাইল, তৎপর এই ইন্দ্রিয় উহা বহন করিয়া মনের নিকট পৌঁছাইল। এই মনও কেবল বাহক মাত্র, মন এই শব্দকে আরও ভিতরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইল। তখন বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে যে, উহা কিসের শব্দ এবং উহা ভাল কি মন্দ। এই বুদ্ধি আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া সর্বসাক্ষীস্বরূপ সকলের প্রভু আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিল। তখন পুনরায় যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্যন্ত্রে আসিল,—প্রথম বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে, তৎসহ বহির্যন্ত্র কর্ণে।"

১১০ পৃষ্ঠায় বলেছেন—মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম শরীর আছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল ১১৮ পৃষ্ঠাতেই কালিকানন্দ স্বামী লিখছেন—আত্মাই চিত্ত।

মোদ্দা কথায় কালিকানন্দ স্বামীর মনে হয়েছে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত বা চেতনা সবই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এবং চিত্ত বা চেতনাই আত্মা। মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম শরীর আছে। কালিকানন্দ স্বামীর কেন এমন অদ্ভুত সব ভাবনাকে সত্যি বলে মনে হয়েছে? তিনি কী কী পরীক্ষা চালিয়ে এমন ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন? কালিকানন্দ স্বামীর ভক্তদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও ধর্মগুরুর মুখের কথাকে বিজ্ঞানের উপর স্থান দিয়েছিলেন। অন্ধভাবে মেনে নিয়েছিলেন। আসলে এইসব বিজ্ঞান পেশার মানুষেরাও ভাল ছাত্র হওয়ার সুবাদে অনিশ্চিত এই সমাজে তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত আয়ের আশায় বিজ্ঞানকে নিয়ে পড়াশুনো করেছেন এবং শেষে বিজ্ঞানকে নিছক পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে এই পেশা জমির দালালি বা আলু-পটলের দোকানির পেশার মতই একটা পেশা মাত্র। এর বাড়তি কিছু নয়।

তামাম ভারতের আর এক দিকপাল অধ্যাত্মবাদী নেতা শ্রীশ্রীসীতারামদাস

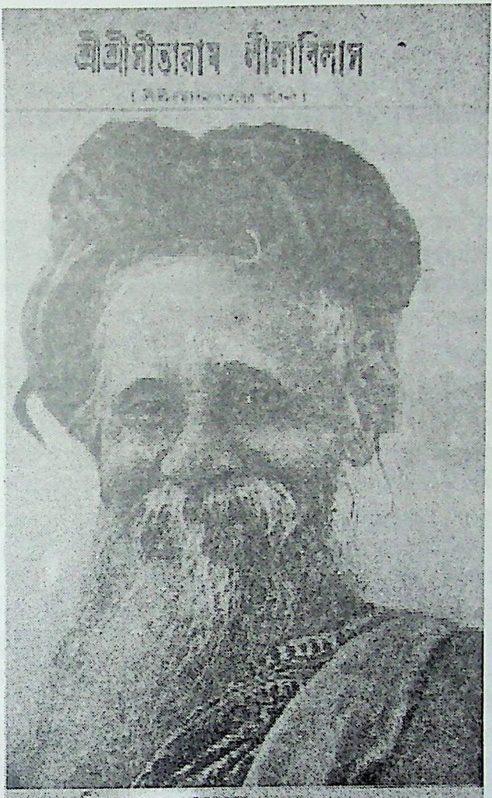

ওঙ্কারনাথজির ভক্ত সংখ্যা বিপুল, যাঁরা তাঁকে অবতার জ্ঞানেই পুজো করেন। তিনি একাধিক চিঠিতে ভক্তদের কাছে মত প্রকাশ করেছেন, "প্রত্যেকের আত্মা জাগ্রতে দক্ষিণ চক্ষুতে, স্বপ্নকালে মনে ও সুষুপ্তিকালে (গভীর নিদ্রাকালে) হৃদয়ে অবস্থান করে"। [শ্রীশ্রীসীতারাম লীলাবিলাস (শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেবের জীবনী), কিঙ্কর আত্মানন্দ, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৩]

এই মতামত থেকে আমরা এটুকু অন্তত জানতে পারলাম, আত্মা স্বয়ং মন নয়। আত্মার অবস্থান কখনও দৃষ্টিতে, কখনও মনে, কখনও বা হৃদপিণ্ডে। আমরা

এটা ধরে নিলে বোধহয় ভুল হবে না, ওঙ্কারনাথজী মস্তিষ্কস্নায়ুকোষের পরিবর্তে হৃদপিণ্ডকেই ভাবাবেগ বা চেতনার উৎপত্তিস্থল ধরে নিয়েই এমন মত প্রকাশ করেছিলেন। যার ডান চোখ নেই, তার আত্মা মানুষটির জাগ্রতকালে কোথায় থাকে? এ'বিষয়ে তিনি কোথাও আলোকপাত করেননি। তাঁর এই অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে তাঁর ভক্ত-বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা উচিত! আমরা তাঁদের পথ চেয়ে রইলাম।

ব্রাহ্মধর্মে বলা হয়েছে—আত্মা নিরাকার। কখনও কোনও আকার ধারণ করে না। মৃত্যুর পর আত্মার প্ল্যানচেটে আসা, ভূত হয়ে ভর করা এ'সব কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করে না ব্রাহ্ম ধর্ম। তারা মনে করে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা পরমব্রহ্মে বা ঈশ্বরে আশ্রয় নেয়।

গত ১৯৯২ সাল থেকে একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন এই বাংলার বুকে দস্তুরমত কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ডাঃ মরিস রলিংস্-এর লেখা একটা বই নাকি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় বিক্রি হয়েছে কোটির উপর। বাংলায় অনুবাদিত বইটির নাম 'মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা'। বইটির তৃতীয় মুদ্রণের ৯৯ পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে আত্মা বিষয়ে যে পরম সত্য (?) জানতে পারলাম, তা সত্যিই লোমহর্ষক ও রূপকথার মতই। হিন্দু ধর্মের এক পরমপূজ্য মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিজে যা দেখেছিলেন বলে বইটিতে লেখা হয়েছে, তা সরাসরি এখানে তুলে দিচ্ছি : "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন মারা যান (কলকাতায়) তখন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই তিনি আকাশপথে দেখেন যে, স্বর্ণরথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বসিয়া আছেন এর দেবদূতগণ চামর হাতে লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রথটি চলিয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য তিনি সেখানে উপস্থিত শিষ্যগণকে দেখাইয়া ছিলেন।"

এই অংশটি পড়ে অনেকের মনে এমন প্রশ্ন উঁকি দিতেই পারে—বিদ্যাসাগরের আত্মা কী বস্ত্র পরিধান করে ছিলেন? পরিধান করে থাকলে, সেই বস্ত্র পেলেন কী করে? আত্মা কাপড়-চোপড় সহ শরীর ধারণ করলে এমন গুরুতর সন্দেহ দেখা দিতেই পারে—পরিধেয় বস্ত্র সমূহেরও আত্মা আছে! কোনও আত্মা-গবেষক বিষয়টি নতুনভাবে গবেষণা করার কথা ভেবে দেখতে পারেন।

তাহলে এত আলোচনার পর আমরা আত্মার রূপের বিষয়ে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম?

বাস্তবিক পক্ষে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তো সম্ভব হয়নি, বরং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আলোচনায় যত বেশি বেশি করে ধর্মীয় নেতাদের মতামত গ্রহণ করেছি, ততই বেশি বেশি করে আমরা বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়েছি। এ তো দেখছি 'বারো রাজপুত্তুরের তেরো হাঁড়ি'।

অধ্যায় : চার

অদিবাসীদের আত্মা-চিন্তা

ভারত বিরাট দেশ। আদিবাসী-গোষ্ঠীর সংখ্যাও বিপুল। এরই মধ্য থেকে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি আদিবাসী-গোষ্ঠীর আত্মাবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করে দেখাব, গোষ্ঠীভেদে বিশ্বাসের রকমফের।

নাগাদের উপগোষ্ঠী সেমা-নাগা ও অও-নাগাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষেরই একটি করে স্বচ্ছ-আত্মা আছে। এই স্বচ্ছ-আত্মা থাকে আকাশে। মানুষ ভাল-খারাপ যে সব কাজ করে, সেইসব কাজ-কর্মের ফল তরঙ্গ হয়ে প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ আত্মার বুকে।

অসমের লোখে উপজাতির মানুষেরা বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের আত্মা দেখতে তারই মত, এবং একই আয়তনের।

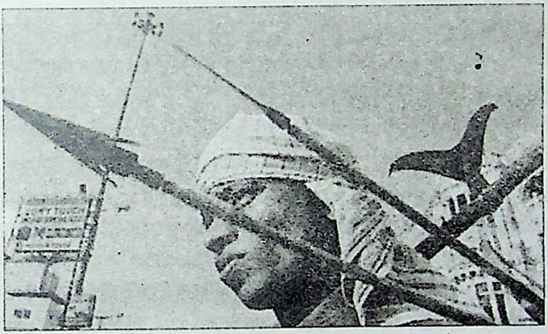

আদিবাসী

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি নিগূঢ়ানন্দ'ও সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন—আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানও (এই নামের কোনও স্বীকৃত বিজ্ঞান আছে বলে এই প্রথম শুনলাম) বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে প্রতিটি মানুষের আত্মা তার স্থূল দেহেরই অনুরূপ এবং একই পরিমাপের। [আত্মার রহস্য সন্ধান—পৃষ্ঠা-১৫৯]

আমার মত কিছু মানুষের দুঃখ রয়ে গেল—এমন একটা পৃথিবী কাঁপানো অনুসন্ধানপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তের খবর বিজ্ঞানের দরবারে চেপে গিয়ে প্রকাশ করা হল শুধু এই বইটিতে; তাও আবার অনুসন্ধানের বা পরীক্ষার গৃহীত পদ্ধতি এবং পর্যায়গুলোকে প্রকাশ না করে স্রেফ সিদ্ধান্তটুকু। নিগূঢ়ানন্দের প্রতি অনুরোধ—বিশ্বজনগণের স্বার্থে পরীক্ষাটির বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করুন।

নিগূঢ়ানন্দ 'আত্মা' বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-লেখক। তাঁর দাবি—আত্মা, ভূত, প্রেত ইত্যাদির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। 'মানুষে বিশ্বাস হারান অন্যায়'। কিন্তু মুশকিল হল, কার উপর বিশ্বাস রাখি? স্বামী অভেদানন্দও জোরালো দাবি রেখেছেন—অনেক আত্মা-টাত্মার সঙ্গে বহুত যোগাযোগ করে দেখেছেন—আত্মা স্রেফ ধোঁয়াময়, কুয়াশাময়। অন্য সব ধারণাই বিলকুল ঝুট।

একই বিষয় নিয়ে দুটি বিপরীত স্বীকারোক্তিই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু দুটি বিপরীত স্বীকারোক্তি কখনই একই সঙ্গে সত্যি হতে পারে না। অতএব নিগূঢ়ানন্দের ও অভেদানন্দের মধ্যে অন্তত একজন মিথ্যেবাদী, অথবা মিথ্যেভাষী দু'জনেই।

যাকগে। ওঁদের ছেড়ে আসুন আবার আদিবাসীদের আত্মবিশ্বাসে ফিরে আসি। ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের বিশ্বাস আত্মা হল মানুষটির ছায়া।

কুকি ও মণিপুরের পুরুম সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বিশ্বাস, প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি করে আত্মা।

বীরহোড়রা মনে করে মানুষের মধ্যে রয়েছে তিনটি করে আত্মা। তিন আত্মার একটিকে প্রায়ই দেখা যায়, সে হলো—মানুষটির ছায়া।

নীলগিরির টোডা সম্প্রদায়ের মানুষদের বিশ্বাস অসমের লোখে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি। প্রতিটি মানুষের আত্মা মানুষটির সমপরিমাণ না হলেও মানুষটির মতই দেখতে।

এ'বার চলুন, এ'দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিই। ইহুদিরা মনে করে প্রাণই আত্মা; আত্মাই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণময় আত্মা। তাদের বিশ্বাস জেহোবা মানুষের নাকে ফুঁ দিয়ে দেহে প্রাণময় আত্মার সঞ্চার করেছিলেন। আত্মা থাকে কোথায়? দেহ জুড়ে? এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস, আত্মার অবস্থান হৃদপিণ্ডে। সেই উৎপত্তিস্থল থেকেই শক্তি সঞ্চারিত হয় প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে। একই সঙ্গে ইহুদি-ধর্ম-বিশ্বাসীরা মনে করে হৃদপিণ্ড থেকেই উৎসারিত হয় মানুষের চিন্তা, চেতনা, ভাবাবেগ, প্রেম ও আনন্দ।

প্রাচীন গ্রিক মহাকাব্যের রচয়িতা হোমারের সময় এবং তারপরও দীর্ঘকাল ধরেই গ্রিস-দেশের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন—শ্বাসই হল আত্মা। মারা গেলে শ্বাস দেহ থেকে বিচ্যুত হয়। তবে যতক্ষণ মৃতদেহ রক্ষিত থাকবে ততক্ষণ আত্মা থাকবে সেই মরদেহকে স্পর্শ করেই। দেহ বিনষ্ট হলে আত্মা মুক্ত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে।

হোমারের কালে ও তৎপরবর্তী একটা দীর্ঘ সময় হোমারের প্রভাবিত চিন্তায় গ্রিসীয়রা বিশ্বাস করতেন, দেহের মৃত্যুর পর আত্মারূপ শ্বাসের অস্তিত্ব থাকলেও সেই আত্মাতে কোনও চেতনা থাকে না। আত্মার চেতনা না থাকার কারণ, চেতনার আধার হৃদপিণ্ড মৃত্যুপরবর্তী আত্মায় হাজির না থাকা।

পরবর্তীকালে নব-প্লেটোপন্থীরা আত্মা বিষয়ে যে বিশ্বাসের কথা প্রচার করেছিলেন, তাই গ্রিসবাসীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাদের মতে—আত্মাই চিন্তা বা চেতনা এবং আত্মা অমর।

প্রাচীন জার্মানরা বিশ্বাস করত, আত্মাই শ্বাস। দেখতে ছায়ার মত। থাকে হৃদপিণ্ডে।

মালয়ের বহু মানুষের বিশ্বাস, আত্মার রঙ রক্তের মত লাল। আয়তনে ভুট্টার দানার মত। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা, আত্মা তরল। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের অনেকে আজও বিশ্বাস করে আত্মা থাকে বুকের বাঁ দিকে, হৃদয়ের গভীরে। আয়তনে খুবই ছোট্ট। বহু জাপানি আজও এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে—আত্মার রঙ কালো। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে হাত পা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আর একটা ছোট্ট মানুষ বাস করে। সেটাই হল 'দ্বিতীয় সত্তা' বা 'আত্মা'। তারা এও মনে করত, শরীরের কোনও অঙ্গহানি হলে আত্মারও অঙ্গহানি হবে।

আত্মার সংজ্ঞা, আত্মার রূপ ও আত্মা বিষয়ক নানা ধর্মবিশ্বাস ও নানা ধর্মগুরুদের বিশ্বাস নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করার পর আসুন এবার আমরা আলোচনাকে গুটিয়ে নিয়ে দেখি আত্মা সম্পর্কে আমরা কী স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছালাম? 'ঢাকাই কুট্টি'র ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "কচু পাইলাম"। বাস্তবিকই তাই, অধ্যাত্মবাদীদের জ্ঞানের 'সমুদ্র মন্থন' করে না বুঝতে পারলাম আত্মার সংজ্ঞা কী, না জানতে পারলাম আত্মা কেমন।

একবার একটু ভাবুন তো। ধর্মীয় বিশ্বাস, ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও আবেগকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে ভাবুন তো—এত বিচিত্র সব মত থেকে, বিপরীত মত থেকে, কোনটিকে আপনি গ্রহণ করবেন? হিন্দু হিসেবে হিন্দুদের আত্মা বিষয়ক বিশ্বাসকে? সেখানেও তো 'বারো রাজপুত্তুরের তেরো হাঁড়ি'। অথচ দেখুন, স্বামী **অভেদানন্দই 'মরণের পারে' গ্রন্থটির ৩১ পৃষ্ঠায় সোচ্চার ঘোষণা রেখেছেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু'রকম বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকাল এক ও অখণ্ড'। তবে?**

এই তবের উত্তরটাই একটি সভায় দিয়েছিলেন আমাদের সমিতির ঠোঁট কাটা মিষ্টুন দাশগুপ্ত, "মনে রাখলাম, এবং তাই আত্মা-বিষয়ক বিচিত্র রকমের বহু-খণ্ডিত ধর্মীয় 'সত্য'টিকে মিথ্যা বলে বাতিল করলাম"।

অধ্যায় : পাঁচ

ভিড় করে আসা প্রশ্নমালা

এই যে এতকিছু আলোচনা করলাম, এর পরেও ভিড় করে আসে নানা প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নকারীদের মোটামুটিভাবে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়।

এক : আত্মা বিষয়ে আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞাসু।

দুই : আত্মার অমরত্ব অলীক চিন্তা, বুঝেও অধ্যাত্মবাদীদের নানা কূট প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তার উত্তর কী হওয়া উচিত—জানতে আগ্রহী।

তিন : আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী, অথবা আত্মার অমরত্ব প্রচারে আগ্রহী। তাই এঁরা আত্মার মরণশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন যুক্তি (যে সব যুক্তি ইতিপূর্বে আপনাদের সামনে হাজির করেছি) হাজির করার পর, সেই যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করা অসাধ্য বুঝে সে বিষয়ে নীরবতা দেখিয়ে, অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। উদ্দেশ্য—কূটপ্রশ্নে উত্তরদাতাকে মূল আলোচনা থেকে সরিয়ে দেওয়া।

চার : সবটা না জেনে সবজান্তা হওয়াটাই লক্ষ্য। এরা জানতে চায় যতটুকু, জানাতে চায় না, তার চেয়ে বেশি। ফলে শ্রোতাদের সামনে জাহির করার মানসে পূর্বযুক্তি বোঝার চেষ্টা না করে, পূর্বযুক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা না করে, বিষয়টা না জেনেই বিদ্যে জাহির করতে ব্যস্ত। এঁরা বিবেকানন্দ না পড়েই বিবেকানন্দের রচনা নিয়ে বেজায় তর্ক করতে ভালবাসেন। এরা অধ্যাত্মবাদের সংজ্ঞাটুকুও না জেনে অধ্যাত্মবাদ নিয়ে ভাসাভাসা বক্তব্যের ধোঁয়াশা তৈরি করেন। আসলে এঁরা যা করেন, তা হল অজ্ঞতা জাহিরের ভাঁড়ামো।

পাঁচ : এক দল আছেন 'বাঙালি কাঁকড়া' জাতীয় প্রাণী। 'বাঙালি কাঁকড়া'র গল্পটা অনেকেরই জানা। সকলের জানা নেই ভেবে ছোট্ট করে বলছি। প্লেন তখন আকাশে। এয়ার হোস্টেস হঠাৎ 'হাউ-মাউ' করে চিৎকার সহযোগে লাফিয়ে উঠলেন। কী হয়েছে? কী হয়েছে? চিৎকার শুনে সহকর্মী এয়ার হোস্টেস ও স্টুয়ার্ডরা দৌড়ে এলেন। ভীত বিড়ালাক্ষী সুন্দরী কাঁপাকাঁপা তর্জনী তুলে দেখালেন একটা মুখ খোলা বড়সড় টিনের পাত্র। সেদিকে তাকিয়ে সমস্বরে সকলেই চিৎকার করে উঠলেন। পাত্র বোঝাই এক গাদা কাঁকড়া। কাঁকড়াগুলো খড়্‌খড়্ আওয়াজ তুলে যে ভাবে ওপরে উঠে আসছে, তাতে যে কোনও সময়...। আতঙ্কের কারণ

বুঝে কাঁকড়ার মালিক বললেন, "কিছু ভয় নেই ম্যাডাম। এরা কেউই টপকে আসতে পারবে না। এ'সবই বাঙালি কাঁকড়া। দেখছেন না, একটা উঠলেই বাকিরা কেমন টেনে নামাচ্ছে।" এরা কখনও কুমার শানুর সঙ্গে গান শেখা নীতীশ দত্ত। শানুর গলা স্কেলে পর্যন্ত থাকে না, কপালগুণে করে খাচ্ছে—বলে নিজের ঈর্ষাকে প্রকাশ করেন। এরা কেউ মফস্‌সল কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা ও সেই সঙ্গে শখের জ্যোতিষী পায়েল ভট্টাচার্য। উত্তর কলকাতার গা ছুঁয়ে থাকা শহরতলিতে কলেজে যেতে যেতে প্রায়শই এক বাসযাত্রীকে দেখছেন। সেই সাধারণ বাসযাত্রী আজ তাঁরই পরিচিত অনেকের চোখে অসাধারণ হয়ে ওঠায় পায়েল বলেন—"তোরা কেন যে ওকে অত পাত্তা দিস বুঝি না।" আসলে পায়েল বোঝার চেষ্টাই করেননি কেন ওই বাসযাত্রীর প্রবন্ধের বই ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে রেফারেন্স বই হিসেবে স্থান পায়? কেন পৃথিবীর সর্বকালের 'সেরা যুক্তিবাদী' হিসাবে 'Wikipedia'-তে তার নাম Albetr Einstein, Rechard Dawkins, Paul Kurtz পাশে স্থান পায়? কেন BBC, National geographic ওকে নিয়ে তথ্যচিত্র করে? এসবের খোঁজ না করেই বাঙালি কাঁকড়া টেনে নামাতে চেয়েছেন সহযাত্রীকে।

এই 'বাঙালি কাঁকড়া' মার্কা প্রাণীরা গুরুত্ব দেয়—কে কথাটা বলছে তার উপর। এরা যুক্তির বিরোধিতা করতে পারে সহকর্মী হওয়ার সুবাদে, পড়শি হওয়ার সুবাদে, আত্মীয় হওয়ার সুবাদে। ঈর্ষাকাতরতা থেকে উঠে আসে এদের গোটা বিরোধিতা। আবার অজ্ঞানতা, সবজান্তা ভাব থেকেও উঠে আসে নানা প্রশ্ন।

আসুন এ'বার খোলা মনে দেখা যাক—এরা আত্মা নিয়ে মোটামুটিভাবে কী কী ধরনের প্রশ্ন তুলে থাকেন।

এঁদের অনেকেই দাবি করেন, নিজে প্ল্যানচেটের আসরে আত্মা আনায় অংশ নিয়েছেন। কখনও বা দাবি করেন ওঁর বাবা-কাকা জাতীয় শ্রদ্ধেয় আপনজন প্ল্যানচেটে আত্মা এনেছিলেন। কখনও বা এঁরা দাবি করেন, ভূতে ভর হওয়া মানুষকে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে দেখেছেন তিনি নিজে, অথবা তাঁর বিশ্বস্ত কোনো আপনজন। এঁরা উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চা প্রসঙ্গে। এঁরা আত্মার অমরত্বের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থের কথা ছাড়াও কিছু কিছু বইয়ের কিছু কিছু কথা। বইগুলোর লেখক প্রধানত অভেদানন্দ, নিগূঢ়ানন্দ ও ডাঃ মরিস রলিংস। এই প্রশ্নকর্তাদের কেউ কেউ বলেন ও চিঠি লেখেন, আমি যেন নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে দেখা করে আত্মা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনি।

আজকের ডাকে যে-সব চিঠি এসেছে তারই মধ্য থেকে একটা চিঠির একটু অংশ তুলে দিচ্ছি। পত্রলেখক শ্রীশৈলেনচন্দ্র ঘোষ। নিবাস : গৌরবাজার, বর্ধমান। তিনি লিখেছেন, "নিগূঢ়ানন্দের বইগুলো পড়লে বুঝবেন উনি সাধনার সর্বশেষ

স্তরে পৌঁছেছেন। আমরা যাকে শ্রেষ্ঠ সাধক বা অবতার বলি, উনি তাই। আপনি আত্মা ও ভূতের অস্তিত্ব, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, যোগে ভূমিত্যাগ, অলৌকিক ক্ষমতায় রোগমুক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নিগূঢ়ানন্দ বর্তমান কালেরই মানুষ। আপনি দয়া করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আপনার সন্দেহের নিরসন ঘটবেই, এই বিশ্বাস রাখি।" আর একদল আছেন, যাঁরা বলেন—"কে এলোরে? রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, বেদ, গীতা, বাইবেল, কোরান সবাই ভুল বলছে, আর উনি ঠিক বলার ঠাকুরদাদা। অধ্যাত্মবাদ বোঝা অতই সোজা! জীবন কেটে যাবে রে!"

'সানন্দা'র দপ্তরে প্ল্যানচেটের আসর

প্ল্যানচেটে আত্মা আনার কথা ওঠায় মনে পড়ে গেল দুটি ঘটনা। প্রথম যে ঘটনাটার কথা বলছি, সেটা ঘটেছিল ১৬ মে, ১৯৯২। গিয়েছি পাক্ষিক পত্রিকা 'সানন্দা'র দপ্তরে। কথা প্রসঙ্গে সম্পাদক সহযোগী দীপান্বিতা ভট্টাচার্য জানালেন—আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনি হবে প্ল্যানচেট নিয়ে। তুমি তো প্ল্যানচেটে বিশ্বাসই করো না, বিশ্বাস করো না প্ল্যানচেটে আত্মা আসে, তারা উত্তর দেয়। আমরা প্ল্যানচেটে বিশ্বাসীদের কথাই এবার হাজির করব। তাই সংখ্যাটা প্ল্যানচেট নিয়ে হলেও এই ব্যাপারে তোমার কোনও সাহায্য নিচ্ছি না।

বললাম—কে বলল তোমাকে, আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে বিভিন্ন প্ল্যানচেটের আসর বসিয়ে দেখেছি, কি অদ্ভুতভাবে মিডিয়ামদের হাত দিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসে।

—তুমি নিজে করে দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—করে দেখাতে পারবে?

—নিশ্চয়ই।

—কবে দেখাবে? দু'চার দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা কর, তাহলে এই ইস্যুটাতেই ম্যাটারটা দিতে পারি।

—আজই দেখাতে পারি।

—কোথায় দেখাবে?

—তোমাদের অসুবিধে না থাকলে এখানেই।

—কখন দেখাবে?

—এখুনি।

অমনি মুহূর্তে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সানন্দার সম্পাদকের ঘরেই প্ল্যানচেটের আসর বসানো হবে ঠিক হল। মুহূর্তে ছোট ঘরটি ভর্তি হয়ে গেল সানন্দার সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক ও সম্পাদক সহযোগীদের ভিড়ে।

মিডিয়াম কে হবেন। এগিয়ে এলেন নিবেদিতা মজুমদার। কার আত্মাকে ডাকা হবে? ঠিক হল উত্তমকুমারের আত্মাকেই ডাকা হবে। সকলেই ব্যস্ত মানুষ। তাড়াতাড়ি উত্তর জানতে আগ্রহী। ঠিক হল, দর্শকরা প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরগুলো আসবে 'হ্যাঁ' ও 'না'র মধ্য দিয়ে। একটা সাদা কাগজে একটা বৃত্ত আঁকলাম। তারপর গোটা বৃত্ত জুড়ে, পরিধি ছুঁয়ে এঁকে ফেললাম একটা যোগ চিহ্ন। বৃত্তটার চার ভাগের দুই বিপরীত দিকে লিখলাম 'হ্যাঁ' অপর দুই বিপরীত দিকে 'না'। তারপর চেয়ে নিলাম একটু সুতো ও একটা আংটি। আংটিতে বেঁধে ফেললাম সুতো। এবার বৃত্ত আঁকা কাগজটা টেবিলে পেতে টেবিলের দু'প্রান্তে মুখোমুখি বসলাম আমি ও নিবেদিতা। আমার কথা মত নিবেদিতা তাঁর ডান হাতের কনুইটা টেবিলে রেখে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটিবাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধরলেন, যাতে আংটিটা ঝুলে রইল যোগ চিহ্নের কেন্দ্রে, অর্থাৎ বৃত্তের ও কেন্দ্রে।

এ'বার শুরু হল প্ল্যানচেটের দ্বিতীয় বা শেষ পর্যায়। প্রত্যেককে চুপ করতে বললাম। নিস্তব্ধ ঘর। ঘরে গোটাকয়েক ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হল। কথা বলছিলাম শুধু আমি—নিবেদিতা, এক মনে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের আত্মা আসছে। উত্তমকুমারের আত্মা এলে আংটিটা আপনা থেকে দুলতে থাকবে—'হ্যাঁ' লেখাকে নির্দেশ করে দুলতে থাকবে।

দু'মিনিটও কাটল না, আংটি কেঁপে উঠল, তারপর দোলা শুরু করল। দুলতে লাগল 'হ্যাঁ' শব্দ দুটির দিকে। এরপর শুরু হল দস্তুর মত প্রশ্নবাণ। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও মিলছে 'হ্যাঁ' বা 'না'। একাধিক হাতের ছোট্ট খাতায় খস্‌খস্‌ করে লেখা হচ্ছে প্রশ্ন ও উত্তর। ছবি তোলা চলছে। এক সময় নিবেদিতার চোখ বুজে এল। নিবেদিতা এলিয়ে পড়ার আগে ধরে ফেললেন সুদেষ্ণা রায়। আমি গম্ভীর, মৃদু ও টানা-টানা সুরে বলতে লাগলাম—নিবেদিতা, এক মনে শুধু আমার কথা শুনতে থাকুন। উত্তমকুমারের আত্মা চলে গেছে। আপনি জেগে উঠছেন। আপনি জেগে উঠছেন। চোখ খুলুন। একটু একটু করে চোখ খুলুন।

চোখ খুললেন নিবেদিতা। বললেন, খুব ঘুম পাচ্ছে। অনিরুদ্ধ ধর ও শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দৌড়োলেন নিবেদিতার জন্য গরম দুধের পরিবর্ত হিসেবে গরম চা আনতে।

উপস্থিত সবার আগ্রহ তখন তুঙ্গে। তাঁরা আবার প্ল্যানচেটের আসর বসাতে চাইলেন। মিডিয়াম হিসেবে চাইলেন সুদেষ্ণাকে। সুদেষ্ণা ওঁদের চোখে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না মানুষ। মজা ভালই!

সুদেষ্ণা বসলেন। ঠিক হল সত্যজিৎ রায়ের আত্মাকে আনা হবে। নিবেদিতার সময় যা যা ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। আবার প্রশ্নমালা। এমন অনেক প্রশ্ন এল, যেগুলো কৌতূহল থেকে উঠে আসা, কিন্তু কখনই লেখায় প্রকাশ করা যায়

না। উত্তরও আসতে লাগল।

প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হতেই দীপান্বিতা বললেন—আত্মাকে দিয়ে রাইটিং-প্যাডে লেখানো যায় না?

বললাম—কেন যাবে না; নিশ্চয়ই যায়।

রাইটিং প্যাড এল। ডট্‌পেন এল। এবারও সুদেষ্ণাই মিডিয়াম। আহ্বান করা হল রাজীব গান্ধীর আত্মাকে। এ'বারও মিনিট দু'য়েক লাগল। কাঁপতে লাগল সুদেষ্ণার হাতের ডট্‌পেন।

এবার ইংরেজিতে প্রশ্ন—রাজীব, আপনি কি এসেছেন? উত্তর এল—Yes. তারপর উত্তেজিত প্রশ্ন একের পর এক আসতেই লাগল। ডট্‌পেন রাইটিং প্যাড থেকে না তুলে কাঁপা কাঁপা লেখায় উত্তর দিয়েই চললেন সুদেষ্ণা রায়।

উত্তরপর্ব শেষ হতে ওঁদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার উত্তেজনার আগুনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেললাম—এতক্ষণ যা হল সেটা আদৌ প্ল্যানচেট নয়, সম্মোহন। উত্তরগুলো আত্মা দেয়নি, দিয়েছে দুই মিডিয়ামের অবচেতন মন। আমি যখন প্ল্যানচেটে আত্মা এনে দেখাবার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছি, তখন দুই মিডিয়ামই আমার কথায় প্রভাবিত হয়েছেন। প্রভাবিত হয়েছিলেন প্ল্যানচেটের আসরকে যেভাবে সাজিয়েছিলাম, যেভাবে পরিবেশটা তৈরি করেছিলাম, তার দ্বারাও। সবচেয়ে বড় কথা নিবেদিতা ও সুদেষ্ণা সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, বা আত্মা অমর, কি মরণশীল—এই নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। 'আত্মা মরণশীল' যুক্তি ও বিজ্ঞানের সূত্র ধরে আসা প্রত্যয় তাঁদের চিন্তাতে দৃঢ়বদ্ধ থাকলে কখনও অলীক আত্মা তাঁদের উপর ভর করত না, যে ভরটা অবশ্যই একটা মানসিক অবস্থামাত্র—এর বাড়তি কিছু নয়। 'ভূতে ভর', 'জীনে ভর' বা 'মনসার ভর' ইত্যাদির জন্য কখনই ভূত, জীন বা মনসার বাস্তব অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় সচেতন বা অচেতন মনের গভীরে ভূত, জীন, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা দ্বিধা—"এদের বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে থাকতেও বা পারে"। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসটা কোন 'আনস্মার্ট' হওয়ার ব্যাপার নয়। একটি মানুষ ছোটবেলা থেকে আত্মীয়-বন্ধু-শিক্ষক-বইপত্তর থেকে একটু একটু করে শিখেছেন, বিশ্বাসকে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে স্থান দিয়েছেন—আত্মা অমর; এই বিশ্বাসের সঙ্গে স্মার্ট বা আনস্মার্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

আমার প্রতি বিশ্বাস, আমি আত্মা এনে দেখাব—এই কথায় দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং পরিবেশগতভাবে ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা আত্মার প্রতি বিশ্বাস বা আধা বিশ্বাস এই তিনের প্রভাবের ফলে আমি সহজেই নিবেদিতা ও সুদেষ্ণার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে ধারণা সঞ্চার করতে পেরেছি। আমি যে কথাগুলো ওঁদের বলেছি সেই কথাগুলোকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'suggestion' বা 'নির্দেশ' অথবা 'ধারণাসঞ্চার'। suggestion বা ধারণাসঞ্চার সম্মোহনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত বা

আবশ্যিক প্রথম ধাপ। আত্মা আসছে—আমার এই সঞ্চারিত ধারণার প্রভাবে তাঁরা সম্মোহিত অবস্থায় নিজেদের অজ্ঞাতে উত্তর দিয়ে গেছেন।

এরপরই যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক—সেটা হল, তাহলে কি ধরে নেব, প্ল্যানচেটের আসরে সম্মোহনবিদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়?

না, না, আদৌ তা নয়। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কেউ যদি সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে বসেন—এই পদ্ধতিতে প্ল্যানচেটে আত্মা আনা সম্ভব, তবে সেই পদ্ধতি পালন করলে নিজের অজ্ঞাতে নিজের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে নির্দেশ পাঠান (যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'স্বনির্দেশ' বা 'auto-suggestion' এবং নিজের অজ্ঞাতে সম্মোহিত হয়ে আত্মা তাঁর উপর ভর করেছে বলে বিশ্বাস করে বসেন। ফল নিজের অজান্তেই উত্তর দিতে থাকেন, যেগুলো সাধারণ চোখে অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটির উল্লেখ করছি, তাতে স্বনির্দেশ বা auto-suggestion-এ প্ল্যানচেটের বিষয়টা পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

ঘাড়ে চাপল প্ল্যানচেটের আত্মা

১৯৮৭ সালের কথা। ভূতে পাওয়া একটি গোটা পরিবার এসেছিলেন আমা কাছে। প্ল্যানচেটে নামানো আত্মা চেপে বসেছিল গোটা পরিবারের উপর।

গৃহকর্তা ইকনমিক্সে এম.এ.। মফস্সল শহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়স পঞ্চান্নর আশে-পাশে। গৃহকর্ত্রী বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট। কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। দুই ছেলে। বড় ছেলে চাকরি করেন। ছোট তখনও চাকরিতে ঢোকেনি। বেশ কিছু ভাষা জানেন। একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভূতের (?) খপ্পরে পড়ে এমনই নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৭-এর ৭মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ছিল—এক অশরীরী আত্মার দ্বারা আমাদের পারিবারিক শান্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদের সংগঠনের এক সদস্য নেহাতই কৌতূহলের বশে একটি চিঠি লিখে জানায়—বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান। হয়তো সাহায্য করা সম্ভব হবে।

ইনল্যান্ডে উত্তর এলো, পত্রলেখিকার নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় আমরা ধরে নিলাম তাঁর নাম মঞ্জু। মঞ্জুদেবী জানালেন—'প্ল্যানচেট' নামে একটা বই পড়ে ১৯৮৪ সনের ২৫ আগস্ট শনিবার তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট করতে বসেন। প্রথম একটি বৃত্ত এঁকে রেখার বাইরের দিকে A থেকে Z পর্যন্ত এবং রেখার ভিতরের দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ লিখে বৃত্তের কেন্দ্রে একটা ধূপদানিতে

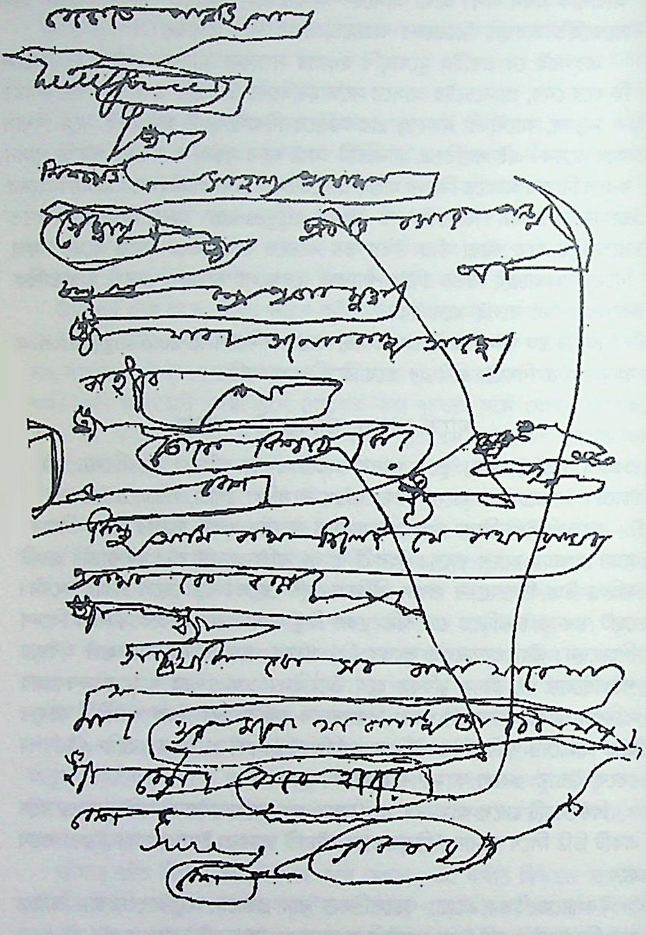

নীলাদ্রীর কলমে আত্মা

ধূপ জ্বেলে সবাই মিলে ধূপদানিকে ছুঁয়ে থেকে এক মনে কোনও আত্মার কথা ভাবতে শুরু করতেন। এক সময় দেখা যেত ধূপদানিটা চলতে শুরু করেছে এবং একটি অক্ষরের দিকে যাচ্ছে। অক্ষরগুলো পরপর সাজালে তৈরি হচ্ছে শব্দ। শব্দ সাজিয়ে বাক্য। এক একটি বাক্য হতে এত দীর্ঘ সময় লাগছিল যে ধৈর্য রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল।

তাই প্ল্যানচেট বইয়ের নির্দেশমতো একদিন ওঁরা বসলেন রাইটিং প্যাড ও কলম নিয়ে। প্রথম কলম ধরেছিলেন মঞ্জু দেবী। প্রথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসার পর এক সময় হাতের কলম একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করল। মঞ্জু দেবীই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' উত্তর লেখা হল—রবীন্দ্রনাথ। আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পরে একে একে প্রত্যেকেই কলম ধরেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আত্মারা এলে রাইটিং প্যাডে লিখে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে যায়। আত্মা আসার জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করতে হত বটে, কিন্তু একবার আত্মা এসে গেলে হুড়মুড় করে লেখা বের হত। প্রথম দিন ভোররাত পর্যন্ত কলম চলতে থাকে। তারপর থেকে প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত চলত আত্মা আনার খেলা। এ এক অদ্ভুত নেশা।

এমনিভাবে যখন আত্মা আনার ব্যাপার প্রচণ্ড নেশার মত পেয়ে বসেছে সেই সময় ১৯৮৫-র জানুয়ারির এক রাতে ছোট ছেলে নিজের ভিতর বিভিন্ন আত্মার কথা শুনতে পান। '৮৫-র ৫ মার্চ থেকে মঞ্জুদেবীও একটি আত্মার কথা শুনতে পান। আত্মাটি নিজেকে স্বামী স্বরূপানন্দ বলে পরিচয় দেয়। সেই আত্মার বিভিন্ন কথা ও নির্দেশ আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জুদেবী, সেই সঙ্গে আত্মার স্পষ্ট স্পর্শও অনুভব করছেন, আত্মাটি তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীলতাও করছে। মঞ্জুদেবী স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্যা। স্বরূপানন্দ মারা যান ১৯৮৪-র ২১ এপ্রিল। মঞ্জুদেবী আমাদের সদস্যাটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই '৮৭।

চিঠিটি আমার কাছে সেই সদস্যই নিয়ে আসে। আমাকে অনুরোধ করে এই বিষয়ে কিছু করতে।

আমার কথামতো জুলাইয়ের একটি তারিখ উল্লেখ করে সে-দিন পরিবারের সকলকে নিয়ে মঞ্জুদেবীকে আসতে অনুরোধ করেন সদস্যটি।

এলেন মঞ্জুদেবী ও তাঁর স্বামী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম প্ল্যানচেটের আসরে চারজনের কলমেই কোন না কোনও সময় বিভিন্ন আত্মারা এসেছেন। আত্মাদের মধ্যে নেপোলিয়ন, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপিয়ার, আলেকজান্ডার থেকে স্বরূপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জুদেবীর স্বামীর সঙ্গে বা বড় ছেলের সঙ্গে কোনো দিনই কোনো আত্মাই কথা বলেনি। অর্থাৎ তাঁরা আত্মার কথা শুনতে পাননি। আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছোট ছেলে। আত্মার স্পর্শ পেয়েছেন শুধু মঞ্জুদেবী।

পরের দিনই আমার সঙ্গে দুই ছেলেই দেখা করলেন। কথা বললাম। সকলের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝলাম, চারজনই 'প্ল্যানচেট' বইটা পড়ে প্ল্যানচেটের সাহায্যে সত্যিই মৃতের আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ-কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তারই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনের অজ্ঞাতে চারজনকে দিয়েই বিভিন্ন মৃতের কথা লিখিয়েছে। ছোটছেলে সবচেয়ে বেশিবার মিডিয়াম হিসেবে কলম ধরার জন্য প্ল্যানচেট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন, তাঁর হাত দিয়ে কেন লেখা বের হচ্ছে, এই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে বার বারই চিন্তাগুলো এক সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। রহস্যের জাল খোলেনি। বুদ্ধিমান ছোট ছেলে নিজেই নিজের অজান্তে স্কিটসোফ্রেনিয়ার রোগী হয়ে পড়েছেন। ফলে শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়ে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু করেছেন।

মঞ্জুদেবী সাহিত্যে ডক্টরেট, ভক্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা। স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্যা হওয়ার পরবর্তীকালে গুরুর কিছু কিছু নারীর প্রতি অশোভন আসক্তির কথা শুনেছিলেন। প্ল্যানচেটের আসরে অংশ নেওয়ার পর থেকে অতি আবেগপ্রবণতা ও অন্ধ বিশ্বাসের থেকেই তাঁর মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস।

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম। ওঁরা এলেন। ওঁরা যেমনভাবে কাগজ-কলম নিয়ে প্ল্যানচেটের আসরে বসতেন তেমনিভাবেই একটা আসর বসালাম। দুজনের অনুমতি নিয়ে সে-দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক, একজন চিত্র-সাংবাদিক ও আমাদের সমিতির দুই সদস্য।

আসর বসবার আগে মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছোটছেলের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কিছু কথা বললাম। টেবিলে বসলেন মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছেলে। রাইটিং-প্যাড আর কলম এলো। তিনটে ধূপকাঠি জ্বালানো হলো। মঞ্জুদেবীর কথা মত ছেলেই কলম ধরল। মিনিট দুয়েক পরেই দেখা গেল ছেলেটির হাত ও কলম কাঁপছে। মঞ্জুদেবী বললেন, —উনি এসে গেছেন। তারপর তিনিই প্রশ্ন করলেন,—আপনি কে?

কলম লিখল—স্বামী স্বরূপানন্দ।

এর পর মঞ্জুদেবী অনেক প্রশ্নই করলেন, যার মধ্যে ছিল—আপনি আমাকে ছাড়ছেন না কেন? আমাকে ছেড়ে দিন! ওঁরা বলছেন, আপনি আজ থেকে আমাকে ছেড়ে যাবেন, তা হলে ছাড়ছেন না কেন? ইত্যাদি।

ছোটছেলের কলম বেশ দ্রুতই চলছিল। মঞ্জুকে আত্মা ছেড়ে যাচ্ছে তাও লিখে এক সময় কলম ইংরিজিতে লিখল : লিভ দ্য পেন। কলম ছাড়লেন ছোট ছেলে।

মঞ্জুদেবী খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে তিনি যে আত্মাটিকে তাড়াতে আঠারো হাজার টাকার ওপর খরচ করেও কৃতকার্য হননি, সে কিনা এত দ্রুত এককথায় চলে যেতে চাইছে!

মঞ্জুদেবী তাঁর সন্দেহের কথাটি স্বভাবতই প্রকাশ করলেন। বললেন,—আপনি

ওকে সম্মোহন করে লিখতে বাধ্য করছেন না তো?

মা'য়ের এমনতর কথা ছেলের 'ইগো'তে আঘাত করল। ছেলে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিছু তপ্তকথা বলে ক্ষিপ্ত ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জুদেবীর মস্তিষ্ককোষে আত্মা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি গেঁথে দেওয়ার জন্য ছেলেকে ঠাণ্ডা করে আবার এনে তথাকথিত প্ল্যানচেটের আসরে বসালাম। আমাদের অনুরোধে ছেলে কলমও ধরলেন। এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কলমের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মা। বিশ্বাস করলেন এ-সব সত্যিই আত্মারই লেখা। স্বরূপানন্দের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবারকে আর বিরক্ত করবেন না।

মৃতের আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছুর স্পর্শ অনুভব করিয়েছে, আমি আমার কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে আত্মা আজই তাঁদের ছেড়ে যাবে। ফলে ওঁর মস্তিষ্ক কোষে সঞ্চারিত আমার দৃঢ় ধারণাই তাঁদের দিয়ে লিখিয়েছে—'আমি ছেড়ে যাচ্ছি। আর বিরক্ত করব না', ... এইসব কথাগুলো।

এই লেখাগুলো ছিল অবচেতন মনের প্রভাব।

প্ল্যানচেটের রকমফের

অনেক প্ল্যানচেটের আসরেই মেঝেতে বৃত্ত আঁকা হয়। বৃত্তের ভিতরে লেখা হয় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। বৃত্তের বাইরে লেখা হয় A থেকে Z পর্যন্ত। বৃত্তের

বৃত্ত এঁকে প্ল্যানচেট করা হচ্ছে

মাঝখানে বসানো হয় একটা ধূপদানি। ধূপদানিতে গুঁজে দেওয়া হয় সাধারণভাবে তিনটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি। এক, দুই বা তিনজন মিডিয়াম ধূপদানিটি স্পর্শ করে আত্মার কথা ভাবতে থাকে। এক সময় ধূপদানি চলতে থাকে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ধূপদানি যে যে অক্ষর ও সংখ্যার দিকে চালিত হয়, সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে তৈরি হয় উত্তর। ধূপদানি যে অবচেতন মনই চালনা করে—এ'কথা আর নতুন করে বলার ও বোঝাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চা

আমাকে মাঝে-মধ্যে বহু পরিচিতজনের কাছেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ পাই, তিনি প্ল্যানচেটের সাহায্যে তাঁর প্রিয়জনের বিদেহী আত্মাদের নিয়ে এসেছিলেন, বিদেহী আত্মারা লিখিত উত্তরও রেখে গেছেন, এরপরও কি বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সব কথা মিথ্যে?

যদিও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে অতি স্পর্শকাতর বিষয়, তবু এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা গর্ব করেন ততটা রবীন্দ্রনাথকে জানার, তাঁর রচনা পড়ার চেষ্টা করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে অনেকটাই গান, গীতিনাট্য ও বইয়ের তাকের শোভা বর্ধনে আবদ্ধ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে এই ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা নিজেরা যদি রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার বিষয়ে কিছুটা পড়াশুনো করে নিতেন বা জেনে নিতেন তবে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আদৌ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার পেছনে ছিল অজানাকে জানার কৌতূহল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি—"রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্ল্যানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন। কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে।"

১৯২৯ সালের (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৮ অতিক্রান্ত) পুজোর ছুটির শেষভাগে শান্তিনিকেতনে এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা সেন বা বুলা। পরে উমাদেবী শিশিরকুমার গুপ্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে গুপ্তা হন। উমাদেবী বা বুলা ছিলেন শিক্ষিতা ও সাহিত্যরসে আপ্লুতা। উমা গুপ্তার লেখা দুটি কবিতার বইও আছে, 'ঘুমের আগে' ও 'বাতায়ন'।

রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন 'বুলা'র মধ্যে রয়েছে মিডিয়াম হওয়ার অতীন্দ্রিয় শক্তি। রবীন্দ্রনাথের অশেষ আগ্রহে বসল প্ল্যানচেট-চক্র, নভেম্বর ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮ ও ২৯ এবং ১৬ ডিসেম্বর। প্ল্যানচেট-চক্রে মিডিয়াম বুলা ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত মহলানবিশ।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট চর্চার মিডিয়াম উমা

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ উমাদেবী বা বুলাকে পেয়ে পরলোকের তথ্যানুসন্ধানে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ৬, ২৮, ২৯ নভেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর প্ল্যানচেটের পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে, ৪, ৫ ও ৮ নভেম্বরের প্ল্যানচেটের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি-পত্র থেকে।

প্ল্যানচেট-চক্রগুলোতে উমাদেবীর ওপর বিদেহী আত্মার ভর হতেই উমাদেবী লিখতে শুরু করতেন। প্রায় সব সময়ই প্রশ্নকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উমাদেবীর কাছ থেকে বিদেহী আত্মাদের লিখিত উত্তর (?) পেয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিদেহী আত্মার আবির্ভাব বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। উমাদেবীকে মিডিয়াম

করার পর ৬ নভেম্বর, ১৯২৯ রানী মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন। যাতে লিখেছিলেন, "উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা) কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার। তার যা ধারণা হয়, সে ধারণার হেতু সব সময় বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে।"

প্ল্যানচেট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে যা বলেছিলেন, তারই কিছু পাই 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই তো (বুলা) কী রকম করে সব লিখত বল তো? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা?...ও (বুলা) কেন মিছে কথা বলবে? কী লাভ ওর এ ছলনা করে?

মনোবিজ্ঞান কিন্তু বলে—অপরের চোখে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার তাগিদেও মানুষ ছলনার আশ্রয় নেয়, মিথ্যাচারী হয়। বড়দের, বিখ্যাতদের মিথ্যাচার কি আমরা কোনও দিন দেখিনি? উমাদেবীর ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে, না-ও হতে পারে। উমাদেবী যদি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে থাকেন, তবে মিডিয়াম হিসেবে তাঁর হাত দিয়ে লেখাগুলো কী করে এলো? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগতে পারে। এই বিষয়ে উত্তরও খুব স্বচ্ছ এবং সরল, সম্মোহন ও স্ব-সম্মোহন নিয়ে যে আলোচনা আগে করেছি সেটুকু থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উমাদেবীর ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মার প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস ও তীব্র অনুভূতিপ্রবণতা তাঁকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করেছিল। বিদেহী আত্মা তাঁর ওপর ভর করেছে এই বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকেই নিজে সম্মোহিত করে উত্তর লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "খুব শক্ত সবল জোরাল মানুষ বোধহয় ভাল মিডিয়াম হয় না।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)

একজন ভালো মিডিয়াম হওয়া প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন, "কোন লোক যদি তার নিজের কর্তৃত্ব মনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়াম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।" (মরণের পারে, পৃষ্ঠা—১৪২)

স্বামী অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়াম হবার ভাবটি হলো একজন মানুষের দেহ ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা।" (মরণের পারে, পৃষ্ঠা-১৩৬)

মিডিয়াম অবস্থায় উমাদেবী এমন কোনও উত্তর লিখে রাখতে সক্ষম হননি যার দ্বারা অভ্রান্তভাবে বিদেহী-আত্মার আগমন প্রমাণিত হয়। বরং দেখতে পাই বিভিন্ন আত্মা উমাদেবীকে দিয়ে লেখালেও সব আত্মারই হাতের লেখা ছিল একই রকম।

একবার সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বিদেহী আত্মা এলেন উমাদেবীর পেনসিলে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র। আমেরিকায়

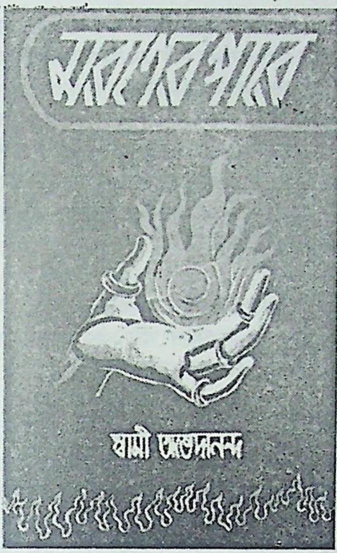

গিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। মৃত্যুর সময় ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। মারা যান ১৯২৬ সালে।

সন্তোষচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন :

রবীন্দ্রনাথ—তুমি ওখানে কোন্ কাজে প্রবৃত্ত আছ?

সন্তোষচন্দ্র—আমি একটা বাগান তদারকি করি। কিন্তু সে পৃথিবীর ফুলবাগান নয়।

রবীন্দ্রনাথ—এখানে যেমন গাছপালা থাকে, সে কি সেইরকম?

সন্তোষচন্দ্র—একটি গাছের আত্মার একটি বিশেষ ফুল ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে।

২৮ নভেম্বর প্ল্যানচেটে এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মা। মণিলাল অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালেই মারা যান।

মণিলালের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন :

—আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি সন্তোষের। সেখানে বাগান আবার কী? বুঝতে পারছি না।

মণিলাল উত্তর দিয়েছিলেন—গাছের কি আত্মা নেই? আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চক্রে গাছ-পালা শাক-সবজি, ঘাস, খড়, সবেরই বিদেহী আত্মার অস্তিত্বের খবর আমরা পাই, যে আশ্চর্য খবরটা স্বামী অভেদানন্দের আত্মারা একবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি।

বিদেহী আত্মা রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেহের আকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—"কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।"

আত্মা বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের কুয়াশার মতো বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হাওয়ার মতো' বর্ণনা মেলে না। বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব থাকলে দু'জনের বক্তব্যে মিলটুকু নিশ্চয়ই প্রথম শর্ত হতো।

এর পরও আর একটা বিখ্যাত প্ল্যানচেটের কথা বারবারই উঠে আসে। সেখানে একেবারে অন্যরকম প্ল্যানচেট। একেবারে অন্যরকম ব্যাপার-স্যাপার। সে বিষয়টা নিয়ে আসুন এবার বিশ্লেষণে ঢুকি আমরা।

স্বামী অভেদানন্দের সামনে আত্মা লিখল শ্লেটে

ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক। কাল—১৮৯৯ সালের ৫ আগস্ট। সকাল ১০টা। প্ল্যানচেটের আসর। মিডিয়াম মিস্টার কিলার। মুখোমুখি দু'টি চেয়ার অভেদানন্দ ও কিলার।

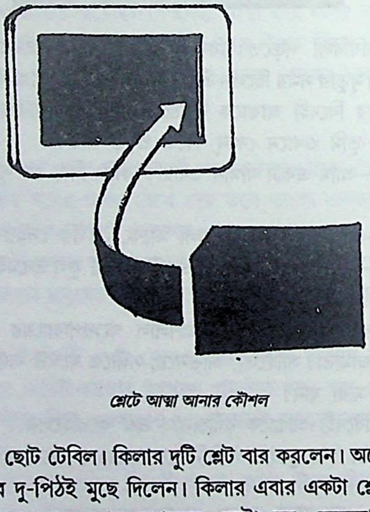

শ্লেটে আত্মা আনার কৌশল

মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। কিলার দুটি শ্লেট বার করলেন। অভেদানন্দ নিজের হাতে শ্লেট দুটির দু-পিঠই মুছে দিলেন। কিলার এবার একটা শ্লেটের ওপর আর একটা শ্লেট রেখে তার ওপর রাখলেন একটা চক। অভেদানন্দকে অনুরোধ

করলেন, যাঁর আত্মাকে আনতে চান, তাঁর নাম এক টুকরো কাগজে লিখে শ্লেটের ওপর রাখতে। অভেদানন্দ লিখলেন, স্বামী যোগানন্দজির নাম। এবার কিলার একটা রুমাল দিয়ে আলগা করে জড়ালেন শ্লেট দুটি। রুমালের আড়ালে ঢাকা পড়ল চক ও কাগজের টুকরোটা। কিলার ও অভেদানন্দ দু-হাত দিয়ে শ্লেট ছুঁয়ে রেখে টেবিল থেকে কিছুটা উঁচুতে তুলে রাখলেন শ্লেট জোড়াকে। কিলার বললেন, আপনি যাঁকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না। তবু চেষ্টা করছি। এক সময় শ্লেটে চক দিয়ে লেখার খস-খস শব্দ শোনা গেল। কিলার বললেন, চকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? অভেদানন্দ বললেন, হ্যাঁ। তারপরই একসময় রুমাল সরিয়ে শ্লেট খুলতেই দেখা গেল শ্লেট লেখায় ভর্তি, সঙ্গে যোগানন্দজির নাম, অভেদানন্দ বিস্ময়ে বাক্যহারা, পরে জেনেছিলেন শ্লেটে গ্রিক ভাষাও লেখা হয়েছে। গ্রিক লেখা এলো কী করে? যোগেন তো গ্রিক জানতেন না? বিস্মিত অভেদানন্দের প্রশ্নের উত্তরে কিলার জানালেন অন্য কোনও আত্মা লিখে গেছে। কিলারের কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছুই পাননি অভেদানন্দ।

অনেক আলোচনাচক্রে শ্রোতা-দর্শকরা এই ঘটনাটির উল্লেখ করে ব্যাখ্য চেয়েছেন। মুখের কথায় বোঝানোর চেয়ে হাতে-কলমে দেখালে যে শ্রোতা-দর্শকের মাথায় বিষয়টা বেশি ভালোমতো প্রবিষ্ট হবে, এই কথাটা চিন্তা করে স্বামী অভেদানন্দের পদ্ধতিতেই দর্শকদের নির্বাচিত তথাকথিত আত্মাকে এনে শূন্য শ্লেট লেখায় ভরিয়েছি, নাম লিখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্লেট ধরার সঙ্গী হয়েছেন দর্শকদেরই একজন। হ্যাঁ, শ্লেটে লেখার খস্-খস্ আওয়াজ শুনেছেন। শূন্য শ্লেটে দাবিমতো আত্মার স্বাক্ষর দেখে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রোতা-দর্শকরা অভেদানন্দর মতোই বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়েছেন। তবে পার্থক্যটুকু এই, অভেদানন্দ বিস্মিত হয়েছিলেন আত্মাকে লিখতে দেখে, আর দর্শকরা বিস্মিত হয়েছেন, এমন অসাধারণ ঘটনাও সামান্য লৌকিক কৌশলের সাহায্যেই করা সম্ভব জেনে।

এমন একটা অসাধারণ প্ল্যানচেট করার জন্য প্রয়োজন একটি শ্লেট। টিনের শ্লেট হলেও ভাল হয়। ফ্রেমে আটকানো কালো টিনটার মাপের দু-পিঠ কালো একটা টিনের শিট। টিন-শিটের একটা কোণা ছবির মতো করে কেটে রাখুন। এক টুকরো চক্। একটা রুমাল বা খাম। যিনি আত্মা আনবেন, তাঁর হাতের একটা আঙুলের নখ রাখতে হবে একটু বড়। নখটা সামান্য ফাড়া থাকলে আরও ভাল হয়।

শ্লেটে আগে থেকেই একজন সম্ভাব্য আত্মার নাম চক দিয়ে লিখে রাখতে হবে। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা গান্ধী, কার্ল মার্কস, লেনিন বা অন্য কারও নাম স্বাক্ষর করে রাখি। এ-বার লেখার ওপর চাপিয়ে রাখি কালো টিনের শিট। লেখাটা শিটের তলায় চাপা পড়ে যায়। দর্শকরা দেখেন শ্লেটের পরিষ্কার দুটি দিক। এরপর শ্লেটটা চাপিয়ে রাখি

অন্য একটা শ্লেটের ওপর। এমনভাবে চাপাই, আলগা টিনের শিটটা তলার শ্লেটের ওপরে গিয়ে পড়ে। এ-বার ওপরের শ্লেটটা তুললেই দর্শকরা দেখতে পান, আত্মার লেখা। খস্‌-খস্‌ আওয়াজটা করি ফাড়া নখ শ্লেটে ঘষে।

যা লিখছি সে নাম যদি দর্শকরা না চান? শত শত অনুষ্ঠানে শ্লেট-লিখন দেখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি আমার লেখা নামটি দর্শকদের মধ্যে কেউ না কেউ চেয়েছেন। প্রয়োজনে লটারি করে নাম নির্বাচন করেছি। কাগজের টুকরোয় দর্শকরাই নাম লিখেছেন, পাত্রে নাম লেখা কাগজ ফেলে নিজেরাই লটারি করে নাম তুলেছেন। এটুকু দর্শকরা বুঝতে পারেননি হাতের কৌশলে তাঁদের কাগজগুলো পালটে গিয়ে আমারই লেখা কতকগুলো কাগজের টুকরো সেখানে এসে গেছে। ফলে, আমার নির্বাচিত নামই তুলতে বাধ্য হয়েছেন দর্শক।

স্বামী অভেদানন্দ যে যোগানন্দেরই নাম লিখবেন সেটা কিলার জানলেন কী করে? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। উত্তরে জানাই—অভেদানন্দ ও কিলার এই প্ল্যানচেটে বসার আগের দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট আর এক প্ল্যানচেটের আসরেও অভেদানন্দ তাঁর গুরুভাই যোগানন্দর আত্মাকে আনতে অনুরোধ করেছিলেন। যোগানন্দের নাম শ্লেটে লিখে রেখেও কিলার ঝুঁকি নিতে চাননি বলেই অভেদানন্দকে বলেছিলেন—আপনি যাকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না।

ভূতের ভরে হাজার হাতির বল

'ভূতে ভর' মানেই শাশ্বত আত্মার প্রমাণ। এমনও কিছু লোক আমি দেখেছি, যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থাশীল নন, কিন্তু ভূতের অস্তিত্বে পরম-বিশ্বাসী। কারণ এঁরা নিজেদের চোখে ভূতে পাওয়া মানুষের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখেছেন।

এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এখন স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার। তিনি সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করে তারপর গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে ভালবাসেন। আর সেই কারণেই ভূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। তারই সুবাদে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। তবু মনের কোণে কোথাও বোধহয় খট্‌কা একটা ছিল। তাই আমাকে বলেছিলেন নিজের চোখে দেখা কাকিমাকে ভূতে পাওয়ার ঘটনা। আমার কাছে ব্যাখ্যার প্রত্যাশাতেই তিনি ঘটনাটা বলেছিলেন।

সালটা সম্ভবত ১৯৫৬। স্থান—হাসনাবাদের হিঙ্গলগঞ্জ। গোবিন্দবাবু তখন সদ্য কিশোর। একান্নবর্তী পরিবার। গোবিন্দবাবুর কাকার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। কাকিমা সদ্য তরুণী এবং সুন্দরী। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক ঘর, ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, আঁতুরঘর নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি। বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে পুকুরপাড়ে পায়খানা। পায়খানার পাশেই একটা বিশাল পেয়ারাগাছ।

গাছটায় ভূত থাকত বলে বাড়ির অনেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই সন্ধের পর সাধারণত কেউই, বিশেষ করে ছোটরা ও মেয়েরা প্রয়োজনেও পায়খানায় যেতে চাইত না। এক সন্ধের ঘটনা, কাকিমা পায়খানা থেকে ফেরার পথ অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগলেন। ছোটদের দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন, কথা বলছিলেন নাকি গলায়। বাড়ির বড়রা সন্দেহ করলেন কাকিমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই কাকিমাকে জেরা করতে লাগলেন, 'তুই কে? কেন ধরছিস বল?' ইত্যাদি বলে। একসময় কাকিমা বিকৃত মোটা নাকি গলায় বললেন, 'আমি নীলকান্তের ভূত। পেয়ারা গাছে থাকতাম। অনেকদিন থেকেই তোদের বাড়িতে ছোট বউয়ের উপর আমার নজর ছিল। আজ সন্ধেরাতে খোলা চুলে পেয়ারাতলা দিয়ে যাওয়ার সময় ধরেছি। ওকে কিছুতে ছাড়ব না।'

পরদিন সকালে এক ওঝাকে খবর দেওয়া হল। ওঝা আসবে শুনে কাকিমা প্রচণ্ড রেগে সকলকে গাল-মন্দ করতে লাগলেন, জিনিস-পত্র ভাঙতে লাগলেন। শেষে বড়রা কাকিমাকে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

ওঝা এসে মন্ত্রপড়া সরষে কাকিমার গায়ে ছুড়ে মারতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতের প্রহার। কাকিমার তখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ক্লান্ত নীলকান্তের ভূত কাকিমাকে ছেড়ে যেতে রাজি হল। ওঝা ভূতকে আদেশ করল, ছেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে একটা পেয়ারাডাল ভাঙতে হবে, আর একটা জলভরা কলসি দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে যেতে হবে।

সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে বিশাল একটা লাফ দিয়ে কাকিমা একটা পেয়ারা ডাল ভেঙে ফেললেন। একটা জলভরা কলসি দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে গেলেন। তারপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকিমা আবার অন্য মানুষ। চিঁ চিঁ করে কথা বলছেন, দাঁড়াবার সাধ্য নেই।

এরপর অবশ্য কাকিমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। বেশিদিন বাঁচেননি।

এ ধরনের ভূতে পাওয়ার কিছু ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি। আপনাদের মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই এই ধরনের এবং আরও নানা ধরনের ভূতে পাওয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন। এ সব ঘটনাগুলোর পিছনে সত্যিই কি ভূত রয়েছে? না, অন্য কিছু? বিজ্ঞান কি বলে? এই আলোচনায় আসছি।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া

আপনারা যাঁদের দেখে মনে করেন, এঁদের বুঝি বা ভূতে পেয়েছে, আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া মানুষগুলো প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী। এইসব মানসিক রোগীরা এমন অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে দেখান, যে সব ঘটনা সাধারণভাবে স্বাভাবিক একজন মানুষের পক্ষে ঘটানো অসম্ভব।

যেহেতু সাধারণভাবে আমরা বিভিন্ন মানসিক রোগ এবং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের

স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলার জন্য ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিজেদের কাছে হাজির করতে পারি না। কিছু কিছু মানসিক রোগীর ব্যাপার-স্যাপার তাই আমাদের চোখে যুক্তিহীন ঠেকে। আমরা ভেবে বসি—আমি যেহেতু এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি ভূতে পাওয়া ঘটনারই ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, আগ্রহ, ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান 'ভূতে ভর' বা 'জীনে পাওয়া' বলে পরিচিত মনের রোগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে।

এক : হিস্টিরিয়া (Hysteria),
দুই : স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schitzophrenia),
তিন : ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac-depressive)।

হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূতে পায়

প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিয়া নামের মানসিক রোগটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার দিনের ওঝা, গুণিন, বা জাদুচিকিৎসকরা সঠিক শারীর বিজ্ঞানের ধারণার অভাবে এই রোগকে কখনও ভূতে পাওয়া কখনও বা ঈশ্বরের ভর বলে মনে করেছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চোখে হিস্টিরিয়া বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে এইসব মানুষের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার চেয়ে বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ক কোষের সহনশীলতা যাদের কম তারা একনাগাড়ে একই কথা শুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। গোবিন্দবাবুর কাকিমার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছিল।

কাকিমা পরিবেশগতভাবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস লালন করতেন ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মানুষ মরে ভূত হয়। ভূতেরা সাধারণত গাছে থাকে। সুন্দরী যুবতীদের প্রতি পুরুষ-ভূতেরা খুবই আকর্ষিত হয়। সন্ধের সময় খোলা-চুলের কোনও সুন্দরীকে নাগালের মধ্যে পেলে ভূতেরা সাধারণত তাদের শরীরে ঢুকে পড়ে। ভূতেরা নাকি গলায় কথা বলে। পুরুষ ভূত ধরলে গলার স্বর হয় কর্কশ।

মন্ত্রতন্ত্রে ভূত ছাড়ানো যায়। যারা এ সব মন্ত্রতন্ত্র জানে তাদের বলে ওঝা। ভূতের সঙ্গে ওঝার সম্পর্ক সাপে-নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওয়া মানুষটিকে খুব মারধর করে তাই ওঝা দেখলেই ভূত পাওয়া মানুষ প্রচণ্ড গালাগাল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় অনেক কথাই কাকিমা তাঁর কাছের মানুষদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বিশ্বাসও করেছেন। শ্বশুরবাড়িতে এসে শুনেছেন পেয়ারাগাছে ভূত আছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ভুল করে অথবা তাড়াতাড়ি পায়খানা যাওয়ার তাগিদে কাকিমা চুল না বেঁধেই পেয়ারাগাছের তলা দিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তারপর হয় তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা এসেছে—আমি তো চুল না বেঁধেই পেয়ারাতলা দিয়ে এসেছি। গাছে তো ভূত আছে। আমি তো সুন্দরী, আমার উপর ভূতটা ভর করেনি তো? তারপরই চিন্তা এসেছে—নিশ্চয়ই ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আমাকে ধরেছে। ভূতের পরিচয় কী? ভূতটা কে? কাকিমা নিশ্চয়ই নীলকান্ত নামের একজনের অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনেছিলেন, ধরে নিলেন নীলকান্তের ভূত তাঁকে ধরেছে। তারপর ভূতে পাওয়া মেয়েরা যে ধরনের ব্যবহার করে বলে শুনেছিলেন, সেই ধরনের ব্যবহারই তিনি করতে শুরু করলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কাকিমা অতি ভদ্র পরিবারের মেয়ে। ভূতে পাওয়া অবস্থায় তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিয়েছিলেন সে-সব শেখার কোনও সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। তবে সে সব গালাগাল তিনি দিয়েছিলেন কি ভাবে?'

আমার উত্তর ছিল—শেখার সম্ভাবনা না থাকলেও শোনার সম্ভাবনা কাকিমার ক্ষেত্রে আর দশজনের মতই অবশ্যই ছিল। ভদ্র মানুষেরা নোংরা গালাগাল করেন না। এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও তাঁদের জীবনের চলার পথে কাউকে না কাউকে নোংরা গালাগালি দিতে শুনেছেন।

ভরা কলসি দাঁতে করে তোলা বা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড লাফ দেওয়ার মত শক্তি প্রয়োগ হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে— তাঁকে ভূতে বা জীনে ভর করেছে। তার মধ্যে রয়েছে ভূত বা জীনের অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতা। ফলে সামান্য সময়ের জন্য শরীরের চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য শক্তিকে ব্যবহার করে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসাধ্য।

হিস্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে ভালমত জানা না থাকায় হিস্টিরিয়া রোগীদের নানা আচরণ ও কাজকর্ম সাধারণ মানুষদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে। তাঁরা এগুলোকে ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা বলে ধরে নেন।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমন কিছু সৈনিক চিকিৎসিত হতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ কিংবা অতীত স্মৃতি

হারিয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি। রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। অনবরত রক্তপাত, হত্যা, গোলাগুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না। মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে। বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালানোর ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায়।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়তা ঘটতে পারে। প্রতি বছরই প্রধানত মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসার জন্যে আসে যারা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে। চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না। মন বিশ্রাম নিতে চায় আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না। অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়। হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বাকরোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকারেরা ভোগেন।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি-নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন। এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা।

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহাত্তর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হত্যা করা হয়েছিল, হত্যাকারীরা কিছুটা সময়ের জন্য নিশ্চয়ই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সিজোফ্রেনিয়া বা স্কিটসোফ্রেনিয়া ও ভূতে ধরা

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। গতিময়তা মস্তিষ্ককোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা অর্থাৎ উত্তেজনা ও নিস্তেজনায় দ্রুত সাবলীলভাবে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশি তারা যে কোনও বিষয় চট্‌পট্‌ বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ককোষকে নিয়োজিত করতে পারে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ্, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণির মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ্, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণির মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তাঁরা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাঁদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তাঁরা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (cnsorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ রকমের হতে পারে। ১. দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical hallucination) ২. শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory

হারিয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি। রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। অনবরত রক্তপাত, হত্যা, গোলাগুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না। মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে। বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায়।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়তা ঘটতে পারে। প্রতি বছরই প্রধানত মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসার জন্যে আসে যারা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে। চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না। মন বিশ্রাম নিতে চায় আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না। অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়। হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বাকরোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকারেরা ভোগেন।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি-নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন। এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা।

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহাত্তর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হত্যা করা হয়েছিল, হত্যাকারীরা কিছুটা সময়ের জন্য নিশ্চয়ই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সিজোফ্রেনিয়া বা স্কিটসোফ্রেনিয়া ও ভূতে ধরা

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। গতিময়তা মস্তিষ্ককোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা অর্থাৎ উত্তেজনা ও নিস্তেজনায় দ্রুত সাবলীলভাবে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশি তারা যে কোনও বিষয় চট্‌পট্ বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ককোষকে নিয়োজিত করতে পারে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ্, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণির মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ্, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণির মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তাঁরা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাঁদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তাঁরা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (cnsorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ রকমের হতে পারে। ১. দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical hallucination) ২. শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory

হারিয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি। রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। অনবরত রক্তপাত, হত্যা, গোলাগুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না। মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে। বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায়।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়তা ঘটতে পারে। প্রতি বছরই প্রধানত মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসার জন্যে আসে যারা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে। চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না। মন বিশ্রাম নিতে চায় আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না। অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়। হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বাকরোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকারেরা ভোগেন।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি-নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন। এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা।

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহাত্তর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হত্যা করা হয়েছিল, হত্যাকারীরা কিছুটা সময়ের জন্য নিশ্চয়ই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সিজোফ্রেনিয়া বা স্কিটসোফ্রেনিয়া ও ভূতে ধরা

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের বিষয়ে বোঝার সুবিধের জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। গতিময়তা মস্তিষ্ককোষের একটি বিশেষ ধর্ম। সবার মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা অর্থাৎ উত্তেজনা ও নিস্তেজনায় দ্রুত সাবলীলভাবে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। যাদের গতিময়তা বেশি তারা যে কোনও বিষয় চট্‌পট্‌ বুঝতে পারে। বহু বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের চিন্তায় বা আলোচনায় নিজের মস্তিষ্ককোষকে নিয়োজিত করতে পারে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ্‌, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণির মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ্‌, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণির মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তাঁরা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাঁদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তাঁরা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (cnsorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ রকমের হতে পারে। ১. দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical hallucination) ২. শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory

hallucination) ৩. স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস (tactile hallucination) ৪. ঘ্রাণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (olfactory hallucination) ৫. স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীক বিশ্বাস (taste hallucination)।

'ঘাড়ে চাপল প্ল্যানচেটের আত্মা' শিরোনামে যে ঘটনাটির কথা ইতিপূর্বে লিখেছি, সেই ঘটনাটি আর একবারের জন্য আপনাদের মনে করতে বলব। মঞ্জুদেবী ও তাঁর ছেলে স্কিট্‌সোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হয়েছিলেন।

ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ : গ্রামে ফিরলেই ফিরে আসে ভূতটা

আমাদের অফিসেরই রত্নাকর নামে এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বাড়ি ওড়িশার এক গ্রামে। একদিন তিনি আমাকে এসে জানালেন, কিছু দিন হলো ওঁর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। অনেক ওঝা, তান্ত্রিক, গুণিন দেখিয়েছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই এরা দেখার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য ভাল থাকে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এলেন।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের কম নয়। বউটির বয়স পঁচিশ। ফর্সা রঙ, দেখতে স্বামীর তুলনায় অনেক ভাল। দেশের বাড়িতে আর থাকে ওর দুই ভাসুর, এক দেওর, তাদের তিন বউ, তাদের ছেলে-মেয়ে ও নিজের দুই মেয়ে এক ননদ ও শাশুড়ি। বিরাট সংসারে প্রধান আয় খেতের চাষ-বাস। স্বামী বছরে দুবার ফসল তোলার সময় যায়। তখন যা স্বামীর সঙ্গ পান। হাত-খরচ হিসেবে স্বামী কিছু দেন না। টাকার প্রয়োজন হলে যৌথ-পরিবারের কর্ত্রী-মা অথবা বড় জায়েদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রথম ভূত দেখার ঘটনাটা এই রকম : একদিন সন্ধের সময় ননদের সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল। অথচ আশেপাশে দুর্গন্ধ ছড়াবার মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই রাতে খেতে বসে ভাতে গোরুর মাংসের গন্ধ পান বউটি, খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই রাতেই এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জানালার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ওঁকেই দেখছিল। পরের দিন ওঝা আসে। মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে। কিছু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন। খেতে বসলেই পাচ্ছেন গোরুর মাংসের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটির মুখ থেকেই জানতে পারি তাঁর মা ও বোনকেও এক সময় ভূতে ধরেছিল। ওঝারাই সারিয়েছে। বউটির অক্ষরজ্ঞান নেই। গোরুর মাংসের গন্ধ কোনও দিনও শুঁকে দেখেননি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ওঁকে। তাদের স্বামীরা দেশেই থাকে, দেখাশুনা করে

পরিবারের। অথচ বেচারি ছোট বউটিকে কোন সাহায্য করারই কেউ নেই। বরং মাঝে মধ্যে অন্য কোনও বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হতে কর্তামাও আমার রত্নাকরের বউটির বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটির কথায় বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় : অন্য জায়ের স্বামী যে চাষ করে ঘরে ফসল তোলে। আমার বর কী করে? টাকা না ঢাললে সবাই পর হয়। তা আমার উনি একটি টাকাও কস্মিনকালে উপুড়হস্ত করেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়ের বিয়ের জন্য জমাচ্ছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিষণ্ণতাই মহিলাটির মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, যার ফলে গোরুর মাংসের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নিয়েছেন তাঁর নাকে আসা গন্ধটি গোরুরই।

রত্নাকরকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থার কারণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিরকালের জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে চাইলে স্ত্রী-কন্যাদের কাছে এনে রাখতে হবে, তাদের দেখাশুনো করতে হবে, স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধেয় তার পাশে দাঁড়াতে হবে। সহকর্মীটির টাকার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকেদের নিয়ে সামান্য টাকায় মেস করে থাকেন। চড়া সুদে সহকর্মী ও পরিচিতদের টাকা ধার দেন। দেশের সংসারে সাধারণত টাকা পাঠান না। কারণ হিসেবে আমাকে বলেছিলেন, দেশের চাষের জমিতে আমার ভাগ আছে। চাষ করে যা আসে তাতেই আমার পরিবারের তিনটে প্রাণীর ভাল মতই চলে যাওয়া উচিত। মেয়েমানুষের হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভাল নয়, আর দরকারই বা কী? শাশুড়ি, ননদ, জায়েদের সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকাঠুকি হবেই। ও সব কিছু নয়। মেয়েদের ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয়তো সহকর্মীটি এই মানসিকতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমার যুক্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থই খরচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে বউকে কলকাতায় মাস চারেকের জন্য এনে রেখেছিলেন। বউটিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিষ্ক কোষে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভাল হতেই রত্নাকর তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বউটি আমাকেও অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন ওঁর স্বামীকে বলে অন্য পাড়ায় বাড়ি নিতে বলি। পাড়াটা বড্ড খারাপ। নষ্ট মেয়েরা খিস্তি-খেউড় করে, ওদের এড়াতে দিন-রাত ঘরেই বন্দি থাকতে হয়।

অনুরোধ করেছিলাম। খরচের কথা বলে রত্নাকর এক ফুঁয়ে আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিলেন। পরিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবার দেড়মাসের মধ্যেই বউটি আবার অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিল। রত্নাকরই আমার আমাকে খবর দেন,

'বউকে আবার ভূতে ধরেছে চিঠি এসেছে। কবে আপনি ওকে দেখতে পারবেন জানালে, বউকে সেই সময় নিয়ে আসব।'

বলেছিলাম, 'আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার অত নষ্ট করার মত সময় নেই যে, তুমি দফায় দফায় বউটিকে অসুস্থ করাবে, আর আমি ঠিক করব। তুমি যদি তোমার বউ ও মেয়েদের এখানে এনে স্থায়ীভাবে রাখ, তবেই শুধু ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা সম্ভব এবং তা করবও।'

রত্নাকর আমার কথায় অর্থ-খরচের গন্ধ পেয়েছিলেন, স্ত্রীকে আনেননি।

অধ্যায় : ছয়

‘আত্মা’ নিয়ে ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মগুরু

বেদ, উপনিষদ, গীতা'কে অভ্রান্ত মনে করে অনেকেই সাধারণভাবে এগুলোর থেকে কোনও একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে বলেন—ওমুক ধর্মগ্রন্থে আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে যে কথা লেখা হয়েছে, তা কি আপনি মানেন? যদি মানেন, তবে আত্মার অমরত্বের কথা কেন মানবেন না? আত্মা নিয়ে শংকরাচার্য থেকে অভেদানন্দ যা বলে গেছেন, তাকে সত্যি বলে মানেন?

উত্তরটাও এ'সব ক্ষেত্রে অতি সহজ সরল। আত্মা বিষয়ে বেদ, গীতা ও উপনিষদে রয়েছে পরস্পরবিরোধী বহু সংজ্ঞা। তাদের কোন্ সংজ্ঞা আপনি সতি বলে ধরবেন? যাই হোক—একদল যাঁরা আত্মাকে মন বলে মনে করেন, তাঁদে বলি—মনকে আত্মা বললে সেই আত্মাকে মানব না কেন? তবে মনে যেহেতু দেহবহির্ভূত কোনও কিছু নয়, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরই কাজ-কর্মের ফল, তাই মৃত্যুতেই মনের অস্তিত্বেরও মৃত্যু ঘটে। আর একদল, যাঁরা মনের স্রষ্টা মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে আত্মা বলে মনে করেন, তাঁদের বলি—কোনও ধর্মগ্রন্থে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে আত্মা বললে সেই আত্মার অস্তিত্ব মানব না কেন? সেই সঙ্গে এ'কথাও মানি মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরও মৃত্যু ঘটে।

বিভিন্ন প্রশ্নে বার-বার এসেছে ‘মরণের পারে’ বইটির কথা। লেখক— স্বামী অভেদানন্দ। তাঁর বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—বিশেষ এক ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যে যন্ত্রটির সাহায্যে মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্পতুল্য আত্মা বা মনকে ওজন করা সম্ভব। দেখা গেছে আত্মার ‘ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ’।

“এক আউন্সের তিনভাগ” বলতে সম্ভবত এক তৃতীয়াংশ বা চারভাগের তিনভাগ বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটাই হল এই—আত্মার ওজন নেওয়ার যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয়েই থাকে, তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যায়। এর পরেও আত্মার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে কোন্ যুক্তিবাদী? কোন্ বিজ্ঞানমনস্ক?

পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিজ্ঞান কিন্তু এমন কোনও যন্ত্রের অস্তিত্বের কথা আজও জানে না। স্বামী অভেদানন্দও জানাননি যন্ত্রটির নাম। এ-বিষয়ে

পরামনোবিজ্ঞানীরাও রা কাড়েননি। অথচ বাস্তবিকই এমন জব্বর আবিষ্কারের খবর শোনার পর আমার অন্তত জানতে ইচ্ছে করে আত্মা অর্থাৎ মনের ওজন মাপা সূক্ষ্ম যন্ত্রটির নাম, আবিষ্কারকের নাম, কত সালে যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, আবিষ্কারক কোন্ দেশের নাগরিক ছিলেন ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উত্তর কে দেবেন? কোনও পরামনোবিজ্ঞানী? না, 'মরণের পারে' গ্রন্থটির প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ? যুক্তিবাদীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে অধ্যাত্মবাদীদের চরম জয় প্রতিষ্ঠা করতে আত্মার ওজন মাপা যন্ত্রটি নিয়ে এগিয়ে আসছেন না কেন ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী শিবিরের নেতারা? সত্যিই এ এক পরম বিস্ময়। এ বিষয়ে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁর ভাববাদী শিবিরে চাপ সৃষ্টি করুন না—আত্মার ওজন যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসতে। চাপ দিলেই বুঝতে পারবেন ওঁদের দাবি কত আসার, কত মিথ্যাচারিতায় ভরা।

'মরণের পারে' গ্রন্থে প্রকাশিত বিদেহী আত্মার নানা ছবি অনেকেরই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওইসব ছবিই বইটির বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি লিখিতভাবেও একথা জানিয়েছেন আত্মার আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নেওয়া যায়। (মরণের পারে, পৃষ্ঠা-২৮)।

এমন ভিত্তিহীন আজগুবি কথার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যকে প্রকাশ করতে হলে বলতেই হয়—স্বামীজি এমন কথা লিখেছেন হয় অজ্ঞতা থেকে, নয় তো মিথ্যের দ্বারা আত্মার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে। 'বিদেহী আত্মা'র ছবি তুলতে কি বিশেষ কোনও ক্যামেরার প্রয়োজন হয়? আত্মার ছবি তোলা যায়, এমন ক্যামেরার নাম কী? স্বামীজি অবশ্য এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেছেন। গ্রন্থটি খুম কম করেও চল্লিশ বছর আগে লেখা। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে একটু ভাল ধরনের ক্যামেরার লেন্সও এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না, যার ফলে ক্যামেরার লেন্সে কুয়াশাময় আত্মা ধরা পড়ে, তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ক্যামেরায় ভূতের ছবি তোলার গপ্পো আড্ডায় বা মজলিশে বলা যায়, অথবা ধর্মের মোড়কে বইতে লিখে ফেলা যায় সহজেই, কিন্তু কোনও দিনই সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না। সত্য নয় বলেই সত্য প্রমাণ করা যায় না।

'মরণের পারে' বইয়ে প্রকাশিত ছবির চেয়ে বেশি ভৌতিক, বেশি জীবন্ত ছবি তুলতে কোনো ভূতের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় অতি সাধারণ কৌশলের যা ছবি তোলার প্রথম পাঠ শেষ করা ফটোগ্রাফারদের অজানা নয়। 'ডবল এক্সপোজার', 'সুপার ইমপোজ' বা কাচের সাহায্যে রিফ্লেক্স পদ্ধতিতে আলোর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বছর তিরিশ-পঁয়তিরিশ আগে আমার মত ছবি তোলায় আনাড়িও অনেক অদ্ভুতুড়ে ছবি তুলেছে। ওই একই পদ্ধতিতে 'মরণের পারে'র চেয়েও ভূতুড়ে ছবি তোলা তখনও সম্ভব ছিল, এখনও সম্ভব। তবে এখন ছবির কলাকৌশল এতই বেড়েছে যে 'হরর' ছবি দেখতে বসে অনেকেই স্থান-কাল ভুলে

এয়ারকন্ডিশনড হলে বসেও আতঙ্কে ঘেমে ওঠেন।

স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' গ্রন্থটি যে আত্মা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এ কথা গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিজ্ঞাপিত। এই আত্মাসংক্রান্ত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার আকর গ্রন্থটির একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করে 'মরণের পারে' নিয়ে এই পর্যায়ের আলোচনায় ইতি টানতে চাইছি।

বিদেহী আত্মা কিভাবে আবার দেহ ধারণ করে, সে বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'গবেষণালব্ধ' এবং 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' থেকে বলছেন, 'মন' বা 'আত্মা' "আকাশের মধ্য দিয়ে বায়ুতে প্রবেশ করে, বায়ু থেকে মেঘ, সেখান থেকে বৃষ্টি বিন্দুর সঙ্গে তারা পড়ে ধরণীতে, তারপর খাদ্যের সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করে আবার তারা জন্ম নেয়।" (মরণের পারে; পৃষ্ঠা—৩৮)

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলেছেন, পিতামাতা এই দেহ গঠনের সহায়ক মাত্র, তাছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করে দেহ গঠনে সমর্থ হয় সূক্ষ্মশরীর। পিতামাতা আত্মাকে সৃষ্টি করেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা পিতামাতার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয় এবং প্রাণীবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্ম অসম্ভাব্যই থাকে।" (ওই গ্রন্থেরই পৃষ্ঠা-৬২)।

স্বামী অভেদানন্দ মানুষের জন্ম বিষয়ে যে ধারণা তাঁর অন্ধ ভক্ত ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, তা হলো, (১) বিদেহী আত্মা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে এবং খাদ্যের সঙ্গে যখন মানবদেহে প্রবেশ করে তখনই সম্ভব হয় নতুন জন্মের। অর্থাৎ নতুন জন্মের জন্য সঙ্গম অপ্রয়োজনীয়।

অর্থাৎ শারীরবিজ্ঞান পড়ে এতদিন আমরা ভুলই জেনেছি যে—সঙ্গমের ফলে নিক্ষিপ্ত পুরুষের শুক্রকীট নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে জরায়ুর ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে ফ্যালোপিয়ন টিউবের মধ্যে ঢুকে ওভামের সঙ্গে মিলিত হয়, অথবা টেস্টটিউব শিশুর ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে নিষিক্ত হয় এবং তার ফলেই গর্ভসঞ্চার হয়। (২) নতুন মানুষ জন্ম নেবে কি না তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে বিদেহী আত্মার ইচ্ছের উপর, সুস্থ-সবল জন্মদানে সক্ষম নারী-পুরুষের দেহ মিলনের সাহায্যে কখনই নতুন কোনও জন্ম দিতে পারে না কোনও আধুনিক প্রযুক্তিও।

এমন তত্ত্বকে মানলে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সমস্ত রকম ওষুধপত্তর ও সাজ-সরঞ্জামই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। (৩) খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলীতে পৌঁছনো সম্ভব। পাকস্থলী আর জরায়ু একই ব্যাপার!

আরও একটি প্রশ্নের প্রায়ই মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। প্রশ্নটা হল—বিজ্ঞানীরা আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে পরীক্ষা চালাতে একবার মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষকে নিশ্ছিদ্র বন্ধ কাচের বাক্সে রেখেছিলেন। ওই বাক্সে হাওয়া ঢোকা বা বেরিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথই ছিল বন্ধ। এই অবস্থায় বাক্সবন্দি লোকটির যখন মৃত্যু হল, তখনই বাক্সের কাচ গিয়েছিল ফেটে। সাধারণভাবে আপনা থেকে কাচ ভেঙে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই; তবু ভেঙে গেল। কাচের এই ভেঙে যাওয়া আত্মার শারীরিক অস্তিত্ব বা স্থূল আয়তনিক অস্তিত্বই প্রমাণ করে দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে আসায় বন্ধ বাক্সের বাতাসে বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাড়তি চাপই কাচ ভাঙার কারণ। এ'ছাড়া কাচ ভাঙার আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এমন প্রশ্ন শোনার পর অনেক পাল্টা প্রশ্নই করা যেতে পারে। যেমন—মৃত্যুপথযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার ব্যবস্থা ছিল কি না? থাকলে সেটা ঠিক কী ধরনের ব্যবস্থা? কারণ এ'ক্ষেত্রে বাড়তি বায়ু প্রবেশ ও নির্গমনের সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কোনও বাড়তি ব্যবস্থা না থাকলে তা শুধুমাত্র অমানবিকই নয়, বে-আইনিও। এমন বেআইনি কাজে শামিল হওয়া ব্যক্তিদের হত্যার অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটি হল, এ'তে নেহাৎই এক প্রচলিত গল্প কথা। এমন কোনও পরীক্ষা কিছু বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, এমন কথা বলার মত কোনও কারণ ঘটেনি। না, আজ পর্যন্ত কোনও ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী শিবির থেকেও এ ধরনের কোনও স্পষ্ট বক্তব্য হাজির করা হয়নি। যাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন হাজির করেন, তাঁরাও যা বলেন, সবই ভাসা ভাসা। কখনই বলতে পারেন না এমন গবেষণায় যুক্ত থাকা বৈজ্ঞানিকদের নাম, গবেষণা চালাবার স্থান, সময় ইত্যাদি। তাই এই নিয়ে এরপরও কেউ গা-জোয়ারি তর্ক তুলতে চাইলে বিনয় ও দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা বলি, “বেশ তো, আপনারা আপনাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করুন, তখন শুধু আমরা কেন তাবৎ দুনিয়াই আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেবে।”

অভেদানন্দের পরেই যার নাম ইদানীং নানা প্রশ্নে আমাদের সামনে আসে, তিনি হলেন নিগূঢ়ানন্দ। তাঁর 'জাতিস্মর' বইটির কথা তুলে অনেকেই প্রশ্ন করেন—বইটির ১২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, টেপরেকর্ডারে পরলোকগত আত্মার কণ্ঠস্বর ধরার কথা। এই বক্তব্যকে কি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবেন?

ব্যাপারটা সত্যি না হলে তো মিথ্যেই হয়। বিশ্বাসীদের প্রতি একটি অনুরোধ—তাঁরা নিগূঢ়ানন্দকে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য করুন না। আমরা এই বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে সমস্ত রকমভাবে নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করব, কথা দিচ্ছি। তিনি তাঁর দাবি প্রমাণ করতে পারলে খাঁটি যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে আমরা অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা থেকে বিরত থাকব এবং

অধ্যাত্মবাদের পক্ষে প্রচারকেই যুক্তিবাদী সমিতির লক্ষ্য করে নেব।

নিগূঢ়ানন্দ সাধনার কোন স্তরে পৌঁছেছেন, এ বিষয়ে তাঁর দাবিগুলো প্রাথমিক স্তরে নেড়েচেড়ে দেখি—আসুন।

যোগে শূন্যে ভাসা বা ভূমিত্যাগ নিয়ে নিগূঢ়ানন্দ কী বলেছেন দেখুন : বইটির নাম "আত্মার রহস্য সন্ধান।"

"মানুষের মধ্যে একটি অদ্ভুত চৌম্বক ক্ষেত্র আছে যাকে বলে কুল অর্থাৎ শক্তির কুণ্ড অর্থাৎ গর্ত। এই কুল কুণ্ড মানুষের দেহের লিঙ্গমূল ও গুহ্যদ্বারের মাঝখানে অবস্থিত। এই কুণ্ডের মধ্যে আছে অদ্ভুত একটি চুম্বকক্ষেত্র...এই চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি বেড়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষভাবে ব্যবহারের ফলে।" বিশেষ ব্যবহার কী? শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যত কমে ততই শক্তির তীব্রতা বাড়ে। তীব্রতা বাড়লে কী হয়? "দেহকুণ্ডে (গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্থানে) কার্বন জাতীয় কোন রাসায়নিক পদার্থ আছে"...শ্বাস নিয়ন্ত্রণের ফলে অর্থাৎ কমাবার ফলে "কুণ্ডস্থ তাপ দেহের ঊর্ধ্বদিকে উঠতে আরম্ভ করে...মেরুদণ্ডের গাঁটে গাঁটে ঊর্ধ্বগতি-শক্তির আঘাত যতই বেশি পড়তে থাকে ততই দেহটি কেঁপে ওঠে। তখন সারা দেহে অদ্ভুত শিহরন হয়। পথ পরিষ্কার হয়ে গেলে সে তখন মস্তিষ্কে উঠে গিয়ে এমন চাপ সৃষ্টি করে যে, মস্তিষ্ককে ফুটবলের ব্লাডারের মত ফুলিয়ে তুলতে চায়...মস্তিষ্কে এই শক্তি বায়ুর সংমিশ্রণে এমন এক গ্যাসীয় অবস্থার সৃষ্টি করে যে দেহের ভার বোধটাই যেন কম বোধ হয়। দেহ সুদ্ধুই তখন উপরে উঠে যায়। তখনই যোগে যাকে ভূমিত্যাগ বলে সেই অবস্থা অর্থাৎ levitation হয়।" (পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)

এ তো গেল যোগের গ্যাসে মাথা ব্লাডারের মত ফুলে গ্যাস বেলুনটি হয়ে শরীরটাকে শূন্যে তুলে রাখার যোগসম্মত তাত্ত্বিক আলোচনা। তা এমন তাত্ত্বিক আলোচনাতেই কী আমাদের তৃপ্ত থাকতে হবে? প্রয়োগের ব্যাপারটা আমাদের একবার দেখার সুযোগ করে দিলে আমরা তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যুক্তিবাদীরা যোগে মাথা ফুলে ব্লাডার হওয়ার তত্ত্বের প্রচারে আন্তরিকতার সঙ্গেই নেমে পড়তে পারি।

যাঁরাই আমাদের চিঠি দিয়ে বা মুখে বলেন নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তাঁদেরই অনুরোধ করি, এমন এক যোগী যখন জীবিত এবং হাতের কাছেই রয়েছেন, তখন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন না কেন, যাতে নিগূঢ়ানন্দ যোগে ভূমিত্যাগ করে আমাদের দেখান।

ওই বইটির ১১১ পৃষ্ঠায় লেখক আরও একটি সাংঘাতিক দাবি করেছেন। তিনি তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করেন এমন অনেকের প্রসঙ্গে বলেছেন, "সূক্ষ্ম দেহে ভিন্ন ব্যক্তি বা স্থান দর্শনের হুবহু বর্ণনাও তাঁরা দিতে পারেন। বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত এমন অভিজ্ঞতা আছে।"

শিষ্যদের ক্ষমতা থাকলে গুরুর থাকবে, এ তো জানা কথাই। সঙ্গে নতুন করে

জানলাম মনের আবার দর্শন ইন্দ্রিয় আছে এবং মনের চোখ না থাকলেও দেখার ক্ষমতা আছে। চক্ষুহীনদের দেখার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগের সাহায্য নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট হতে পারেন, বিশেষত দু-একজন উদ্যমী মন্ত্রী যখন হাতের কাছেই আছেন। এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্র ও তারও পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও যোগের প্রয়োগে তৎপর হতে পারেন, অন্ধত্ব নির্মূলের জন্যেই হতে পারেন।

আত্মা দেখতে পায়—জানলাম। কিন্তু কীভাবে বিভিন্ন স্থানে আত্মা যায়?

এ বিষয়েও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিগূঢ়ানন্দ, "সূক্ষ্ম সত্তা (আত্মা) যদি কুলকুণ্ডলিনীর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়ে তেজসম্পন্ন হয়, তবে তা এই অভিকর্ষকে এড়িয়ে—রকেটের মত পার্থিব মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে অনায়াসে অতিক্রম করে—ভিন্ন বিশ্বে, বা আমাদেরই বিশ্বের নতুন কোন সৌর জগতের আকাশে গিয়ে ভাসমান হতে পারে।" (ঐ বইয়ের পৃষ্ঠা ৯১)

আত্মা যখন অন্যগ্রহে পর্যন্ত রকেটের মত চলে যেতে পারে, তখন এই গ্রহের যে কোনও জায়গায় প্লেনের গতি প্রয়োগ করলেই যে পৌঁছে যাবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? যোগীর বিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আত্মা নিয়ে যেতে একটা হিরো হোন্ডা বা সুজুকি'র স্পিড তুললেই যথেষ্ট।

এরপরও যুক্তিবাদীরা বলতে পারেন, তাত্ত্বিক ব্যাপারটা না হয় হলো। কিন্তু প্রয়োগের ব্যাপারটা? নিগূঢ়ানন্দ যদি বাস্তবিকই আত্মাকে উড়িয়ে ভিন্নস্থানে নিয়ে কিছু বর্ণনা দিতে রাজি থাকেন, তবে অধ্যাত্মবাদের জয়জয়কারে নিজেদের নিয়োগ করতে যে সানন্দে রাজি—এ'কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। হে-নিগূঢ়ানন্দ ভক্তবৃন্দ, আপনারা একবার নিগূঢ়ানন্দকে রাজি করিয়ে ফেলুন। সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার দায়-দায়িত্ব আমরা বহন করতে এক পায়ে খাড়া।

নিগূঢ়ানন্দকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমাদেরই যদি নিতে বলেন, তবে বলি—আমাদের অনুরোধ-টনুরোধকে উনি পাত্তাই দিচ্ছেন না। আমাদের এক ফিচেল সদস্যের কথায়—এই কয়েক বছর আগে যুক্তিবাদীদের পাল্লায় পড়ে মহেশ যোগীর শিষ্যরা যোগে শূন্যে ভাসা দেখাতে গিয়ে যেভাবে ন্যাজেগোবরে হয়েছেন, তা কি আর কোনও বাবার অজানা আছে? এমন জানার পর কোন বাবার এমন বুকের পাটা হবে, যিনি তত্ত্ব ছেড়ে প্রয়োগও দেখাতে যাবেন!

আসলে মুশকিল হয়েছে কি—যে বাবাই আমাদের কাছে ক্ষমতা দেখাতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরই বুজরুকি এমনভাবে বেবাক ফাঁস হয়েছে যে চতুর বাবারা এখন তাদের দাবি-টাবিগুলো লেখা-পত্তর ও তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান।

হ্যাঁ, আর একটা বড় খবরই উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে যাচ্ছিলাম। লেখক নিগূঢ়ানন্দ তাঁর ওই গ্রন্থেরই ১২৩ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন, আত্মার পক্ষে "পার্থিব সূক্ষ্ম স্তরগুলোর অভিকর্ষ এড়িয়ে ভিন্ন গ্রহে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।" তিনি

ওই পৃষ্ঠাতেই আরও জানিয়েছেন লেখক "ভিন্নগ্রহে বিভিন্ন মাত্রায় জীব দর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন।"

মহাকাশ গবেষণায় ফি বছর হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ না করে, গ্যালাকসিতে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাণান্তকর পরিশ্রমে নিজেদের শরীরপাত না করে নিগূঢ়ানন্দের সাহায্য নিলেই তো পারেন।

সাহায্য না নেওয়ার একটা গুরুতর কারণ হতে পারে নিগূঢ়ানন্দের লেখা জনপ্রিয় আত্মা ও জাতিস্মর বিষয়ক বইগুলোই। তাতে অদ্ভুতুড়ে পাগলামির নিদর্শনের ছড়াছড়ি। যেমন—প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যেই রয়েছে চেতনা বা মন (আত্মার রহস্যসন্ধান; পৃষ্ঠা ৮৫)। ঐ গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি স্বামী অভেদানন্দের মতই নিজের অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়ে 'এক্টোপ্লাজম'কেই আত্মা ঠাউরেছেন। নিগূঢ়ানন্দের জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব আরও প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন দেখি তিনি বলেন, "পি. সি. সরকার সকলের ঘড়ির কাঁটার সময় কমিয়ে দিতে পারেন কী করে? এ-বিষয়টি তাঁকেই জিজ্ঞাস্য। অধিমনোবিজ্ঞানে একে বলে সম্মোহন বা Pk (Psycho kinesis)।" (জাতিস্মর, নিগূঢ়ানন্দ, পৃষ্ঠা—৮৫)

এত অলৌকিক ক্ষমতা, এত জ্ঞান, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু জানার পর ঘড়ির গণসম্মোহনের প্রচলিত একটা আষাঢ়ে গল্পকে তিনি সত্যি বলে ধরে নিলেন। ঘড়ির সময় পালটে দেওয়ার এই আষাঢ়ে গল্প বিভিন্ন সময়ে যে সব ভারতীয় জাদুকরদের ঘিরে চালু হয়েছিল; তাদের মধ্যে আছেন জাদুকর গণপতি, রাজা বোস, রয়-দি-মিসটিক এবং পি. সি. সরকার। পৃথিবীতে প্রথম যাঁকে নিয়ে এই আষাঢ়ে গল্পের শুরু, তাঁর নাম হাউয়ার্ড থার্সটন; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাদুকর। এই ধরনের জাদু বা গণসম্মোহন শুধুমাত্র গল্পেই সম্ভব। সম্মোহন ও জাদুর বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান থাকার দরুন এ'কথা বলছি। নিগূঢ়ানন্দের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভুল সম্মোহনকে Pk (Psycho kinesis)র সঙ্গে এক করে দেখা। Pk হল পরামনোবিজ্ঞানের এক অদ্ভুতুড়ে বিষয়। পরামনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বস্তুর উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। যেমন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পানীয় জলকে মদে পরিণত করা, বৃষ্টি থামিয়ে দেওয়া, বৃষ্টি নামানো, সমুদ্রের জলকে দু'পাশে সরিয়ে পথ করে নেওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের তথাকথিত ক্ষমতাই পরামনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় Pk। এবং এ'কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে পরামনোবিজ্ঞান অবিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানের নয়।

সম্মোহন হল সঞ্চারিত ধারণার ফলে মস্তিষ্কস্নায়ুকোষের এক ধরনের বিশেষ প্রতিক্রিয়া এবং এই প্রতিক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষয়, পরামনোবিজ্ঞানের বিষয় নয়।

নিগূঢ়ানন্দ লিখেছেন, "উরি গেলারের কাছে যান, তাকিয়ে থেকে তিনি ধাতব দণ্ড বাঁকিয়ে দিতে পারেন। অধিমনোবিজ্ঞানীরা একে বলেছেন—Pk। লেখকের

কাছে যোগ শিখেছেন এমন এক আমেরিকান মহিলা মিসেস রেনে'ও এই ক্ষমতার অধিকারিণী"। (জাতিস্মর, নিগূঢ়ানন্দ, পৃষ্ঠা—৮৬)

নিগূঢ়ানন্দজির অবস্থাটা পেঁয়াজের মত, যতই ছাড়াচ্ছি একের পর এক শুধু বিস্ময়ের খোসা। উরি গেলারের তাকিয়ে থেকে ধাতুর চামচ বাঁকাবার রহস্য আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগেই উন্মোচিত হয়েছে আমার কলমে। উরি চামচের হাতল তৈরি করতেন দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতলা পাত জুড়ে। গ্যালভানাইজ করে দুই ধাতুর জোড়াকে দেওয়া হত ঢেকে। তারপর খুব কাছ থেকে চামচের হাতলে ফেলা হত তীব্র আলো। আলোর উত্তাপে হাতল গরম হত। উত্তাপে দুটি ধাতুর পাত্রের প্রসারণ হত ভিন্ন রকমের। ফলে হাতল যেত বেঁকে। হে ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ড চযে ফেলা নিগূঢ়ানন্দ, উরির চামচ বাঁকাবার গূঢ় রহস্যটাই আপনি জানতেন না? বিজ্ঞানের এই কৌশলকে, উরির এই বুজরুকিকে আপনি Pk বলে দিব্যি চালিয়ে দিচ্ছিলেন! আপনার এক শিষ্য উরির মত তাকিয়ে ধাতু বাঁকাবার অধিকারী বলে জানিয়েছেন, তা তিনিও কি উরির মতই দু'ধাতু পাতের-কারবারী? হে আমেরিকান শিষ্যার গুরু, আমাদের প্রতি একবার কৃপা করে তাকিয়ে একটা চামচ কি পেরেক বাঁকিয়ে দেখিয়ে দিন। আপনার এমন ক্ষমতা চাক্ষুষ করে আমরা ধন্য হই। তারপর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রকেট গতি প্রাপ্ত হয়ে মহাবিশ্বে আপনার মাহাত্ম্য প্রচারে ঘুরে বেড়াই।

নিগূঢ়ানন্দজি, সম্মোহন নিয়ে আরও একটা মারাত্মক জ্ঞানের প্রমাণ আপনি রেখেছেন। আপনি লিখেছেন, "টেলিপ্যাথিতে সম্মোহনকারী তাঁর নিজের বিশ্বাস রোগীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।" (জাতিস্মর গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৫৩)

ধুর মশাই, এমন উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে ওঁচা 'মাল' নামিয়ে জনগণকে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যাবে ভেবেছেন নাকি? লেখার আগে একটু জানার চেষ্টা তো করবেন। জানেন যা, জানাবার চেষ্টা তার চেয়ে এতই বেশি যে বারবার ল্যাজেগোবরে হওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই।

নিগূঢ়ানন্দজি, 'অধিমনোবিজ্ঞানী' বা 'পরামনোবিজ্ঞান' যে নামেই ডাকুন, ওই তথাকথিত বিজ্ঞানটি মনে করে চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহিত হতে থাকে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিশ পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

এ তো গেল পরামনোবিজ্ঞানী নামধারী বিজ্ঞান-বিরোধী অধ্যাত্মবাদীদের ধারণা। কিন্তু তাঁদের ধারণা অনুযায়ী চিন্তা তরঙ্গের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। পরামনোবিজ্ঞানীদেরও চিন্তা তরঙ্গের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। পরামনোবিজ্ঞানীরাও চিন্তা তরঙ্গের ক্ষেত্রে শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত। রেডিও এবং টেলিভিশন

এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে। অস্তিত্বহীন চিন্তাতরঙ্গ ধরা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা। এবং এই অবাস্তব কল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা টেলিপ্যাথিও একটা কল্পনা বা বিরাট ধাপ্পা! (টেলিপ্যাথির পৃথিবী বিখ্যাত বহু বুজরুকির রহস্য উন্মোচিত হয়েছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে)।

আর 'সম্মোহন' ব্যাপারটা...; না, সে এক বিশাল অধ্যায় নিয়ে তাহলে বসতে হয়। 'সম্মোহন' বিষয়ে বিস্তৃত জানতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা পড়তে পারেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

অধ্যায় : সাত

থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেতচর্চা

থিওসফিক্যাল সোসাইটির রমরমা কমলেও মানুষের মন থেকে যে নির্মূল হয়নি, তার প্রমাণ মাঝে-মধ্যেই প্রায়ই উঠে আসে প্রশ্নের ভিতর দিয়ে। থিওসফিস্টরা প্রেততত্ত্ববিদ্। এক সময় বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই ছিলেন থিওসফিস্ট। তাঁদের নানা প্রেতচর্চার বিষয় নিয়ে এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব অ্যানি বেশান্ত (Annie Besant)-এর প্রেতচর্চার সাড়া জাগানো নানা ঘটনা নিয়ে বহু প্রশ্নই উচ্চশিক্ষিত একটি বিশেষ মহল থেকেই সাধারণত উঠে আসে। উঠে আসা প্রশ্নগুলি সাধারণভাবে সব সময়ই এই ধরনের—ওঁরা প্রত্যেকেই কি তবে মিথ্যাচারী ছিলেন? যে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রেততত্ত্ব নিয়ে চর্চা করত, প্ল্যানচেটে আত্মা নামিয়ে আনত, তাদের সম্বন্ধে সামান্য হলেও কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া তাই একান্তই জরুরি বলে মনে করি।

১৮৭৫ সালের ১৭ নভেম্বর থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাৎস্কিকে সামনে রেখে। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কর্নেল হেনরি অল্‌কট। ব্লাভাৎস্কি নাকি প্রেতাত্মাদের বা বিদেহী আত্মাদের খুব প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর আহ্বানে আলো-আঁধারি ঘরে প্রেতাত্মারা টেবিল ঠক্‌ঠক্ করত। বিদেহী 'মহাত্মা'রা রেখে যেতেন নানা লিখিত নির্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি। 'মহাত্মা' কারা? অল্‌কটের কথায়, 'মহাত্মা' এমনই একজন, যিনি নিজের অধ্যাত্মশক্তি ও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে উন্নত করে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখানে তিনি ক্ষুদ্র বাসনা-কামনার দ্বারা আচ্ছন্ন নন, নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন। পবিত্র, কামনাহীন।" (থিওসফিস্ট পত্রিকা, জুন, ১৯০১ সাল)

মহাত্মারা শুধু যে লেখাই পাঠাতেন, তেমন নয়। মাদাম ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে অনেক কথাও বলতেন। এক মহাত্মার ওভারকাটের পকেট থেকে জাপানি টি পট বের করে মাদাম ভক্তদের তা দেখিয়েও ছিলেন।

অল্‌কটের জীবনের এক প্রেতাত্মাঘটিত ঘটনার কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। এক প্রেতবৈঠকে অল্‌কট গিয়েছিলেন একটি গোলাপ নিয়ে। ৮... মিডিয়াম তাঁকে বললেন—গোলাপটি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরতে। যখন মিডিয়াম

মাদার ব্লাভাৎস্কি ও কর্নেল হেনরি অলকট

হাত খুলতে বললেন তখন মুঠো খুলে দেখেন গোলাপের ভিতর একটি সোনার আংটি। তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সিমলায় অল্কট তাঁর এক বান্ধবীকে বলছিলেন বিদেহী আত্মার আংটি দেওয়ার লোম খাড়া করা ঘটনার কথা। ঘটনাটি শুনে বান্ধবী আংটিটি নিজের হাতে নিয়ে দেখার কৌতূহল সামলাতে পারলেন না। অল্কট আঙুল থেকে আংটি খুলে বান্ধবীর হাতে তুলে দিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি বান্ধবীর হাতের মুঠোটা চেপে ধরলেন। মুঠো বন্দি হয়ে রইল আংটি। মাদাম আহ্বান জানালেন এক 'মহাত্মা'কে। তারপর মুঠো খুলতেই অবাক কাণ্ড! সোনার আংটি হয়ে গেছে তিনটে হিরে বসানো আংটি।

থিওসফিস্টদের আত্মা নামিয়ে কাণ্ডকারখানা ঘটানোর কথা সেই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জেনেছি মাদামের আহ্বানে আত্মাদের ঘণ্টা বাজাবার কথা, শূন্য থেকে জিনিস আনার কথা—ওমনি কত কী!

১৮৮৮ সালে মাদামের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Secret Doctrine' প্রকাশিত হল। প্রেততত্ত্ব বিষয়ক গুপ্ত বিদ্যা শিখতে বহু মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলল এই গ্রন্থটি।

১৮৯১ সালে মাদাম মারা গেলেন। তাতে কিন্তু থিওসফিক্যাল সোসাইটির রমরমা একটুও কমল না। কারণ ইতিমধ্যে বহু বিশিষ্টরাই তখন মাদামের বিশাল ভক্ত। ১৮৮২ সালে মাদাম ও অল্কটের আশীর্বাদ নিয়ে গড়ে উঠেছে 'বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি'। সভাপতি হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, সেই প্যারীচাঁদ এক সময় চিহ্নিত হয়েছিলেন, 'ডিরোজিয়ান হিসেবে', বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদী হিসেবে। সোসাইটির সহ-সভাপতি হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ও রাজা শ্যামাশংকর রায়।

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—নরেন্দ্রনাথ সেন। সহ-সম্পাদক—বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও মাদাম ও অল্‌কটের পায়ের ধুলো পড়ত প্রায়ই। ১৮৮২ সালেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীকে সভানেত্রী করে গড়ে উঠেছিল 'লেডিস থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা হয়ে উঠেছিল থিওসফি প্রচারের এক পত্রিকা। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এক সময়ের 'নাস্তিক' বলে চিহ্নিত শিশিরকুমার ঘোষও এক সময় ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে পরে একই সঙ্গে পরম বৈষ্ণব ও ঘোর থিওজফিস্ট বা প্রেততত্ত্ববিদ্‌ হয়ে উঠেছিলেন। অমৃতবাজারও সেই সময় থিওসফিস্টদের প্রশংসা করে অনেক লেখা প্রকাশ করেছে। এবং তারই পরম্পরা বজায় রেখে 'অমৃতবাজার' ও তাদের গোষ্ঠীরই বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' অক্লান্তভাবে প্রচার করে গেছে বৈষ্ণব ও থিওসফিস্ট ভাবধারা।

থিওসফিক্যাল সোসাইটি যে কি বিপুলভাবে প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে প্রভাব ফেলেছিল, তারই উদাহরণ—১৯০০ সালে সোসাইটির আমেরিকাতে শাখা ছিল ছ'শো এবং ভারতে তিনশো। আমেরিকায় সোসাইটি বিস্তৃতি লাভ করেছিল যার কাঁধে ভর দিয়ে, তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রাণপুরুষ উইলিয়ম জাজ।

থিওসফিস্ট অ্যানি বেশান্ত

আইরিশ রমণী অ্যানি বেশান্ত ভারতে আসেন ১৮৯৩ সালে। মাদাম ব্লাভাৎস্কির 'সিক্রেট ডকট্রিন' পড়ে তিনি মাদামের ভক্ত হয়ে ওঠেন, সেই সঙ্গে থিওসফিস্ট। অ্যানি ছিলেন সুবক্তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ব্লাভাৎস্কির মৃত্যুর পর বেশান্ত ও জাজ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সোসাইটির কাজকর্ম চালাতে থাকেন, অল্‌কট ছিলেন সোসাইটির সভাপতি। সহ-সভাপতি ছিলেন জাজ। মাদামের জায়গা দখলের লড়াইয়ে এক সময় আমরা নামতে দেখলাম জাজ ও বেশান্তকে। এক সময় বেশান্ত জাজকে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন অল্‌কটকে হটিয়ে দেবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য। জাজ এগিয়ে না আসায় বেশান্ত অল্‌কটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নামেন জাজকে অপদস্থ করার কাজে।

জাজ এই সময় মাদামের জায়গা দখল করার জন্য 'মহাত্মাদের' নানা লিখিত নির্দেশ হাজির করে থিওসফিস্টদের দেখাতে লাগলেন। এইসব চিঠিতে সোসাইটি ভালমত পরিচালনার নির্দেশও দিতেন বিদেহী মহাত্মারা। এমন মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বেশান্ত ও অল্‌কট জাজের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন। '৯৪তে। জাজ জানালেন—আমি বলছি মহাত্মাদের কাছ থেকে চিঠিগুলো পেয়েছি, এটাই কি যথেষ্ট নয়?

আনি বেশান্ত

থিওসফিক্যাল সোসাইটি থেকে জাজকে বহিষ্কার করা হল। কিন্তু থিওসফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকার শাখাগুলো জাজের সঙ্গেই রয়ে গেল, কারণ আমেরিকার থিওসফিস্টদের কাছে উইলিয়ম জাজের সততা মাদাম ব্লাভাৎস্কির সততার মতই প্রশ্নাতীত ছিল।

অ্যানি বেশান্ত থিওসফিস্টদের কাছে নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে জানালেন, 'মহাত্মা'রা পৃথিবীর যে মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, নির্দেশ পাঠান, তিনি জাজ নন, অ্যানি বেশান্ত। বেশান্ত আরও জানালেন ঈশ্বর বা পরমপিতা অথবা আল্লা যে নামেই তাদের ডাকি না কেন, সেই সর্বশক্তিমান পৃথিবী শাসন ও পরিচালনা করেন মহাত্মাদের অর্থাৎ মহৎ আত্মাদের সাহায্যে। ঈশ্বরের মুখ্য প্রতিনিধি সনৎকুমার। তাঁর বাস গোবি মরুভূমিতে। জগৎসংসার চালাচ্ছেন মনু। তাঁকে সাহায্য করছেন অগস্ত্য, কুথুমি, মোরিয়া, বুদ্ধ, খ্রিস্ট, জরথুস্ট্র ইত্যাদি মহাত্মারা।'

বেশান্ত তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতায়, প্রচারযন্ত্র, বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগানোর সফলতায় দেশ-বিদেশে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রোতাদের সামনে বক্তব্য রাখতেন, "আমার সামনে আপনারা যেমন আছেন, মহাত্মারাও তেমনইভাবে আছেন—আছেন—আছেন"।

অ্যানি বেশান্ত প্রেতচক্রের আসর বসাতেন। আত্মাদের দিয়ে ঘণ্টা বাজাতেন, বাজনা বাজাতেন, ফুল নিয়ে আসতেন—এমনি অনেক সহজ-সরল ম্যাজিক

দেখিয়ে মাত করে দিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে আত্মাদের ঘটানো অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানার গল্প বলে চমক লাগিয়ে দিতেন। সে সব গল্পের কিছুটা হদিশ দিতে বহু থেকে একটি উদাহরণ এখানে হাজির করছি।

১০ জুন ১৮৯৪ 'মাদুরা মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অ্যানি বেশান্ত বলেন—বিদেহী আত্মার সাহায্যে শূন্য থেকে কতই না জিনিস আনা যায়। টেবিল, বই বা অন্য কিছুর প্রয়োজন হলে সেগুলোর কাছে না গিয়ে সেগুলোকেই নিজের কাছে আনা যায় আত্মার সাহায্য নিয়ে। মাদাম ব্লাভাৎস্কি পেসেন্স তাস খেলতে ভালবাসতেন। আমি দেখেছি, তিনি যখন যে তাস নিয়ে খেলতে চাইতেন তাসগুলো আপনা থেকে তাঁর হাতে এসে যেত।

বেশান্ত আত্মার অমরতার পাশাপাশি জন্মান্তর ও কর্মফলের পক্ষেও প্রচার চালান। নীচবংশে জন্মান ও গরিবির জন্য তিনি দ্বিধাহীনভাবে কর্মফলকেই দায়ী করেছিলেন। বোম্বাইয়ে ভয়াবহ প্লেগ দেখা দেওয়ায় বেশান্ত ঘোষণা করেছিলেন—কর্মফলই এই রোগভোগের কারণ। বেশান্ত আরও ঘোষণা করলেন পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন হিন্দু পণ্ডিত, এই জন্মে পাশ্চাত্যে জন্মে সেখান থেকে বস্তুবাদের বা জড়বাদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন উদ্দেশ্য বস্তুবাদ বা জড়বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করা। এখন তিনি জড়বাদকে নস্যাৎ করে দেওয়ার শক্তি অর্জন করে ফিরে এসেছেন আপন বাসভূমিতে। নিজের নাম ঘোষণা করলেন আন্নাবাঈ, অ্যানি থেকে আন্নাবাঈ। তাঁর এমনতর হিন্দু সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দেওয়া ঘোষণায় ভারতের প্রচুর মানুষ আবেগে আপ্লুত হলেন।

১৮৯৩-এর শেষে আন্নাবাঈ বিশাল প্রচারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বক্তৃতাসফর শুরু করলেন। থিওসফি বা 'প্রেততত্ত্ব' বা 'মহাত্মা'দের বিষয়ে যত বললেন, তার চেয়ে বেশি বললেন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে। ভক্ত ভারতীয় হিন্দুদের মন তাতে সিক্ত হল।

ভারতের নানা জায়গায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে অ্যানি থিওসফিস্ট ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনীতির জগতেও প্রবেশের দিকে পা বাড়ালেন। অ্যানি 'পায়োনিয়ার' পত্রিকায় চিঠি লিখে জানালেন—হিন্দুধর্ম রাজভক্তি আনুগত্য বজায় রাখার অতি সহায়ক। চিঠিতে বেশান্ত পাশ্চাত্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অমানবিক ও ভয়াবহ বলে বর্ণনা করে লিখলেন—এ'সব কারণেই ইংলন্ড এখন আরও বেশি বেশি করে রাজতন্ত্রকেই আঁকড়ে ধরছে। অ্যানি এও জানালেন, ভারতবর্ষ সফর করে এই দেখে খুশি যে ভারতবাসীরা শাসক রাজশক্তির প্রতি শাসিত প্রজাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে উজ্জীবিত। তিনি এও জানালেন—প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান যে শুরু হয়েছে, তার শুভময় ফলেই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ থেকে শিক্ষিত হিন্দুরা সরে গিয়ে রাজভক্ত হচ্ছে।

পায়োনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠি ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রধান খবরের কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রতি ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ভক্তি ও আনুগত্য বাড়িয়ে তুলতে হিন্দুধর্ম আন্দোলন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ছিলেন বেশান্ত। সেকথা প্রকাশিত হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ এর ইংরেজি দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ও ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ 'মাদ্রাজ টাইমস' পত্রিকায়।

১ এপ্রিল ১৮৯৯-এ 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হল অ্যানি বেশান্তের আরও ভয়াবহ বক্তব্য। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, "Hinduism and Loyalty"। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, আমার মতে গণতন্ত্রের পথ ভাল ফল দেবার মত নয়। ... গণতন্ত্র ভারতীয় মানসিকতার পক্ষে অনেক দূরের জিনিস। গণতন্ত্রের ফলে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীরা কারণ তাদের অশিক্ষিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় গ্রাস করবে।

"My view is that democratic methods are ill-fitted to bring about good results....I believe them to be alien from the spirit of the Indian people, and that the comparatively small class of educated Indians would be first to suffer from their successful introduction here, since they would be swamped by the uneducated."

অ্যানি বেশান্তের রাজভক্তির পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য যখন সভায় ও পত্রিকার পাতায় এসে হাজির হচ্ছে, তখন বালগঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা 'মারাঠা'য় সম্পাদকীয় লিখে জানানো হল—তাঁরা থিওসফিস্টদের মত মানুন না মানুন অ্যানি বেশান্তের উপর যে কোনওধরনের আক্রমণ হলে তার প্রতিবাদে সরব হবেন, কারণ বেশান্তের প্রচারের ফলে ভারতবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ বেড়েছে।

বেশান্তের উপর আক্রমণ তখন সত্যিই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেশান্তের ও অন্যান্য থিওসফিস্টদের আত্মা ও মহাত্মা নামানোর ব্যাপারটা যে পুরোপুরি বুজরুকি এবং জালিয়াতি, এ বিষয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল 'স্টেটসম্যান', 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'মাদ্রাজ মেল', 'মাদ্রাজ টাইমস' ইত্যাদি পত্রিকায়। এ'সব লেখাগুলো অবশ্য কোনও বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদীদের কলম থেকে উৎসারিত হয়নি, উৎসারিত হয়েছিল মিশনারিদের সমর্থকদের কলম থেকে।

'মডার্ন রিভিউ'এর ১৯১১ সালের নভেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল 'Mrs Besant Lifts Her Veil in London'। তাতে লেখা হল—শ্রীমতী

বেশান্ত ইংলন্ডে গিয়ে 'ইন্ডিয়ান আনরেস্ট' বিষয়ে বক্তৃতায় ইংরেজ বিচারপতিদের নিরপেক্ষতার কথা বলে একদিকে যেমন প্রশংসা করেন, অপরদিকে তেমনই ভারতীয় বিচারপতিদের পক্ষপাতদুষ্টতা বিষয়ে সমালোচনা করেন।

সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো এক প্রতারক, বুজরুক, ইংরেজ রাজতন্ত্রের স্বার্থরক্ষাকারী দেশীয় ধনী ও শিক্ষিতদের স্বার্থরক্ষাকারী মহিলা অ্যানি বেশান্তকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বসানো হলো ১৯২০ সালে। আমরা আরও দেখলাম অ্যানি বেশান্তের মৃত্যুর পর তাঁর নামে রাস্তা করতেও সরকারের বিবেক সামান্যতম কাঁপেনি।

কে জানে, হয়তো প্রতারককে জাতীয় সম্মান জানাবার একটা পরম্পরা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতারণাকেও সম্মানজনক করে তুলতেই এমন অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

অধ্যায় : আট

থিওসফিস্ট বনাম জাদুকর

উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকার বিখ্যাত থিওসফিস্ট শ্রীমতী ডিসডেবার'এর প্ল্যানচেটে আত্মা আনা নিয়ে নিউ ইয়র্ক শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্ল্যানচেট? না, প্লেন-চিট্? এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছিল আদালত কক্ষে।

কাহিনীর নায়িকা সম্ভ্রান্ত ডিস-ডেবার প্রেতচক্রের আসরে মাদাম ব্লাভাৎস্কির মতই প্রেতাত্মা ও মহাত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। প্ল্যানচেটের আসরে রাফায়েল, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি প্রমুখ পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মাকেই তিনি শুধু নিয়ে আসেননি, তাঁদের আত্মাকে দিয়ে ছবিও আঁকিয়ে নিয়েছেন। শেক্সপিয়ারের আত্মা তাঁর প্রকাশিত রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেছেন। শুনিয়েছেন আত্মার রচিত নতুন কবিতা। নিয়ে এসেছেন—অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শলেমন বা শার্লেমেন-এর আত্মাকে। সাদা একটুকরো কাগজকে চার ভাঁজ করে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের কপালে ছোঁয়াতেই ঘটে গেছে অলৌকিক ঘটনা। সাদা কাগজ খুলতেই দেখা গেছে, আত্মা এসে লিখে রেখে গেছে। সাদা-পাতার রাইটিং-প্যাড প্ল্যানচেট চক্রে রেখে দেখা গেছে পাতার পর পাতা লেখায় ভর্তি করে গেছে আত্মারা।

নিউ ইয়র্কের ধনকুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শ তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কন্যার বিদেহী আত্মার অনুরোধে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে দানপত্রের দলিল করে অর্পণ করতেই মার্শের নিকট আত্মীয়রা ডিস-ডেবারের বিরুদ্ধে মার্শকে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন আদালতে।

ডিস-ডেবার এতে সামান্যতম বিচলিত তো হলেনই না, বরং, এই ঘটনাটিকে প্রচারের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। স্থানীয় সমস্ত পত্রিকা যখন এমন একটা অসাধারণ পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগকারী মিডিয়ামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে নানা খবরে পাতা ভরিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের গোগ্রাসে গেলাতে ব্যস্ত, তখন সাংবাদিকদের কাছে ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন, তিনি এই মামলায় লৌকিক উকিল ছাড়াও দশজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিশারদের আত্মার পরামর্শ নিচ্ছেন। ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন—তিনি আজ পর্যন্ত আত্মাদের এনে

যতগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন, তার প্রতিটিই ঘটিয়েছেন নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা। এগুলোর পেছনে কোনও ফাঁকি ছিল না।

আদালতে আরও অনেক ঘটনাই জানা গেল। জানা গেল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের প্রথম জীবনে নাম ছিল এডিথা শলেমন। জন্মেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কিন দেশের কেন্টাকি প্রদেশে। বাবা ছিলেন বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। জীবনযাপনের তাগিদে অনেককে নির্বিবাদে ঠকিয়েছেন।

কুড়ি বছর বয়সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কার্লিমোর শহরে এডিথা নিজেকে হাজির করলেন এক লাস্যময়ী রমণী হিসেবে। প্রচার করলেন, তিনি হলেন ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-এর অবৈধ কন্যা, তাঁর মা ছিলেন বহুবল্লভা নর্তকী লোলা। অমনি হইহই পড়ে গেল, স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে এডিথার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো ফলাও করে।

এডিথা বিয়ে করলেন তরুণ যুবক ডাঃ মেসান্টকে। বছর ঘুরল না, এডিথা বিধবা হলেন। সেই সময় আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে সম্মোহন বিদ্যার বেশ রমরমা। এডিথা সম্মোহন বিদ্যা শিখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটু লাস্য ও একটু কূটবুদ্ধি। পসার জমে উঠতে দেরি হলো না। এমনি সময় অভিজাত বংশের ডিস-ডেবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ডিস-ডেবারকে বিয়ে করে নিজেকেও অভিজাত মহিলা করে তুললেন এডিথা।

এমনি সম্মোহন করতে করতেই একদিন সম্মোহনের আসরে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের শরীরে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটল। সেদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের সেরা ধনী আইনব্যবসায়ী লুথার মার্শ। বিদেহী আত্মা হিসেবে সেদিন হাজির হয়েছিলেন মার্শেরই মৃত পত্নী। কণ্ঠস্বর না মিললেও, বাচনভঙ্গি যথেষ্ট মিলে গেল, সেই সঙ্গে মিলে গেল কথা বলার সময়কার কয়েকটি মুদ্রাদোষ। শ্রীমতী ডিস-ডেবারের 'মিডিয়াম'-খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অভিজাত মহলে। নিত্য বসতে লাগল প্ল্যানচেটের আসর। মোটা অর্থের বিনিময়ে প্রিয়জনদের বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে লাগলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার।

একসময় শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আমন্ত্রণে বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মারাও হাজির হতে লাগলেন। বিশাল অর্থের বিনিময়ে অতীত দিনের শিল্পীদের বিদেহী আত্মা কয়েক দিনের মধ্যেই এঁকে দিতে লাগলেন ছবি। আরও যে-সব বিখ্যাত বিদেহী আত্মারা প্ল্যানচেট-চক্রে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা আগেই বলেছি।

গণ্ডগোল পাকাল মার্শের মৃত মেয়ের আত্মা এসে বাবাকে তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে বলায়। মার্শও দানপত্র করে দিলেন, আদালতেও শ্রীমতী ডিস-ডেবারের নামে প্রতারণার অভিযোগ এল। অভিযোগ যাঁরা আনলেন, তাঁরা বলতে চাইলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবারের গোটা প্ল্যানচেটের ব্যাপারটার মধ্যেই রয়েছে একটা ফাঁকি। আর, এই ফাঁকি প্রমাণ করতে আদালতে

হাজির করা হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz)।

আদালতে একদিকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী মিডিয়াম ডিস-ডেবার অন্য দিকে বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজ, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে কার্ল এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে দেখালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে এবং মাননীয় জুরিদের। কাগজটি এবার ডিস-ডেবারের হাতে দিয়ে বললেন ওটা চার ভাঁজ করতে। ডিস-ডেবার আর একবার কাগজটি পরীক্ষা করে চার ভাঁজ করলেন। জাদুকর কার্ল এবার কাগজটি নিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে কায়দায় নিজের কপালে বসিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে বললেন, "কাগজটা এবার আমার কপালে চেপে ধরে থাকুন।" শ্রীমতী ডিস-ডেবার কপালে কাগজটা চেপে ধরলেও কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলেন; একসময় জাদুকর কার্ল বললেন, "এবার কাগজটা কপাল থেকে তুলে ভাঁজ খুলুন।

ভাঁজ খুলতেই চমকে গেলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার, ভেতরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, অবাক হলেন জুরিরা এবং সেই সঙ্গে অবাক হলেন শ্রীমতীর এই খেলা দেখেই এতদিন যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরাও।

জাদুকর কার্ল এবার একটা রাইটিং-প্যাড দেখালেন, প্যাডের সব পাতাই সাদা। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে একদিক ধরতে দিলেন এক সাংবাদিককে, আর একদিক ধরলেন নিজে। একটু পরেই খস্‌খস্‌ করে লেখার আওয়াজ পেলেন সাংবাদিক। আওয়াজ থামতে খবরের কাগজ থেকে প্যাডটা বের করতেই দেখা গেল প্যাডের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।

বিস্মিত জুরিদের ও দর্শকদের যখন কার্ল বললেন—এই দুটো খেলার কোনটাই আত্মার সাহায্যে ঘটানো হয়নি, ঘটানো হয়েছে কৌশলের সাহায্যে—তখন আদালত কক্ষ বিস্ময়ে হতবাক্‌।

জাদুকর কার্ল দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে নিজের গোপন কৌশলগুলো ফাঁস না করলেও আপনাদের কৌতূহল মেটাতে আমিই ফাঁস করছি—শ্রীমতী চার ভাঁজকরা সাদা কাগজটা কার্লের হাতে দিতেই কপালে ঠেকাবার মুহূর্তে কার্ল তাঁর হাতে লুকিয়ে রাখা লেখায় ভরা চার ভাঁজ করা একটা কাগজের সঙ্গে পালটে নিয়েছিলেন।

[illegible]টও বদলে নিয়েছিলেন ঠিক সময় ও সুযোগমতো। প্যাডে লেখার [illegible]খস্‌ আওয়াজ তুলেছিলেন নিজের আঙুলের একটা নখকে ছুঁচলো করে মাঝামাঝি ফেড়ে রেখে।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের জেল হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল বিখ্যাত আত্মাদের আঁকা ছবিগুলো ছিল জাল।

উনিশ শতকের সেরা 'মিডিয়ামদ্বয়' ও দুই জাদুকর

উনিশ শতকে যে সব থিওসফিস্ট আত্মার মিডিয়াম হিসেবে যাঁরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন আইরা ইরাসটাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট (Willam Henry Davenport)। এঁরা দুই ভাই জন্মেছিলেন যথাক্রমে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো শহরে। ১৮৫৫ সালে জন কোল্‌স (John Coles) নামে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট ও থিওসফিস্ট এই দুই ভাইকে নিউইয়র্ক নিয়ে আসেন। অতি দ্রুত জন কোল্‌স-এর সহায়তায় নিউইয়র্ক জয় করলেন ওঁরা। প্ল্যানচেটের বিভিন্ন আসরে দু-ভাই এমন ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন যা সত্যিই অভূতপূর্ব। প্ল্যানচেটের আসরগুলোতে দু-ভাইকে দু-পাশে দুটো চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতেন দর্শকরা। একটা টেবিলের ওপর রাখা থাকত গিটার, ড্রাম, বিউগল, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি। দর্শকরা আত্মাকে আসার সহায়তা করতে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘটে যেত অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার। টেবিলের বাজনাগুলো আপনা থেকেই একে-একে বেজে উঠত (মাদাম ব্লাভাৎস্কির আত্মা এনে ঘণ্টা বাজানোর মত ব্যাপার)। আলো জ্বালতেই দেখা যেত শক্ত করে বাঁধা দু-ভাই বসে রয়েছেন দু-দিকের দুই চেয়ারে। অতএব এই রটনার পেছনে যে ওঁদের কোনও চতুরতা নেই, সেই বিষয়ে কারওরই কোনও সন্দেহ থাকত না। কখনো কখনো অদৃশ্য আত্মারা নেমে এসে টেবিলে টোকা মেরে আওয়াজ করে বিভিন্ন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এই সময়ও দু-ভাই টেবিল থেকে দূরে দুটো চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দু-ভাইয়ের প্ল্যানচেট আরও আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলো। নিউইয়র্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে। প্রতি শহরেই ওঁরা হাজির হতেন খাঁটি প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেবে। শহরে পৌঁছেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো মারফত শহরবাসীদের কাছে আবেদন রাখতেন—আপনারা শহরবাসীদের মধ্যে থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটা কমিটি করুন, কমিটির সদস্যরা আমাদের কাছ থেকে লক্ষ্য রাখবেন, যাতে আমরা কোনো কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করতে না পারি।

প্রতিটি শহরেই তৈরি হয়েছে কমিটি। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কমিটিই ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সত্যিকারের প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেব স্বীকার করে নিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজয় শেষ করে দু-ভাই গেলেন কানাডায়। কানাডার প্রতিটি বড় শহরকেই একইভাবে মজালেন। তারপর পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ডে। ১৮৬৪-তে এলেন ইংল্যান্ডে। ২২ সেপ্টেম্বর বসল এক অভূতপূর্ব প্ল্যানচেটের আসর। প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির হলেন প্রখ্যাত ধর্মযাজক ডাঃ জে. বি. ফার্গুসন।

সেদিনের আসরে আত্মারা এসে অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে গেল। ইংলন্ডের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলো রোমাঞ্চকর ভৌতিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এবং সেই সঙ্গে ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসনের মতামত—এঁরা দুজনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন খাঁটি মিডিয়াম। পরলোকগত আত্মাদের নিয়ে আসার ক্ষমতা এঁদের ঈশ্বরদত্ত।

এমন একটা জব্বর খবরে ইংল্যান্ডে হইচই পড়ে গেল। এ-শহর ও-শহর ঘুরে ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা এলেন চেলটেনহ্যাম শহরে। সেখানেও দুই ভাই একই ঘোষণা রাখলেন, শহরবাসীদের মধ্য থেকে একটা কমিটি তৈরি করে তাঁদের মিডিয়াম ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করলেন।

শহরবাসীরা যে কমিটি গড়লেন তাতে রাখলেন শহরের দুই শখের জাদুকর জন নিভিল ম্যাস্‌কেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক'কে (George Cooke)। দু'জনেই তখন বয়সে যুবক।

শহরের টাউন হলে প্ল্যানচেটের আসর বসল। হল ভর্তি। মঞ্চের পর্দা উঠতে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ফার্গুসন। আবেগপ্রবণ গলায় ঘোষণা করলেন, তাঁ ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন উইলিয়াম হেনরি ও আইর. ইরাস্‌টাস-এর রয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা। তাঁরা দু'-ভাই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারেন পরলোকের আত্মাদের।

দু'ভাই মঞ্চে আসার আগে হলের প্রতিটি দরজা ও জানালার পর্দা টেনে দেওয়া হলো, যেন বাইরের আলো না আসে। আহ্বান করা হলো শহরবাসীদের পরীক্ষা-কমিটিকে। কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন ম্যাস্‌কেলিন ও কুক।

মঞ্চে এলেন দু'ভাই। দুজনের পরনেই কালো পোশাক। মঞ্চে নিয়ে আসা হলো আলমারি বা ওয়ার্ডরোবের মতো একটা কাঠের ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ভেতরটায় আলমারির মতো কোনও তাক নেই। তবে দরজা রয়েছে। ক্যাবিনেটের ভেতরে পাতা হলো একটা লম্বা বেঞ্চ। বেঞ্চের দু'প্রান্তে দু'ভাইকে বসিয়ে পরীক্ষকরা তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। বেঞ্চের মাঝখানে, দু'ভাইয়ের থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হলো শিঙা, ঘণ্টা, বেহালা, গিটার ইত্যাদি। ক্যাবিনেটের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হল। নিভিয়ে দেওয়া হলো স্টেজের আলো, সারা হল জুড়ে অন্ধকার নেমে আসতেই বেজে উঠল ঘণ্টা, শিঙা, বেহালা ও গিটার। তারপর আওয়াজ পাওয়া গেল ক্যাবিনেটের দরজা খোলার। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে ছিটকে এসে পড়ল স্টেজের ওপরে।

আলো জ্বালতেই দেখা গেল দু-ভাই একইভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় বেঞ্চের দু-কোণে বসে রয়েছেন। ওঁরা এমনভাবে বাঁধা যে, সামান্য নড়াচড়ারও উপায় নেই। হাতের নাগালের বাইরে রাখা বাদ্যযন্ত্রগুলো তবে বাজাল কে? কে-ই বা দরজা খুলে ওগুলোকে ছুড়ে ফেলল? হলের প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ, বিস্মিত, শিহরিত। এমন অসাধারণ খাঁটি আত্মার খেলা অচিন্তনীয়। দুই ভাই সত্যিই অনবদ্য

'মিডিয়াম'। একটু ভুল বলেছি, বিস্মিত ও শিহরিত হয়েছিলেন দুজন দর্শক ছাড়া আর সব দর্শকই। এই দুজন হলেন শহরের শখের জাদুকর ম্যাস্কেলিন ও কুক। ম্যাস্কেলিন স্টেজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "গোটা ব্যাপারটাই বুজরুকি। দুই-ভাই এতক্ষণ আপনাদের যা দেখালেন, সেটা কিছু কৌশল ও অভ্যাসের ফল, এর সঙ্গে বিদেহী আত্মার কোনও সম্পর্ক নেই।"

ম্যাস্কেলিন-এর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসন ও দুই মিডিয়ামের ম্যানেজার। তাঁরা বললেন, "যদি কৌশলেরই ব্যাপার হয়ে থাকে, আপনি এমনি ঘটিয়ে দেখান না।"

ঠিক কথা। অনেক দর্শকই সমর্থন করলেন কথাগুলো।

ম্যাস্কেলিন একটুও ঘাবড়ে তো গেলেনই না, বরং দৃপ্তকণ্ঠে আবারও ঘোষণা করলেন, "দেখুন, এই খেলা দেখাতে গেলে কৌশল ছাড়া অনুশীলনেরও প্রয়োজন। আপনাদের কথা দিচ্ছি আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এদের সবগুলো ভৌতিক খেলাই ভূত ছাড়া করে দেখাব।"

ম্যাস্কেলিন যদিও তিন মাস সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু দু'মাসের ভেতরেই চেলটেনহ্যাম শহরবাসীদের সামনে হাজির হলেন ভূতহীন ভূতুড়ে খেলা দেখাতে। গোটা শহর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেল—ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের চেয়েও অদ্ভুত কাণ্ড অন্ধকারের বদলে আলোতে ঘটিয়ে দেখাবেন এই শহরের দুই জাদুকর ম্যাস্কেলিন ও কুক।

ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের খেলাগুলো আরও সুন্দর করে পরিবেশন করলেন এই দুই তরুণ জাদুকর। এমনকি দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকেও ডেকে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে বসালেন। দর্শকটির চোখ বেঁধে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে আর হাত দুটি বেঁধে দেওয়া হলো দু'পাশে বসে থাকা ম্যাস্কেলিন ও কুকের উরুর সঙ্গে। জাদুকর দুজন অবশ্য আগের মতোই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিলেন। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই শুরু হয়ে গেল বাজনা বাজা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা আপনা থেকেই গেল খুলে। দেখা গেল উৎসাহী দর্শকটি ও জাদুকর দুজন আগের মতোই বাঁধা রয়েছেন।

এই অদ্ভুত খেলা দেখিয়েই তাদের খেলা শেষ করলেন না দুই জাদুকর। আগের বাঁধনের ওপর আবার নতুন করে দড়ি বেঁধে গালা দিয়ে সিলমোহর করে দিলেন দর্শকরা। দুই জাদুকরের চার হাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো শুকনো ময়দা। এবার আপাতগ্রাহ্য কোনও কৌশল করার সুযোগ রইল না দু'জনের। কিন্তু কী আশ্চর্য। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ হতেই ক্যাবিনেটে রাখা বাজনাগুলো বাজতে শুরু করল। বাজনা থামতেই দরজা খুলে দেখা গেল, দুই জাদুকর আগের মতোই বসে আছেন। বাঁধনের সিলমোহর অটুট। চার হাতের চাপানো ময়দার একটুও তলায় পড়ে নেই।

ঐ অবস্থাতেই জাদুকরদের কথামতো ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটু পরেই জাদুকর দু'জন বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ক্যাবিনেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন। চার হাতের ময়দা ঠিক তেমনই হাতেই রয়েছে।

সম্পূর্ণ হতভম্ব দর্শকদের সামনে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। এবার স্টেজে আনা হলো একটা কাঠের বাক্স। স্টেজে এসে দর্শকরা বাক্সটাকে ভালোমতো পরীক্ষা করলেন। বাক্সটার ভেতর ঢুকে কোনোমতে হাত-পা গুটিয়ে বসলেন ম্যাস্‌কেলিন। ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে দেওয়া হলো। তালাবন্ধ বাক্সটি দড়ি দিয়ে বেঁধে সিলমোহর করে দেওয়া হলো। সিলমোহর করা বাক্সটি ঢুকিয়ে দেওয়া হল ক্যাবিনেটের মধ্যে। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই বেজে উঠল ভেতরে রাখা ঘণ্টা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, ম্যাস্‌কেলিন বসে রয়েছেন বাক্সের বাইরে। ম্যাস্‌কেলিনের অনুরোধে দর্শকরা এসে বাক্সটা পরীক্ষা করলেন। ডালার তালা তেমনই বন্ধ রয়েছে, অটুট রয়েছে বাঁধন আর সিলমোহর।

রাতের আঁধারে যে খেলা দেখিয়েছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা, তার চেয়েও অনেক বেশি গা-ছম-ছম, লোম খাড়া করা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়ে একদিনে শহরবাসীদের বিস্ময়ে পাগল করে ফেললেন, দুই শৌখিন জাদুকর।

পরবর্তীকালে এই দুই জাদুকর বিভিন্ন শহরে ঘুরে তাঁদের অদ্ভুত জাদুর খেলাগুলো দেখিয়েছেন। তবে প্রতিটি প্রদর্শনীর আগেই দর্শকদের সামনে বিনীতভাবে নিবেদন করেছেন—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আত্মার মিডিয়াম সেজে ঠক্‌বাজেরা যেসব বুজরুকির আশ্রয় নিচ্ছেন ও লোক ঠকাবার খেলা দেখাচ্ছেন, সেগুলোই এখন আপনাদের সামনে কোনও ভূতের সাহায্য ছাড়াই করে দেখাচ্ছি।

অলৌকিক বিশ্বাসে কোনও কিছু দেখার যে রোমাঞ্চ ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের 'অলৌকিক' প্রদর্শনীতে ছিল, ম্যাস্‌কেলিন ও কুকদের খেলায় তা ছিল না। এই দুজন তো বলেই দিচ্ছেন, তাঁরা মিডিয়াম নন, লৌকিক কৌশলের সাহায্যে খেলাগুলো দেখাচ্ছেন। কৌশলগুলো ধরতে না পারলেও পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা, অতএব অলৌকিক মিডিয়ামদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুই জাদুকরকে বছর দুয়েকের মধ্যে পিছু হঠতে হলো। মিডিয়ামদের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখতে ভিড় বাড়তে লাগলেও দুই জাদুকরের ভূতহীন ভূতুড়ে খেলায় দর্শক কমতে লাগল।

বুজরুকির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম তাদের প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন এই দুই জাদুকর ও ম্যাস্‌কেলিনের নবপরিণীতা বধূ।

লন্ডনের বিখ্যাত 'কৃস্টাল প্যালেস' থিয়েটারে কয়েক সপ্তাহব্যাপী জাদুর খেলা দেখাবার চুক্তিতে সই করলেন ম্যাসকেলিন। কৃস্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর আগে একটা মফস্‌সল শহরে জাদু প্রদর্শনী চলছিল। সেই শহরের গির্জার পাদ্রী ওঁদের জাদুর খেলা দেখে ঘোষণা করলেন—ওরা শয়তান। মানুষ কখনও এমন অলৌকিক

খেলা দেখাতে পারে না।

খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দু'দিন পরেই জাদু প্রদর্শনী শুরু হবার মুখে আক্রান্ত হলো থিয়েটার হল। বিশাল ক্ষিপ্ত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ওই পাদ্রী সাহেবও হাজির হয়েছিলেন দুই শয়তান নিধন করতে। সেদিন থিয়েটার হলের ম্যানেজার দুই জাদুকর ও নববধূকে ছদ্মবেশে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। বিশ্ব পেয়েছিল দুই মহান জাদুকরকে, বিশেষত ম্যাস্‌কেলিনকে, পৃথিবীর জাদুচর্চার ইতিহাসে যার অসামান্য অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

থিওসফিস্টদের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই

ভৌতিক-চক্রের থিওসফিস্ট ও পেশাদার মিডিয়ামরা সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ১৮৯১ সালে মিডিয়ামদের তাবৎ কৌশলের ওপর একটি বই প্রকাশিত হওয়ায়। বিশ্বের ভৌতিক চক্রের মিডিয়ামদের ইতিহাসে এতবড় আঘাত করা সম্ভবত হয়নি। লেখক হিসেবে কোনও নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছিল—'জনৈক মিডিয়াম প্রণীত'। বইটির নাম—Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed–A Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums–by a Medium।

বইটির নাম বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়াবে—"এক ভৌতিক মিডিয়ামের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—প্রতারক মিডিয়ামদের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা।—জনৈক মিডিয়ামের লেখা।"

বইটিতে ভৌতিক মিডিয়ামদের সমস্ত রকম আত্মা আনার কৌশল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশ্যই তার সঙ্গে ছিল প্রতিটি কৌশলেরই ব্যাখ্যা। বিদেহী আত্মা নামিয়ে বোর্ডে, শ্লেটে বা কাগজে লেখানো, বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাওয়া, টেবিলের ওপর টোকা মেরে আওয়াজ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, টেবিল, চেয়ার বা অন্য কোনও কিছুকে শূন্যে তুলে দেওয়া, দূর থেকে ভেসে আসা আত্মার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি মিডিয়ামদের ভৌতিক (?) কাণ্ড-কারখানা গুপ্ত কৌশলের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কী করে যেকোনও রকম বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নানারকম বাজনা বাজিয়ে আবার বাঁধনের ভিতর ফিরে যেতে হয়।

বইটি প্রকাশিত হতেই পেশাদার লোক-ঠকানো মিডিয়ামদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তারা উদ্ধারের উপায় হিসেবে বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে ও প্রকাশকের কাছ থেকে যতগুলো বই পেল সব কিনে পুড়িয়ে ফেলল। তবে, এই বই যেমন একদিকে পেশাদার মিডিয়ামদের আঘাত হেনেছিল তেমনি, অন্যদিকে বইটি পড়ে কিছু কিছু লোক নিজেরাই মিডিয়াম বনে লোক ঠকানোর ব্যবসায় নেমে গিয়েছিল।

মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনীষা হ্যারি হুডিনি

ধোঁকাবাজ মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক চরিত্র বিশ্বের সর্বকালের এক সেরা জাদুকর হ্যারি হুডিনিও (Harry Houdini) কিন্তু একসময় ওই বইটি পড়ে বন্ধনমুক্তি এবং আত্মা আনার নানারকম কৌশল রপ্ত করে তাঁর স্ত্রী বিয়াট্রিস-এর সহযোগিতায় দারুণ মিডিয়ামের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। পরবর্তী জীবনে হুডিনি অবশ্য মৃতের আত্মীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার নাম করে অর্থ লুটবার এই চেষ্টাকে অতি ঘৃণ্য বলে মনে করেন এবং অতি লাভজনক এই খেলা তিনি যে শুধু দেখানোই বন্ধ রেখেছিলেন তাই নয়, মিডিয়ামদের বুজরুকির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণাই করেছিলেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

আঠারো বছর বয়সে হুডিনির বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁরই ঘাড়ে। হুডিনি তখন সদ্য মিডিয়াম রহস্যের বইটি পড়েছেন। ছোট ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে জাদু দেখিয়ে রোজগারে নেমে পড়লেন। জাদু কোম্পানির নাম দিলেন 'হুডিনি ব্রাদার্স'। জাদুর খেলা হিসেবে হাজির করতে লাগলেন বন্ধনমুক্তির খেলা। ছোট ভাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে বাক্সটা তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডিনি বাক্সটির সামনে একটা পর্দা টেনে দিয়ে মুখটুকু শুধু পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে রেখে গুনতেন "এক...দুই... তিন..." মুহূর্তের জন্যে মুখটাকে নিয়ে যেতেন পর্দার আড়ালে, পরমুহূর্তে পর্দার ফাঁক দিয়ে যে মাথাটা বেরিয়ে আসত সেটা থিয়োডোরের মাথা। থিয়োডোর ঝটিতি পর্দা সরিয়ে ফেলতেন। কিন্তু হ্যারি হুডিনি তো কোথাও নেই! দর্শকরা এসে বাক্সের তালা খুলতেই দেখতে পেতেন বাক্সের ভেতর দড়ি বাঁধা জোড়া হাতদুটি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন হ্যারি।

উনিশ বছর বয়সে হ্যারি বিয়ে করলেন বিয়াট্রিস রাহানার'কে। বিয়াট্রিসদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে দু'জনের আলাপ। সেই আলাপই গাঢ়তর হয়ে বিয়েতে পরিণত হলো। বিয়াট্রিস রাহানার হলেন, 'বেসি হুডিনি'।

এবার নতুন জুটি তৈরি হলো—হ্যারি ও বেসি। পেট চালাবার তাগিদে হ্যারি ও বেসি পানশালাগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জাদুর খেলা দেখিয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করতেন। পরে হুডিনি দম্পতি সার্কাসে যোগ দিলেন। সার্কাসে খেলা দেখাতে বেশিদিন ভালো লাগল না। এই সময় মাথায় এলো নতুন ফন্দি, বিদেহী আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হলে কেমন হয়? হ্যারি ও বেসি দু'জনেরই স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি ছিল প্রখর, অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ছোট ছোট শহর ও শহরতলিতে এবার হুডিনি দম্পতি হাজির হলেন 'সাইকিক' বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী এবং আত্মার মিডিয়াম হিসেবে।

হ্যারি আগে থেকেই সেই সেই শহরের সমাধিক্ষেত্র ঘুরে সমাধিস্তম্ভের লেখাগুলো পড়ে শহরের মৃত লোকদের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতেন, সেই সঙ্গে ক্যানভাসার সেজে পানশালা, বিভিন্ন আড্ডা ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতেন আরও নানা রকমের খবর। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় লোকদেরও নিয়োগ করতেন। এরা বিভিন্ন পরিবারের নানা খবর জোগাড় করে দিত, সেই সঙ্গে প্রচার করে বেড়াত, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে হুডিনি দম্পতির কী অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন।

বিভিন্ন ধরনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আবার বাঁধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার নানা পদ্ধতির প্রয়োগে হ্যারি ও সঙ্গিনী বেসি আগেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতএব আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হিসেবে সঙ্গিনী বেসি যখন শহরে আগন্তুক হয়েও বিভিন্ন পরিবারের অনেক গোপন খবর বলে যেতেন, অথবা বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য হাজির করতেন তখন প্রত্যেকেই এগুলোকে বিদেহী আত্মার কাজ বলেই বিশ্বাস করতেন। এরই সঙ্গে হ্যারি যখন চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই নানা রকম ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়ে দেখাতেন, তখন বিস্মিত, শিহরিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো তাঁদের লোকান্তরিত প্রিয়জনদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এঁদের কৃপাপ্রার্থী হতেন। অর্থের বিনিময়ে কৃপা করতেন হুডিনি দম্পতি। পরবর্তীকালে হুডিনি দম্পতি এই লোক-ঠকানো মিডিয়ামের অভিনয় ছেড়ে দিয়ে পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তা তো আগেই বলেছি।

বন্ধনমুক্তির খেলায় নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে হ্যারি হুডিনি এমন সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছেন যে, ঘটনাগুলোর পেছনে লৌকিক কৌশল আছে জানা সত্ত্বেও দর্শকদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না।

দুটি ঘটনার উল্লেখ করে হ্যারি হুডিনির বন্ধনমুক্তির কৌশলগত ক্ষমতার পরিচয় রাখছি। সেই সঙ্গে এও বলে রাখি, হ্যারি কিন্তু তাঁর জীবনে এই ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলা দেখিয়েছেন বহুবার, বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে।

১৮৯৮ সালে শিকাগো শহরে পুলিশ বিভাগকে চ্যালেঞ্জ জানালেন হ্যারি হুডিনি—"আমাকে বন্ধ রাখার মতো কয়েদখানা শিকাগো শহরে তৈরি হয়নি।"

খবরটা পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হতেই শিকাগো পুলিশ গ্রহণ করল সেই চ্যালেঞ্জ। একগাদা সাংবাদিকের সামনে হ্যারি হুডিনির শরীর, পোশাক তন্ন-তন্ন করে খানা-তল্লাশি করে হাত-পা বেঁধে পুরে দেওয়া হলো জেলের সেরা সেলটিতে।

১৯০০ সালের কথা। সে সময় লন্ডনের 'আলহামরা' থিয়েটার হল যে কোনও শিল্পীর কাছেই মক্কা-মদিনা-কাশী-জেরুজালেম। আলহামরা থিয়েটার হলের কর্মকর্তা ডাণ্ডাস স্লেটার-এর সঙ্গে দেখা করলেন হ্যারি, দু-সপ্তাহের জন্য ওই হলে জাদু দেখাবার সুযোগ চাইলেন। স্লেটার বললেন, "তোমার ওই বাঁধন থেকে বেরিয়ে

আসার খেলাগুলোর যা বর্ণনা দিলে, তার ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। তুমি যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজের হাত-দুটো মুক্ত করতে পার, আমি নিশ্চয় তোমাকে দু-সপ্তাহের জন্য হল ছেড়ে দেব।"

স্লেটারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হ্যারি। দুজনে গেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেন্ডেন্ট মেলভিন-এর কাছে। স্লেটারের মতো নামী-দামি লোককে আসতে দেখে এবং আসার কারণ শুনে মেলভিন হ্যারি হুডিনিকে বললেন, "আমার হাতকড়ার মুখোমুখি হয়ে তুমি বড়ই ভুল করেছ, এ তোমার জাদু দেখাবার হাতকড়া নয়, তাছাড়া চাবিটা থাকবে আমার কাছে।"

হ্যারি হাসলেন। বললেন, "দেখাই যাক না, এতেও জাদু দেখাতে পারি কি না!"

মেলভিন এবার হ্যারির দুটো হাত একটা থামের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এসে হাতকড়া আটকে দিয়ে স্লেটারকে বললেন, "ও এখানে থাক, চলুন আমরা বরং একটু ঘুরে আসি। ফিরে এসে ওকে মুক্ত করা যাবে।"

মেলভিন ও স্লেটার কয়েক পা এগোতেই দেখলেন, তাঁদের পাশে এসে হাজির হয়েছেন হ্যারি হুডিনি।

এর পরে কী হয়েছিল নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে? ফল হয়েছিল এই, হ্যারি একদিকে যেমন 'আলহামরা' হলে দু-সপ্তাহের জন্য জাদু দেখাবার সুযোগ পেলেন আর একদিকে তেমনি পেলেন অসামান্য প্রচার—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতকড়াও হার মেনেছে মার্কিন মুল্লুকের তরুণ জাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। ঘটনাটা আরও একটু গড়িয়েছিল। দু সপ্তাহের বদলে জনতার দাবিতে একনাগাড়ে ছ'মাস আলহামরাতেই খেলা দেখিয়ে যেতে বাধ্য হলেন হ্যারি হুডিনি দম্পতি।

ওই অবস্থাতেই জেলের সেল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন হুডিনি।

পেশাদার মিডিয়ামদের লোক ঠকানোর মূল কৌশল হলো অন্ধকার বা চোখের আড়ালের সুযোগ নিয়ে দর্শকদের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটানো ও আবার আগের বাঁধনের মধ্যে ফিরে আসা।

থিওসফিস্টদের প্রতি বিজ্ঞানী হাক্সলের মজার চিঠি

পাশ্চাত্যের থিওসফিস্টরা শুধু যে আত্মা নামানো এবং ভূতপ্রেতদের নানা উদ্ভট পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন তাই নয়, তাঁরা নিজেদের কাজকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানাতেন প্রেতচক্রের আসরে যোগদান করার জন্য। একবার ডারউইনের বন্ধু ও তাঁর তত্ত্বের বিশিষ্ট সমর্থক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী টি. এইচ. হাক্সলে'র কাছে প্রেতচক্রের আসরে উপস্থিতি হওয়ার আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছলে তিনি থিওসফিস্ট

ভূতুড়ে গবেষকদের প্রতি প্রত্যুত্তরে লেখেন, "এই ভূতপ্রেতের গবেষণার একটিমাত্র ভাল দিক আমি দেখতে পাই, তা হল এতে করে আত্মহত্যার বিপক্ষে আরো একটি জোরালো যুক্তি পাওয়া যায়। আত্মহত্যার দরুন ভূত হওয়ার পরে প্রেতচক্র-প্রতি এক গিনি হারে ভাড়া করা মিডিয়ামের মুখ দিয়ে ভ্যাজর ভ্যাজর করার চেয়ে রাস্তার ঝাড়ুদারগিরি করে কষ্টেসৃষ্টে কোনওমতে বেঁচে থাকাও অনেক ভাল"।

(এঙ্গেলস তাঁর 'ডায়লেকটিকস অফ নেচার' গ্রন্থের 'ন্যাচারাল সায়েন্স ইন দ্যা স্পিরিট ওয়ার্ল্ড' প্রবন্ধে এটি উদ্ধৃত করেন।)

পাশ্চাত্য থিওসফিস্টদের বুজরুকি ফাঁসে জাদুকরেরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং বুজরুকদের চূড়ান্ত নাস্তানাবুদ করেছিলেন। ভারতবর্ষে সে সময়কার জাদুকরদের অনেকেই মাদাম ব্লাভাৎকস্কি ও বেশান্তের মতই অনেক অদ্ভুতুড়ে সব কাণ্ড-কারখানা যদিও মঞ্চে এবং সার্কাসের এরিনায় দেখাতেন, (সে সময় সার্কাসেও খেলার মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাবার চল ছিল) কিন্তু তাঁরা কখনই মাদাম বা বেশান্তের বুজরুকির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেননি। থিওসফিস্ট মুখোশ ছিঁড়ে সর্বসমক্ষে প্রতারকের মুখটা বে-আব্রু করে দেননি। তার একটা কারণ হতে পারে লড়াকু মানসিকতার অভাব। হতে পারে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে না যাওয়ার প্রবণতা। হতে পারে, এই সুযোগে কেউ কেউ জাদুকরদের বিজ্ঞানের কৌশলকে ভূতুড়ে ব্যাপার বা অলৌকিক ব্যাপার ভাবলে বাড়তি কিছু নাম বা কামিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া। যাই হোক, এটা ঐতিহাসিক সত্য সেদিন প্রাচ্যের জাদুকররাও থিওসফিস্টদের বুজরুকির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারতেন, কিন্তু আঘাত হানেননি।

অধ্যায় : নয়

অধ্যাত্মবাদী ঋষি অরবিন্দ

উচ্চশ্রেণির হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশের কাছে 'অধ্যাত্মবাদের শেষ কথা ঋষি অরবিন্দ'। ঋষি অরবিন্দের লেখা 'লাইফ ডিভাইন' আজও বহু বুদ্ধিজীবী ও ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে এক বিরাট ধোঁয়াশা, এক বিরাট রহস্য। আর শ্রীঅরবিন্দের যোগ যে 'রাজযোগ', 'বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ' ও 'তান্ত্রিক যোগ'-এর চেয়ে অনেক উচ্চমানের, সেকথা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'SRI AUROBINDO ON HIMSELF' গ্রন্থে। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ 'নিজের কথা' (প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি)।

'নিজের কথা'র ১১৮ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অতিমানস অবস্থার সঙ্গে অন্যান্য কিছু আধ্যাত্মিক নেতাদের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন : "দিব্য চেতনার যেমন বিভিন্ন পর্যায় আছে। রূপান্তরের ও তেমনি বিভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম হলো চৈত্য রূপান্তর, যাতে ব্যক্তিগত চৈত্যচেতনার মাধ্যমে সমগ্র সত্তা ভগবৎ সংস্পর্শ লাভ করে। তারপর আধ্যাত্মিক রূপান্তর, যাতে বিশ্বচেতনার মধ্যে সত্তা ভগবানে মিলিত হয়ে যায়। তৃতীয় হলো অতিমানস রূপান্তর, যাতে সব কিছুই দিব্য বিজ্ঞানময় চেতনাতে অতিমানসগত হয়ে যায়। এতেই হবে মন প্রাণ দেহের পূর্ণ রূপান্তর শুরু—আমার মতে তাই পূর্ণ রূপান্তর। ...কৃষ্ণের মন ছিল অধিমানসগত, রামকৃষ্ণের ছিল বোধিগত, চৈতন্যের ছিল চৈত্য-আত্মগত, বুদ্ধের ছিল উচ্চ মানসিক দীপ্তিগত। বিজয় গোস্বামীর সম্বন্ধে আমি জানি না—সম্ভবত সমুজ্জ্বল কিন্তু অনির্দিষ্ট। সবগুলিই অতিমানস থেকে স্বতন্ত্র।"

(আমি তো আগাপাশতলা বুঝিনি, আপনারা যাতে নিজেরা চেষ্টা করতে পারেন, তাই হুবহু তুলে দিলাম।)

শ্রীঅরবিন্দের এই অতিমানস যোগের ফল কী? বহু উদাহরণ এ নিয়ে হাজির করা যায় গ্রন্থটি থেকে। আমরা এখানে শুধু একটি উদাহরণ টানছি। আমরা এবার শ্রীঅরবিন্দের আত্মজীবনী 'নিজের কথা'র ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা থেকে সামান্য অংশ তুলে দিয়ে কৌতূহল মেটাব। তার আগে উদ্ধৃতিটি বোঝার সুবিধের জন্য একটা কথা জানিয়ে দেওয়া জরুরি। গ্রন্থটির প্রস্তাবনার শেষ পংক্তিতে লেখা আছে—শ্রীঅরবিন্দ

নিজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সরাসরি 'আমি' না বলে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বা উত্তমপুরুষে (Third person) 'তিনি' বা নিজের নাম 'শ্রীঅরবিন্দ' দিয়ে লিখেছেন। সে ভাবেই বইটি মুদ্রিত হয়েছে, যদিও কথাগুলো শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই লেখা।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "যখন সকলেই মনে করছে যে এবার ইংলন্ডের পতন আসন্ন ও হিটলারের জয় অবশ্যম্ভাবী, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে জার্মান বিজয়লাভের গতি থেমে গেছে, যুদ্ধের ফললাভ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে। এ'কাজটি তিনি করেছিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে হিটলারের পশ্চাতে রয়েছে মারাত্মক সব আসুরিক শক্তি, সুতরাং তাদের জয় হওয়া মানেই জগতের মানুষকে অশুভ শক্তির অত্যাচারের দাস হয়ে থাকতে বাধ্য করা," ..."শ্রীঅরবিন্দ আততায়ীদের বিরুদ্ধে আপন অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলেন, তাতে দেখলেন যে এতদিন পর্যন্ত জাপানীরা যে দ্রুত জয়ের পর জয়লাভ করেছিল তা থেমে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু উল্‌টে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের চরম ও মারাত্মক পরাজয় ঘটল।"

অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে হিটলারের অবশ্যম্ভাবী জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। জাপানের জয়যাত্রাকে থামিয়ে চরম পরাজয় ঘটিয়ে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

এ'সবই ছিল শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস শক্তি, অধ্যাত্মশক্তির করিশমা। মূর্খ যুদ্ধবিশারদ ও ঐতিহাসিকরা চরম অজ্ঞতার জন্যই জার্মানি ও জাপানের পরাজয়ের জন্য নানা লৌকিক কারণ হাজির করে থাকেন।

বড় বিস্ময় জাগে, যখন দেখি বিশ্বত্রাস সেনাশক্তিকে যিনি অধ্যাত্মশক্তির সাহায্যে মারাত্মকভাবে পরাজিত করতে পারেন। প্রশ্ন জাগে তিনি জার্মানি, জাপানের তুলনায় হীনবল ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে কেন ভারতের স্বাধীনতা এনে দিলেন না? বাস্তবিকই তাঁর দাবি মত আধ্যাত্মিক শক্তি থাকলে ভারতকে পরাধীনতা মুক্ত করতে সেই শক্তিকে প্রয়োগ করাই ছিল তাঁর মত এক 'স্বাধীনতা যোদ্ধা' 'দেশভক্তের' পক্ষে স্বাভাবিক! কেন তিনি এমন অসার দাবি করলেন? তবে কি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল, জেলে থাকাকালীন অলীক-দর্শনের মধ্য দিয়ে যার সূচনা? না কি সমস্ত দাবিই ছিল নেহাতই সাদা-সাপ্‌টা মিথ্যাচারিতা?

'অতুলনীয়' ও 'অনন্য' এই আধ্যাত্মিক নেতা গ্রন্থটির ৮৮ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছেন, "আমি আর মাথা বা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করি না—মাথার উপরদিকে যে উদার বিশালতা রয়েছে সেখান থেকেই চিন্তাগুলো আসে।"

এমন বক্তব্য পড়ে আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মনোরোগ চিকিৎসক মন্তব্য করেছিলেন, "এ'যুগে এমন কথা কোনও শিক্ষিত মানুষ বললে যে কোনও চিকিৎসকই তার মানসিক সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেন।"

ঐ গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্ন আমরা দেখি, "বেশি পড়াশোনা করলেই মাথা টন্‌টন্ করে...পড়তে পড়তে কিন্তু তা মনে রাখতে চেষ্টা করলে মনে হয় যেন বুকের মধ্যে কাজ হচ্ছে, মাথার মধ্যে নয়, তবু মাথাতেই কষ্ট হয় কেন?"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ জানাচ্ছেন, মন দু'রকম! একটা 'প্রাণগত মন', 'যে মন আছে বুকের মধ্যে। কিন্তু পড়া ও স্মরণ রাখা দৈহিক মনের কাজ। তবে মস্তিষ্কই এসব কাজের পরিচালনা করে, সুতরাং কিছু কষ্ট হলে সেখানেই তা হবে। মস্তিষ্কের পক্ষে সবচেয়ে আরামের কাজ হবে, চিন্তা এলে যদি দেহ ছেড়ে মাথার উপর থেকে তা করা যায় (আকাশ থেকে বা দেহের বাইরে অন্য স্তর থেকে) অন্তত পক্ষে আমি তাই করতাম, তাতে বেশ আরাম পেতাম।"

ব্রাকেটের মধ্যে "আকাশ থেকে...." বলে যে বাক্যটি লেখা আছে, তা আমার কোনও টীকা-টিপ্পনী নয়, শ্রীঅরবিন্দ লিখিত।

আমরা শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে জানতে পারলাম এক : মন দু'রকম। দুই : একটি মন থাকে বুকে। তাই পড়তে থাকলে মনে হয় বুকের মধ্যে কাজ হচ্ছে!! তিন : মাথাব্যথা হবে না যদি মস্তিষ্ক থেকে চিন্তা না করে আকাশ থেকে করা যায়!!!

বাঃ, বা-হঃ, বা-হাঃ!!!!

সত্যিই, অধ্যাত্মবাদ এমন চমকপ্রদ বিস্ময়করবাদ বলেই বোধহয় অনেকে বলে থাকেন, "যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখানেই অধ্যাত্মবাদের শুরু"। বাস্তবিকই কথাটা বড় খাঁটি। যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুপস্থিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারের শুরু, সেখান থেকেই আরম্ভ হয় অধ্যাত্মবাদের জয়যাত্রা।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরং আকর্ষণীয় হতে পারে বিবেচনায় এখানে তুলে দিচ্ছি।

১৯৩৮ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদী শ্রীমেঘনাদ সাহা ('ডক্টর' কথাটা মেঘনাদ সাহার নামের আগে ব্যবহারে বা না ব্যবহারে শ্রীসাহার অনন্যতার সামান্যতম হেরফের হবে না বিবেচনায় এবং বহু 'ডক্টর'দের ভিড় থেকে আলাদা করতে তাঁকে 'ডক্টর'হীন রাখলাম) শান্তিনিকেতনে একটা বক্তৃতা দেন। শিরোনাম ছিল, "একটি নূতন জীবনদর্শন"। সেখানে তিনি সুন্দর সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে

অধ্যাত্মবাদের অপ্রয়োজনীয়তা, নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাটি ঐ বছরই বিশ্বভারতী নিউজে প্রকাশিত হয়। তারপর বক্তৃতাটি বেশ কয়েকটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। এরই সূত্র ধরে সেই সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-এর বৈশাখ ১৩৪৬ সংখ্যায় পণ্ডিচেরির শ্রীঅনিলবরণ রায় শ্রীমেঘনাদ সাহার বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবাদী ও অধ্যাত্মবাদ বিরোধী মনোভাবকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। সেখানে স্বভাবতই গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে পণ্ডিচেরি আশ্রমের প্রাণপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের 'মহামূল্যবান' গ্রন্থ ও মতের কথা, আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার প্রাসঙ্গিকতার কথা। ততোধিক দীর্ঘ এক উত্তর দেন শ্রীমেঘনাদ সাহা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীসাহার ঐ 'প্রতিবাদ-প্রবন্ধ' প্রকাশিত হতে বিতর্ক আরও প্রসারিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত, বি.এ. শ্রীসাহার বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে এবং শ্রীঅনিলবরণ রায়কে সমর্থন জানিয়ে এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। সেখানেও অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর দর্শন প্রসঙ্গ। বহু বছর পর 'মেঘনাদ রচনা সংকলন'-এর সম্পাদক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়কে অনিলবরণ রায় একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, "মোহিনীমোহনের নাম দিয়ে আমি ঐ উত্তরটি লিখিয়াছিলাম, যাহাতে বাদানুবাদ করিয়া ডঃ সাহার সহিত personal bitterness না হয়"। ওই চৈত্র সংখ্যার ভারতবর্ষতেই শ্রীমেঘনাদ সাহার 'উত্তর-নিবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তর নিবন্ধ থেকে একটিমাত্র অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি।

"সমালোচক দুই-একজন পরলোকে বিশ্বাসবান্ বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়াছেন, যেমন Sir William Crookes ও Sir Oliver Lodge। ক্রুক্স্ এককালে Psychical Society-র সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। তিনি বহু Psychical experience সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিতেন এবং বলা বাহুল্য, এই সব গবেষণামূলক বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ লিখিয়া রাখিতেন। তিনি একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্ববিখ্যাত Royal Society-র সভাপতি পর্যন্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অধ্যাত্মবাদীগণ দাবী করিবেন যে তাঁহারা খুব একটি "বড় কাৎলা"কে বঁড়শীতে গাঁথিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু Crookes-কে যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদী নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা খুব সততার পরিচয় দেন না, কারণ তাঁহারা Crookes-এর অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চার ইতিহাস পরবর্তীকালে জানাইতে ভুলিয়া যান। Crookes একদিন অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক তাঁহার যাবতীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কাগজপত্র অগ্নিসাৎ করেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই সম্বন্ধে কোন কথাই মুখে আনিতেন না। লোকে কল্পনা-জল্পনা করে—"He was the victim of some confidence trick." বিলাতের ওয়াকীবহাল মহলে জনশ্রুতি এই যে, Sir Oliver Lodge "ভূতুড়ে" (Spiritualist)

হওয়ার পর তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকটা প্রতিপত্তি হারাইয়াছেন। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কিছু দান করেন নাই, "ভূতুড়ে বিজ্ঞান" কি দান করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই।"

ভিড় করে আসা প্রশ্নমালার ঝাঁপি এ'বার আমরা বন্ধ করব, তার আগে এটুকু আরও একবার মনে করিয়ে দেব—কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতে বিশ্বাস করলে, কোনও বিখ্যাত বিজ্ঞানী জ্যোতিষে বিশ্বাস করলে, তার দ্বারা ভূত বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সারবত্তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয়—অমুক বিখ্যাত ব্যক্তি প্রমাণ ছাড়াই দিব্যি ভূতে বিশ্বাস করেন। তমুক বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত 'প্রমাণ'কে অগ্রাহ্য করে আকাট অজ্ঞানীর মতই জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, কিংবা টেলিপ্যাথিতে।

বিজ্ঞানের দরবারে কারও ব্যক্তি-বিশ্বাসের এক কানাকড়িও দাম নেই, সে ব্যক্তিটি যত নামী-দামিই হোন না কেন। দাম নেই কোনও গ্রন্থে ছাপার অক্ষরে কী প্রকাশিত হল এবং কত মানুষ তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, তার উপর। সংখ্যাধিক্যের মতকে গ্রহণ করতে হলে আজও আমাদের পৃথিবীর চারপাশে সূর্য পাক খেয়ে বেড়াত। বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথ ধরে। এর কোনও বিকল্প নেই।

ঝাঁপি বন্ধের প্রাক্কালে যে কথাগুলো লিখলাম, সেগুলো নতুন কোনও কথা নয়। অনেক ব্যক্তি, অনেক সংগঠন, অনেক বিজ্ঞান মনস্ক-সমাজমনস্ক বলে চিহ্নিত পত্রিকা এ-জাতীয় হাঁসজারু মার্কা কথা নানাভাবে প্রচার করে আসছেন।

অধ্যায় : দশ

যুক্তির নিরিখে 'আত্মা' কি অমর?

অনেক অধ্যাত্মবাদী নেতা ও প্যারাসাইকোলজিস্টদের লেখায় ও কথায় আজকাল মাঝে-মধ্যেই ঝলসে উঠছে—'বিজ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে।' এমন আশাও লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে—অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ভূত ও পরলোকের অস্তিত্বকে মেনে নেবে।

এই ধরনের প্রচারের পিছনে কতটা সততা বা কতটা অসততা আছে, আসুন, আমরা যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ করে দেখি।

অধ্যাত্মবাদীদের দেওয়া 'আত্মা'র সংজ্ঞা থেকে আমরা যদি নির্যাস তুলে নিই, দেখব উঠে এসেছে প্রধান দুটি মত। এক : চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনই আত্মা। দুই : আত্মার কাজকর্মের ফলই মন। আগে এই প্রথম মতটিকে নিয়েই আলোচনা শেষ করে নিই।

মনের অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কখনই অস্বীকার করে না। 'মন'কে মেনে নেওয়া মানে আত্মাকেও মেনে নেওয়া, আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া—এমন অর্থ যদি কেউ করেন, করতে পারেন। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন, কাল কেউ যদি এসে আপনাকে বলেন, "আপনি কি স্বীকার করেন, মানুষের নাক আছে?" আপনি তখন কী বলবেন? নিশ্চয়ই বলবেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্বীকার করি।" তখন প্রশ্নকর্তা যদি বলেন, "আমি এবং আমার ভক্তরা নাককেই আত্মা বলি। এ'বার আপনি কি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারছেন?" তখন আপনি বলতেই পারেন, "আপনি যদি নাককে 'আত্মা' বলতে চান, বলতেই পারেন। সে বাক-স্বাধীনতা আপনার আছে। আমার নাকের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াকে আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া বলে আপনি প্রচার করতে পারেন, আপত্তি করব না। কিন্তু আপনি যদি এর পরের ধাপে বলে বসেন, 'আত্মা অমর', এবং আমি আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছি, অর্থাৎ আত্মার অমরতাকেও মেনে নিয়েছি, তবে এমন উদ্ভট কথার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। 'মানুষের নাকগুলো অমর', একজন সুস্থ স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমি কখনই এমন পাগলামো মেনে নিতে পারি

না। এটা স্পষ্ট করে বলি, 'নাক'-এর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কখনই 'নাক'-এর অমরতাকে মেনে নেওয়া নয়।"

ঠিক এই একই ধরনের যুক্তিতে, মনরূপী আত্মাকে অমর বলে কেউ দাবি করলে আমরা তাকে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পারি না।

যাঁরা প্রচার করেন—'বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে', তাঁরা আসলে এই ধরনের প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চান, বিজ্ঞান আত্মার অমরত্বকেই মেনে নিয়েছে।

বিজ্ঞান পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—মন, চিন্তা বা চৈতন্য মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরই ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কাজ-কর্মের ফল, মস্তিষ্ক বহির্ভূত কোনও বস্তু বা পদার্থ নয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা বা মনের অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পোকা-মাকড়দের চিন্তার ক্ষেত্রেও রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ সবচেয়ে উন্নত, তাই তার চিন্তা ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি, এই যা। মানুষের মৃত্যু ঘটলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বাস্তব অস্তিত্বই বিলীন হতে বাধ্য। কারণ মৃত্যুর পর সাধারণভাবে দেহও বিলীন হয় পুড়ে ছাই হয়ে, কবরের মাটিতে মিশে গিয়ে, অথবা বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে পচে-গলে-জন্তুর পেটে গিয়ে। দেহ বিলীনের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও বিলীন হয়। এরপর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নেই, কিন্তু তার কাজ-কর্ম আছে এবং কাজ-কর্মের ফল হিসেবে মনও আছে—এমনটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। 'মন' মরণশীল মানে 'আত্মা' মরণশীল।

দুই : এবার আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় মতটি নিয়ে। এই মতটি হল—চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মন হল আত্মারই কাজ-কর্মের ফল। অর্থাৎ আত্মার ক্রিয়া হিসেবেই মন বা চিন্তার উৎপত্তি।

শরীর-বিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের চিত্রটা এখন আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার। এখন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই আমরা বলতে পারি—এই দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা মনকে 'আত্মা' না বলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকেই 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, যার ক্রিয়া থেকে চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনের উৎপত্তি, বিজ্ঞান তাকে বলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ; যদিও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ও কিছু ধর্মগুরু তাকে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন।

মানুষ মরণশীল। গোটা মানুষটাই যখন মরণশীল, তখন তার দেহাংশও যুক্তিগত ভাবে মরণশীল হতে বাধ্য। অতএব আমরা খুব সহজেই এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে

পারি—মানুষের দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও মরণশীল। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ মরণশীল হলে তাকে 'আত্মা' 'চৈতন্য' বা যে নামেই ডাকা হোক্ না কেন, তা মরণশীলই থাকবে, অমরত্ব লাভ করবে না।

'মন'বা 'মনের কারণ'-কে এক সময় অধ্যাত্মবাদীরা অমর বলে মনে করেছিলেন। শুরুতে কোনও গভীর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এমনটা প্রচার করেনি। শোষকদের সুবিধে করে দেবার জন্যেও এমনটা প্রচার করেননি। শুরুর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল তাঁদের শারীর বিজ্ঞানকে জানতে না পারার অক্ষমতা। অধ্যাত্মবাদীরা সে-সময় 'মন'কে মনে করতেন দেহাতীত বা দেহ-বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত কিছু, যা দেহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেও দেখা যায় না, যা স্পর্শ করা যায় না, অথচ যাকে সব সময়ই অনুভব করছি। 'মন' আছে কি নেই, এই প্রশ্ন যে করাচ্ছে, সেই মন। অর্থাৎ 'মন' এমনই একটা কিছু, যাকে অনুভব করা যায়, যা মুহূর্তে লক্ষ-কোটি মাইল ঘুরে আসে, যাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না।

মনকে 'আত্মা' বলে, বা মনের কারণ-কে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করে একে এক রহস্যময় বিষয় করে তুলেছে অধ্যাত্মবাদীরা। অজ্ঞানতার অন্ধকারই 'মন'-এর এই রহস্যময়তা সৃষ্টির কারণ।

অধ্যাত্মবাদীরা এক সময় মানুষের মৃতদেহ দেখে গভীরভাবে চিন্তা করেছে, জীবিত ও মৃত মানুষের দেহের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তাঁদের মনে হয়েছে, দুটি ক্ষেত্রেই দেহ তো উপস্থিত, অনুপস্থিত শুধু 'চৈতন্য' বা 'মন'। এই 'চৈতন্য' বা 'মন'-এর অনুপস্থিতির জন্য একটি দেহ মৃত এবং তারপর এই দেহকে সংরক্ষণের চেষ্টা করলে তাতে পচন ধরবেই। এই অবস্থাই তাদের চোখে এক সময় আত্মা যে দেহাতিরিক্ত বিষয়, তারই প্রমাণ হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'চিন্তা' বা 'মন'-এর উৎপত্তি কোথা থেকে এটা তো মানুষ একদিনে জানেনি। শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ধাপে ধাপে মানুষ পরিচিত হয়েছে মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষ ও তার কাজ-কর্মের সঙ্গে। আর তারপর যত বেশি বেশি করে মানুষ এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্ম ও আত্মার সংজ্ঞা, উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে, ততই আত্মা তার অমরত্ব হারিয়েছে।

শিক্ষিত এমনকি চিকিৎসকরাও শারীর বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা থাকার জন্য 'মন' বা 'চেতনা'র কারণ যে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ, এ কথা জানেন; কিন্তু জানেন না 'আত্মা'র সংজ্ঞা। ফলে ছোটবেলা থেকে জেনে আসা কথা, 'আত্মা অমর', তাতেই বিশ্বাস করে বসে আছেন।

তাঁরা যদি একবারের জন্যেও জানতে পারতেন অধ্যাত্মবাদীরা কেউ 'মন'কে কেউ বা 'মনের কারণ' মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন, তাহলে এইসব শারীর বিজ্ঞান জেনেও আত্মায় বিশ্বাসীদের বিশ্বাস যেত চট্‌কে।

বর্তমানে মানুষ যখন বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করছে, শারীর বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ স্কুল গণ্ডিতেই হয়ে যাচ্ছে, তখন অধ্যাত্মবাদীরা তাদের টিকে থাকার প্রয়োজন অধ্যাত্মবাদকে রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখতে চাইছে। এজন্য অধুনা অধ্যাত্মবাদীরা একই সঙ্গে মিথ্যাচারিতা, অস্বচ্ছ ভাসাভাসা কথা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা 'মৃত্যু ও পরলোক' 'আত্মার কথা' ইত্যাদি জাতীয় বই প্রকাশ করেছে। নিজ আত্মার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার নানা গল্প পর্যন্ত ফাঁদছে। 'আত্মা'র সংজ্ঞা বিষয়ে অদ্ভুত রকম ধোঁয়াশা তৈরি। কারণ এইসব অধ্যাত্মবাদীরা খুব ভাল মতই নিজেদের বাস্তব অবস্থান ও দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ওঁরা জানেন সাধারণের কাছে আত্মার সংজ্ঞা, আত্মার ধর্মীয় ধারণাগুলোর বিস্তৃত আলোচনাই আত্মার মরণ ডেকে আনবে।

কিছু কিছু অধ্যাত্মবাদী নেতা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করে বসে আছেন শারীর বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে, এ'কথা সত্যি। তারই সঙ্গে এও সত্যি, এ'যুগে অধ্যাত্মবাদের নেতৃত্ব রয়েছে জানা, বোঝা শিক্ষিতদের হাতেই। এঁরা জানেন ও বোঝেন এক রকম, জানান ও বোঝান আর এক রকম। এমনটা হওয়ার কারণ, আজও আমাদের সমাজে অধ্যাত্মবাদীরা পূজিত হন, অর্থ ও ক্ষমতা দুইই পোষা কুকুরের মতই তাঁদের পাশে পাশে ঘোরে।

এরই পাশাপাশি আমাদের অসাম্যের সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক শক্তি তাদের টিকে থাকার স্বার্থেই অধ্যাত্মবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়, অধ্যাত্মবাদকে পুষ্ট করতে চায়। অসম বিকাশের এই দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও অনেকে সাধু-সন্তদের কাছে নতজানু হওয়ার মধ্যে কিছুটা 'গাঁইয়াপনা' খুঁজে পান। এই শ্রেণির মানুষদের জন্য সমাজ নিয়ন্ত্রক শক্তি হাজির করে 'প্যারাসাইকোলজিস্ট' নামধারী বিজ্ঞানের মুখোশ আঁটা অধ্যাত্মবাদীদের।

অধ্যাত্মবাদীদের দু'টি শিবিরের দেওয়া আত্মার সংজ্ঞা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে বাধ্য—আত্মা মরণশীল।

আত্মা মরণশীল প্রমাণিত হওয়ার পর ভূত-প্রেত-
প্ল্যানচেট-পরলোক-পরলোকের বিচারক
ঈশ্বর-স্বর্গ-নরক ইত্যাদি প্রতিটি
বিশ্বাসই অলীক
হয়ে যায়।

অধ্যায় : এগারো

অসাম্যের বিষবৃক্ষের মূল শিকড় অধ্যাত্মবাদ, পরমাত্মা ও আত্মা

'অধ্যাত্ম' ও 'আধ্যাত্ম' দুটি শব্দই এক ও অভিন্ন। 'অধ্যাত্মিক' বা 'আধ্যাত্মিক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আত্মাবিষয়ক', 'প্রেতলোক বা পরলোক বিষয়ক'।

সারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান উপাসনা-ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো (এখানে আমি পরমপিতাজাতীয়ে নতজানু ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর কথা বলছি। যেখানে 'ধর্ম' হিসেবে মানুষ 'মানবতা'কে চিহ্নিত করেছে, সেই ধর্মের কথা বলছি না।) নিয়ে আলোচনা করলেই দেখতে পাব, খাঁটি বৌদ্ধ ছাড়া এরা প্রত্যেকেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। 'আত্মা অমর'—এই বিশ্বাসের সূত্র ধরেই এসেছে 'পরমাত্মা' বা 'পরমপিতা' জাতীয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস। কল্পনা এগিয়েছে। জাগতিক জীবনের কাজ-কর্মের ফল বিচারের দায়িত্ব পেয়েছে পরমপিতা বা ঈশ্বর। 'মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ নয়'—এই কল্পনা থেকেই একটু একটু করে রূপ পেল 'প্রেতলোক' বা 'পরলোক'। কল্পনায় সৃষ্টি হলো 'স্বর্গ-নরক'। কল্পনাই এক সময় দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হলো। এ'ভাবেই প্রতিটি উপাসনা ধর্মের প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়াল—

'আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস', 'পরমাত্মা বা পরমপিতাজাতীয়ে বিশ্বাস' ও 'পরলোকে বিশ্বাস'— ধর্মের এই তিন আবশ্যিক শর্তকে নিয়ে যে মতবাদ, তাই হল 'অধ্যাত্মবাদ'।

'অধ্যাত্মবাদ'ই সেই ভিত্তিভূমি, যার উপর নানা আচার-সর্বস্ব ব্যাপার-স্যাপার ও নানা যুক্তিহীন সংস্কার চাপিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা উপাসনা ধর্ম।

একান্তভাবে বিশ্বাস-নির্ভর যুক্তিহীন এই অধ্যাত্মবাদ মৃত্যুর পর স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাল। বঞ্চিত মানুষদের পূর্বজন্মের কর্মফলের গল্প শুনিয়ে বঞ্চনাকে সহ্য করার শক্তি জোগাল। ঈশ্বরজাতীয়ে বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিল ঈশ্বরকে তুষ্ট

করার নানা পদ্ধতি-প্রকরণ, তন্ত্র-মন্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি। শাস্ত্র-বিশ্বাস ও ধর্ম-বিশ্বাস যেমন একদিকে ধর্মগুরুদের প্রতি বিশ্বাসকে অটল করল, তেমনই ধর্মগুরুরা যে ঈশ্বরের পুত্র, পয়গম্বর, প্রতিনিধি, অবতার বা ঈশ্বরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র—এই বিশ্বাসকেও দৃঢ়বদ্ধ করল। এরই সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে মানুষ সর্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের পরম প্রতিনিধি এইসব ধর্মগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করল। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ধর্মগুরুদের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরি বলে মানুষ বিশ্বাস করল। ধর্মগুরুরা একটু একটু করে হয়ে উঠল সবজান্তা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে সমাজে সৃষ্টি হল ভাগ্যে বিশ্বাস। এভাবে যতই এগোবেন, ততই বিশ্বাসবাদের ফিরিস্তি দীর্ঘতর হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারগুলো আমি ঠিক যে ক্রমে উল্লেখ করলাম, এমন নয় যে সেগুলো ঠিক ঐ ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ীই একের পর এক সমাজে আবির্ভূত হয়েছিল। এই স্বল্প পরিসর আলোচনায় আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে চাইনি। আমি চেয়েছি—অধ্যাত্মবাদ, রহস্যবাদ ও বিশ্বাসবাদের নানা পরস্পর সম্পর্কিত দিককে আপনাদের নজরের সামনে নিয়ে আসতে ও চিহ্নিত করতে।

আসুন, এবার আমরা বিজ্ঞানের মুখোশ আঁটতে চাওয়া পরামনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরাই। পরামনোবিজ্ঞানের গবেষণার মূল বিষয়ও হল 'মন' ও 'আত্মা'। মনের ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য সন্ধান, প্ল্যানচেটে আত্মাকে এনে পরলোক রহস্যের গবেষণা ও জন্মান্তরবাদের সূত্র সন্ধানের মধ্যেই পরামনোবিজ্ঞানের কাজ-কর্ম সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পরামনোবিজ্ঞানের কাজ-কর্মও আত্মাবিষয়ক বা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

এবার গোটা ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখি আসুন।

অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ, পরামনোবিজ্ঞান পুরোপুরিভাবে দাঁড়িয়ে আছে আত্মার অমরত্বের উপর নির্ভর করে, আত্মা মরণশীল প্রমাণিত হলে অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও পরামনোবিজ্ঞানের অস্তিত্বটাই তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে বাধ্য।

অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও পরামনোবিজ্ঞানের দেওয়া আত্মা বিষয়ক সংজ্ঞাকে মেনে নিয়েও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়—আত্মা অমর নয়। একটু একটু করে আমরা যখন পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে 'আত্মা' নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে নামব, তখন

আমরা সুনির্দিষ্ট প্রমাণই হাজির করব।

'আত্মা' অমর না হলে 'পরলোক', 'স্বর্গ-নরক', 'পরমাত্মা' বা 'পরমপিতা' ইত্যাদি সবই যে এক মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়; অধ্যাত্মবাদের ভিত হারিয়ে ধর্মের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে ধুলো হয় মুহূর্তে—শুধু এই সহজবোধ্য যুক্তিটুকু মাথায় রেখে আমরা লক্ষ্য রাখব পরবর্তী অধ্যায় ও আলোচনাগুলোয়।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জেনেছি—দর্শনের ইতিহাসে মূল দ্বন্দ্ব অধ্যাত্মবাদ বনাম বস্তুবাদী যুক্তিবাদ। অধ্যাত্মবাদের (যার সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে জড়িত রয়েছে বিশ্বাসবাদ ও ভক্তিবাদ) সঙ্গে যুক্তিবাদের এই দ্বন্দ্ব এক সময় হয়তো বা শুধুমাত্র যুক্তিহীন বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, অজ্ঞানতার সঙ্গে জ্ঞানের দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু যে সময় আদিম সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু করল, গড়ে উঠতে লাগল অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা, তখন থেকেই অধ্যাত্মবাদ একটু একটু করে হয়ে উঠতে লাগল শোষক-শাসক ও পুরোহিত শ্রেণি নামক বুদ্ধিজীবীদের আঁতাতের হাতিয়ার।

যত সময় এগিয়েছে, 'অধ্যাত্মবাদ' নামের হাতিয়ার ততই শাণিত, কার্যকর ও অমোঘ হয়ে উঠেছে। সেদিনের 'অধ্যাত্মবাদ' নামের বৃক্ষ-শিশু আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল বৃক্ষ। নানা শ্রেণির মগজ ধোলাইয়ের জন্য নানা ভাবে, নানা সাজে, নানা মুখোশের অন্তরালে আজ তার সর্বনাশা আবির্ভাব। ফলে বর্তমানে **অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের এই দ্বন্দ্বই আজ আর শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই দ্বন্দ্বই আজ হয়ে উঠেছে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব।**

ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ : একই টাকার দুটি পিঠ

সময় এগোচ্ছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে খসে পড়ছে অনেক সংস্কার, অনেক মূল্যবোধ। মানুষ অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণাকে বিদায় দিচ্ছে। মানুষের এই অগ্রগতির তালে তাল মিলিয়ে ধনীরাও শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল বের করছে। বের করছে শোষিত মানুষদের মগজ ধোলাইয়ের নিত্য-নতুন পদ্ধতি। ওরা বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি কিনে নিয়ে তাকে নানা ভাবে কাজে লাগিয়েছে। ওরা অর্থের জোরে সংস্কৃতির জগতে, চিন্তার জগতে থাবা বসিয়েছে। ওরাই ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কী ধরনের সিনেমা দেখব, দূরদর্শনের পর্দায় কী ধরনের 'ধামাকা' অনুষ্ঠানে নিজেদের উত্তেজিত করব, কী ধরনের গল্প-প্রবন্ধ-নাটককে নিজেদের

চিন্তাকে আচ্ছন্ন রাখব, কী ধরনের খবর পাঠ করব। খবরের কাগজের খবরও আজ আর নিছক খবর নেই। খবরের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে কাগজের 'পলিসি'। খবরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাগজের নিজস্ব চিন্তাকে, যেভাবে তারা খবরটিকে কাজে লাগাতে চায়। খবরের সঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে আবেগের মাদক যা যুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রচারে জোনাকি হয়ে যাচ্ছে নক্ষত্র। নক্ষত্রকে ঢাকতে নেমে আসছে ব্ল্যাক-আউটের মেঘ। মগজ ধোলাইয়ের কার্যকারিতায় শোষিত মানুষদের ঘৃণা আজ নেমে এসেছে জাতে-জাতে, ধর্মে-ধর্মে, ভাষায়-ভাষায়, প্রদেশে-প্রদেশে, নারী-পুরুষে। ভারতের জনপ্রিয় সংগীত প্রতিযোগিতা 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর হাত ধরেই এই বিভাজনের ব্যাপক শুরু। যত বেশি বেশি করে শোষিত মানুষদের বিভাজিত করা যাবে, ততই শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই দেওয়ার ক্ষমতাও পৌঁছাতে থাকবে তলানিতে।

শাসক-শোষক-বুদ্ধিজীবী-আমলা আঁতাতে যে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা বা 'সিস্টেম' টিকে রয়েছে, তা কিন্তু প্রধানত মগজ ধোলাইকেই সম্বল করে, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক দূষণকে সম্বল করেই। মগজ ধোলাই করে বিভেদনীতি ছাড়া আর যে দুটি নীতিকে এই অশুভ আঁতাতকে, এই 'সিস্টেম' সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে; তা হল এক : ভোগবাদী চিন্তার প্রসার, দুই : অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসার।

ভোগবাদ মানুষকে স্বার্থপর করে। স্বার্থপর মানুষ কখনও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে জানে না, সাম্যে বিশ্বাস করে না, 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের আখের গোছানোকেই জীবনের লক্ষ্য করে নেয়।

অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদীরা ভক্তিরসের আবেগে নিজের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনাকে 'ঈশ্বরের পরীক্ষা' ভেবে প্রতিবাদ করার ইচ্ছেটুকুও হারিয়ে ফেলে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ছান্দোগ্যতে আমরা প্রথম পেলাম পুনর্জন্ম কল্পনার কথা। যে কথা এল কল্পনার হাত ধরে, অজ্ঞতার পিঠে সওয়ার হয়ে, সেই কল্পনাকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে প্রবলভাবে প্রথম কাজে লাগাল ভারতের ক্ষত্রিয় ও পুরোহিত সম্প্রদায়। পুনর্জন্মের গর্ভে জন্ম নিল 'কর্মফল'-এর কল্পনা।

কর্মফল তত্ত্ব হতদরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের শোনাল—হে বৈশ্য, হে শূদ্র, এই যে প্রতিটি বঞ্চনা, এর কারণ হিসেবে তুমি যদি কোনও উচ্চকুলের মানুষকে দায়ী কর, তবে তুমি ভুল করবে। এইসব উচ্চকুলের মানুষরা তো তোমার বঞ্চনার উপলক্ষ মাত্র। তোমার বঞ্চনার মূল কারণ— পূর্বজন্মের কর্মফল।

ভারতে দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাসের ফল স্বরূপ এ'দেশের বঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিদ্রোহ করেনি, বিপ্লবে শামিল হয়নি।

জন্মান্তর ও কর্মফল বিষয়ে আরোপিত বিশ্বাসের ফল ইতিহাসের নিরিখে বিচার করে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি—এই অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টিকারী ভারতীয় ক্ষত্রিয় ও পুরোহিত সম্প্রদায় সমসাময়িক পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলের শাসক ও শোষকদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আর তারই ফলস্বরূপ আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর বিশাল বিশাল সেনাবাহিনী-পুষ্ট শক্তিশালী দেশের শাসকদের গদি আন্দোলনে ওলট-পালট হয়ে গেলেও এ'দেশের অভুক্ত, অর্ধনগ্ন, অত্যাচারিত, ধর্ষিত মানুষগুলো কুটোটি নাড়াতে পারে না। অদৃষ্টের ও কর্মফলের দোহাই দিয়ে পড়ে পড়ে মার খায়।

এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই—অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ, পরামনোবিদ্যা ইত্যাদি স্পষ্টতই ভোগবাদকে সুরক্ষিত করার 'বাদ' বা 'দর্শন'। হোক-না খণ্ডিত দর্শন।

দ্বিতীয় পর্ব

সিস্টেম ভাঙতে হলে সিস্টেমকে জানতেই হবে

অধ্যায় : এক

সিস্টেম'কে পুষ্ট করতেই ছদ্ম যুক্তিবাদী

"আত্মা থাক, কুসংস্কার দূর হোক"

যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েছে আমাদের সমাজ কাঠামো, আমাদের 'সিস্টেম'-এর শরিকশক্তিগুলোই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হুংকার-টুংকার দিচ্ছে। এমন কী কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেও এগিয়ে আসছে। বেতারে, দূরদর্শনে, পত্র-পত্রিকায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু সবটাই 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'।

এরা প্রত্যেকেই একই সঙ্গে যুক্তির পক্ষেও বলে, আধ্যাত্মিকতার পক্ষেও বলে। এরা নিরশ্বরবাদী, যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগরকে মনীষী বলে, আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিবেকানন্দকেও যুক্তিবাদী মনীষী বলে নিজেদের ভণ্ডামি চালিয়ে যায়।

প্রচারমাধ্যমগুলোর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—'কুসংস্কার' খারাপ 'অধ্যাত্মবাদ' ভাল। আত্মা, পরমাত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি মিথ্যাকে মানুষের চিন্তায় বাঁচিয়ে রাখতে পারলে কুসংস্কার বিদায়ের নামে যতই অলৌকিক বাবাদের রহস্য উন্মোচিত হতে থাক না, তবু বহু মাথায় মিথ্যা অধ্যাত্মবাদী চিন্তা শিকড় গেড়ে থাকবে। বিভূতি দেখানোকে ঘৃণা করা রামকৃষ্ণের মত অবতারও তো আছেন? রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের কপালে আঙুল ঠেকিয়ে যা দেখিয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানে থাকলেও অধ্যাত্মবাদীদের সংজ্ঞা অনুসারে তাকে বিভূতি না বলে উপায় কী? রামকৃষ্ণদেব যা করেছিলেন তেমনটি শুধু রামকৃষ্ণদেবের মত আধ্যাত্মিক নেতাদের পক্ষেই দেখানো সম্ভব, এমনটি যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্ম বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন বলেই এমন ভুল

ধারণা পোষণ করেন। অনেক মনোরোগ চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীর পক্ষেই কাউকে অলীক কিছু দেখানো, অলীক কিছু শোনানো ইত্যাদি সম্ভব, বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। জাহির করার তাগিদে নয়, বক্তব্যের প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের প্রত্যয় আনতে বিনয়ের সঙ্গেই বলছি, এমনটা বার বার ঘটাতে আমিও পারি। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' গ্রন্থে।

আমাদের সমাজ কাঠামোর শরিক শক্তিগুলো ও প্রচার-মাধ্যমগুলোর এমনতর বিচিত্র-দ্বিচারী ভূমিকার সঙ্গে কারও স্পষ্টতর পরিচয় না থাকলে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। প্রচারমাধ্যমগুলোর কাজ-কর্মকে অনেক বছর ধরে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়ার সুবাদে আজ এই কথাগুলো বলা। একের পর এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখলে একটা নধর বই-ই হয়ে যাবে। এখানে উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রতিকতম ঘটনাটির কথা বলছি।

আকাশবাণীর করিশমা

৩০ আগস্ট ১৯৯৪, আকাশবাণী কলকাতা 'ক' থেকে সকাল ৭-২০ মিনিটে আমার একটি কথিকা প্রচারিত হওয়ার কথা স্থানীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। কথিকার শিরোনাম ছিল, 'বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার'। কিন্তু সেদিন কথিকাটি প্রচারিত হয়নি। কেন হয়নি? কারণ রেকর্ডিং হয়নি। কেন রেকর্ডিং হয়নি? সে কথাতে আসছি এবার।

প্রথামত রেকর্ডিং-এর আগে 'স্ক্রিপ্ট'টা পড়তে নেন আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের সহ-প্রযোজক সুনীলরঞ্জন দত্ত। স্ক্রিপ্টের শুরুতে ছিল 'বিজ্ঞান' ও 'কুসংস্কার' শব্দ দুটির আভিধানিক সংজ্ঞা। সেখানে লিখেছিলাম, "কুসংস্কার শব্দের অর্থ—ভ্রান্ত ধারণা, যুক্তিহীন ধারণা, যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস"। এই অংশটি নিয়ে সুনীলবাবু আপত্তি জানালেন এবং "যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস" লাইনটা কাটতে বলে বললেন, যতগুলো অভিধানেই এ'কথা লেখা থাক না কেন, এমন কথা তাঁরা প্রচার করতে দেবেন না।

প্রযোজক নুরুল আলম ইতিমধ্যে লেখাটায় তাঁদের পক্ষে অস্বস্তিকর কিছু আছে অনুমান করে স্ক্রিপ্টে নিজেও চোখ বুলিয়ে বললেন, "যেখানে এ'দেশে রাষ্ট্রপতি মাথা ন্যাড়া করে আসছেন ধর্মীয় বিশ্বাসে, সেখানে আমরা তারপর ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলি কি করে?"

স্ক্রিপ্টের আরও একটি অংশে ছিল,

“ ‘কুসংস্কার মানি না’, বলতে পারাটা আজকাল স্মার্ট হওয়ার ভান হয়ে দাঁড়িয়েছে, এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন —আত্মা অমর! মা-বাবার মৃত্যুর পর তাই শ্রাদ্ধ করেন, পিণ্ড দেন। এই শ্রাদ্ধকারীদের অনেকেই আবার ‘ভূতে ভর’কে ‘গেঁয়ো ধারণা’ বলে নাক সিঁটকোন!”

সুনীলবাবু এই লাইনগুলো কাটতে বলে বলেন, ‘আজকে প্রাইমমিনিস্টার স্পেশাল প্লেনে করে গিয়ে কী এক মাতাজির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করছেন; সেখানে আমরা শ্রাদ্ধকে কুসংস্কার বলে প্রচার করতে পারি না।”

সুনীলবাবু আমার লেখা থেকে ধর্ম ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা বাদ দিতে অনুরোধ করে বলেন, “আমাদের সাবজেক্টটা আছে ‘বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার’। আমরা যেটাকে হাইলাইট করি বারবার, সেটা যেমন—গ্রহণের সময় খাবার-দাবার ফেলে দেওয়া হয়; আমরা বলছি, এটা ঠিক নয়। আমরা বলব—আজকে অমুক তারিখ পূর্ব দিকে যাত্রা নিষেধ বা পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে শুলে শরীর খারাপ হবে, এগুলো কুসংস্কার; কারণ এই ধারণাগুলো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরি হয়নি। আমি বলছি—এই কথাগুলোকে আপনি হাইলাইট করুন।”

নুরুল আলম অনুরোধ করলেন স্ক্রিপ্টে ওসব পাল্টে হাঁচি-টিকটিকি-অযাত্রাদর্শন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনতে। শ্রীআলমের মতে—এইসব কুসংস্কারই মানুষের বেশি ক্ষতি করছে। আত্মা অমর কি না, তাতে মানুষের ক্ষতি-বৃদ্ধি কী?

উত্তরে বলেছিলাম, আমি ওঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি—‘আত্মা অমর’ এই চিন্তার সূত্র ধরেই কর্মফল, ভাগ্য, পরজন্ম, স্বর্গ-নরক, পরলোক, পরলোকের বিচারক ঈশ্বর ইত্যাদি অলীক বিশ্বাস টিকে আছে। তার ফলে বঞ্চিত মানুষ বঞ্চনার কারণ হিসেবে সমাজের দুর্নীতি চক্র কিছু মানুষ বা সিস্টেমকে দায়ী না করে দায়ী করেছেন ভাগ্য, কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া, ইত্যাদিকেই। আরও একটা কথা কি জানেন, কোনও বড় মাপের মন্ত্রী-টন্ত্রী মঘা ত্র্যহস্পর্শ-হাঁচি-কাশি-টিকটিকির ডাক ইত্যাদি মানেন, খবর পেলে আপনারা তো রেকর্ডিং-এর পরেও তার প্রচার বন্ধ করে দেবেন। অতএব আমি আমার স্ক্রিপটাই তুলে নিচ্ছি। প্রচার করতে চাইলে এই অপরিবর্তিত স্ক্রিপ্টই আপনাদের প্রচার করতে হবে।

ঘটনাটা জানার পর কেউ বলতে পারেন—সুনীলরঞ্জন এবং নুরুল আলম তো

প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও পিছ-পা হননি! আসলে এই সরকারের রেডিও পলিসির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তো ওঁদের চাকরি করতে হবে!

এই জাতীয় বক্তব্যের উত্তরে জানাই, নুরুল আলম, সুনীলরঞ্জন সরকারি আমলা। তাঁরা জানেন সরকারের চাওয়াটাকে যে কোনও কৌশলে পাইয়ে দেওয়াটাই আমলার কার্যদক্ষতার মাপকাঠি। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কিছু বলে আমার আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে যদি আমাকেও সরকারি নীতি বা কৌশলকে কার্যকর করার কাজে লাগানো যেত—তাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণই হত ভারী। ক্ষতির কথাটা লেখাই আমার ভুল হয়েছে। ক্ষতিটা কোথায়? প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির এই জাতীয় কুসংস্কার পালনের খবরটা আমার কাছে নতুন নয়—এটা সুনীলবাবু, নুরুলবাবুর অজানা থাকার কথাও নয়। সুনীলবাবু ও নুরুলবাবু বাস্তবিকই আন্তরিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাইলে আমার কাছে ফিসফিস না করে তাঁদের হাতের প্রচার মাধ্যমগুলোকেই কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন না কেন? কেন উল্টে আমার বক্তব্যকে 'সেনসর' করতে চাইলেন? কারণ একটিই—তাঁরা আমাদের সমাজ-কাঠামো বা 'সিস্টেম'কে স্থিতিশীল ও গতিশীল রাখার প্রয়োজনীয় সহায়ক শক্তি। এ'ভাবেই সহায়ক শক্তিগুলো কাজ করে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন—এই সরকারের ভূমিকাটাই এমন প্রগতিবিরোধী। অন্য সরকার এলে অন্য রকম হত।

এর উত্তরে জানাই—সমাজে অসাম্য থাকলে যে সরকারই আসুক এমনটাই ঘটে চলবে। এবং যতদিন ধরে ঘটে চলবে, ততদিন সাম্যও আসবে না।

অধ্যায় : দুই

'সমাজ কাঠামো' বা 'সিস্টেম'কে জানুন : সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থে

আগের অধ্যায়ে শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত যা বললাম, সেই বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে বুঝতেই হবে বর্তমানের এই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে, যার প্রচলিত নাম 'সিস্টেম'। আর অসাম্যের এই সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম'কে বুঝতে গেলে বুঝতে হবে এই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক নীতির নিয়ন্তা ধনকুবের গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকার, প্রশাসন-পুলিশ-সেনাবাহিনী, প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক।

সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অসাম্যের এই সমাজ কাঠামো বা সিস্টেমকে ভাঙতেই হবে। সিস্টেমে আঘাত করার অর্থ কি, বর্তমান সরকারকে আঘাত করা? সরকারি কাজ-কর্মকে সমালোচনায় সমালোচনায় নাস্তানাবুদ করা? সরকারের বিভিন্ন কাজ-কর্মের বিরোধিতা করা?

না, তা নয়। সরকার যায়, সরকার আসে। রাজনৈতিক নেতারা গদিতে বসেন, আবার বিদায়ও নেন—কেউই অপরিহার্য নন। কিন্তু অসাম্যের এই সমাজ ব্যবস্থা টিকেই থাকে, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সাম্যের সমাজ গড়ার সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশাল এক ঠাট্টা ও ধাপ্পা বলে বার বার প্রমাণ করে দিয়েই টিকে থাকে। এই সমাজ কাঠামোকে বজায় রেখে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার সাধ্য নেই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার মুখের কথাকে কাজে পরিণত করা। অসাম্যের এই সমাজ কাঠামোয় যে-ই শাসকের আসনে বসবে, সে-ই অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে, শোষণের সমাজ কাঠামোকে, দুর্নীতির সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রেখেই নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে। সুতরাং শুধুমাত্র কোনও একটি সরকারের বিরোধিতা অথবা তাকে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামোকে পাল্টে ফেলা যায় না, 'সিস্টেম'কে বদলে দেওয়া যায় না। কারণ রাম, শ্যাম, যদু কি মধু, যেই হোক, গদিতে পাছা ঠেকালেই বলে 'হালুম'। তারপরই দুর্নীতির থাবা বসিয়ে গরিবের হাড়-মাংস চিবিয়ে খায়।

সমাজ কাঠামো একটা গতিশীল প্রক্রিয়া

সমাজ কাঠামোটা একটা বিশাল যন্ত্রের মত। এই যন্ত্র গতিশীল রয়েছে, কাজ করে চলেছে যন্ত্রের ভিতরের নানা আকারের চাকার ঘূর্ণনের সাহায্যে। একটি চাকা ঘোরা শুরু করার সঙ্গে চাকার দাঁতে দাঁত চেপে গতি পাচ্ছে আর একটি চাকা। তার থেকে আর একটি, তার থেকে আর একটি, আর একটি...। চলছে যন্ত্র। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার গোটা যন্ত্রটি যে চলছে, তার নানা মাপের প্রতিটি চাকা ঘোরাচ্ছে দুর্নীতির দাঁত।

প্রথম চাকাটি যে ঘোরায়, সেই নিয়ন্ত্রক। কে ঘোরায়? রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণি। অর্থাৎ শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণি।

রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্যশীল শ্রেণির একনায়কত্ব-ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যখন রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণি বলে চিহ্নিত হবে? কে হবে প্রথম চাকাটি ঘোরাবার অধিকারী শ্রেণি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক শক্তি।

উত্তর একটাই। সাম্য এলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবে জনগণ। সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তি হবে জনগণ।

আমাদের সমাজ কাঠামোয় দুর্নীতির সাহায্যে শোষণের প্রবল রমরমা। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি ছাড়াও শোষণ সম্ভব। অর্থাৎ

আইন মেনেও শোষণ সম্ভব। কারণ অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দেশের আইনের মূল ধারাগুলো তৈরি করা সম্ভব, এবং প্রায়শই তেমনটা হয়।

আমার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে, উপরের পংক্তি দু'টিতে আমি যে বক্তব্য রেখেছি, তাতে আপাত স্ব-বিরোধ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আইন শোষকদের পক্ষে রচিত হলে আইন মেনেই তো শোষণ চলতে পারে। দুর্নীতি মানেই তো আইন না মানা—সেটা এ'দেশে চলছে কেন?

উত্তরটা কিন্তু সহজ ও সরল। দুনিয়ার ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেই দেখতে পাবেন, উন্নত দেশে ধনিক শ্রেণি আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি স্বাবলম্বী। তারই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশের শোষণ প্রক্রিয়া অনেক সুশৃঙ্খল। এ'দেশের মত ব্যাপক দুর্নীতির লুঠ-তরাজ নেই।

এ'দেশের সমাজ কাঠামোয় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণিই। দুর্নীতিগুলো কী ভাবে দুই বিপরীত শ্রেণির মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, কেন ছড়িয়ে পড়েছে, এ নিয়ে অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিই আসুন।

(এক) : শোষক ও শাসকশ্রেণি নিরপেক্ষতার মুখোশ পরার জন্য বা জনগণের লড়াইয়ের জন্য যেটুকু ছিটেফোঁটা অধিকারের প্রতিশ্রুতি শোষিত জনগণকে দিতে বাধ্য হয়, সেগুলো তারা নিজেরাই ভঙ্গ করে সমাজে দুর্নীতির পরিমণ্ডলের সাহায্য নিয়ে। সুতরাং এ'দিক দিয়ে দুর্নীতির পরিমণ্ডল টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

(দুই) : নির্দিষ্ট আইনকানুন মেনে শোষণ করে যত দ্রুত ধনী হওয়া সম্ভব, তার চেয়ে, অনেকগুণ তাড়াতাড়ি ধনী হওয়া সম্ভব আইন-কানুন ভেঙে। এ'ভাবেই অশোক ঢোডি, হর্ষদ মেহেতাদের মত অখ্যাত মধ্যবিত্তেরা কয়েক বছরে দেশের সেরা ধনী হয়ে উঠেছে। এ'ভাবেই উঠে আসছে ঝাঁক-ঝাঁক ধনী, যারা কয়েক বছর আগেও ছিল অজ্ঞাত কুলশীল। এ'ভাবেই ছাপড়ার বেড়ার ঘরে বাস করা রাজনৈতিক নেতা কয়েক বছরে কোটিপতি হয়েছে। কোটিপতি হয়েছে দাউদ ও শিদের মত বস্তি থেকে উঠে আসা সমাজবিরোধীরা। এ'ভাবেই পুলিশ ও বিভিন্ন প্রশাসনের অনেক বড়-মেজ কর্তারা মধ্যবিত্তের খোলস ছেড়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়েছে। এদের দ্রুত ধনী হয়ে ওঠার মূল-মন্ত্র একটিই—'দুর্নীতি'।

(তিন) : শোষিত শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তুঙ্গে উঠলে তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় অবাধ বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের। আইনের কাঠামোর মধ্যে তা সম্ভব নয়। সুতরাং দুর্নীতির সাহায্য নিয়েই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সব সময়ই চালান হয় আইন ভেঙে দুর্নীতিকে সাথী করে।

শোষিতদের দুর্নীতির গণভিত্তি

এ'সবই শোষক ও তার সহায়ক শক্তির মধ্যেকার দুর্নীতি। কিন্তু শোষিতদের মধ্যেও যে দুর্নীতির ব্যাপক গণভিত্তি থাকে, তার কার্য-কারণ এ'বার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

(এক) : শোষিতদের কাছে দুর্নীতির সুযোগ তীব্র শোষণের মধ্যেও খানিক 'উপশম' ও 'আনন্দ'-এর দখিনা হাওয়া বয়ে আনে। শহর কলকাতা ও মফস্‌লের বস্তি এলাকায়, রেল স্টেশনের আশেপাশে ফুটপাত দখল করে গজিয়ে ওঠা চা-পান-বিড়ির দোকানে, গ্রামের কুঁড়ে ঘরে আলো জ্বলে বিদ্যুৎ চুরি করে। এই বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে পুলিশের সাহায্যে কোনো অভিযান হলে পুলিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলে চোরেরাই। সিনেমা হলে হিট বই এলে টিকিট ব্ল্যাক হবে। ব্ল্যাকাররা পুলিশ ও রাজনীতিকদের ছত্রছায়ায়

দিব্বি বে-আইনি কাজ করতেই থাকে। ফুটপাত দখল করা দোকানিরা মাছ থেকে আনাজ নিয়ে বসে। প্রায় সকলেই ওজন চুরি করে। প্রতিবাদ করলে একটু আধটু চড়-চাপড় পড়ে প্রতিবাদীর ওপর। অর্শের আংটি থেকে নবগ্রহের কবচ সবই মেলে স্টেশন চত্বরে। প্রতারণা ধরতে গেলে খেটে খাওয়া মানুষরাই বলবে—করে খাচ্ছে, কেন পেটে লাথি মারছেন দাদা? অচেনা লোক দেখে রিকশাওয়ালা পাঁচ টাকা ভাড়াকে দশ টাকা বলে। ট্যাক্সি ড্রাইভার নতুন যাত্রী পেলে দু'কিলোমিটারের পথ যেতে কুড়ি কিলোমিটার ঘোরে। 'ঋণ-মেলা' থেকে ঋণ নিয়ে সুযোগ থাকলেও ঋণ শোধ করতে ব্যাঙ্কের দরজার দিকে আর পা মাড়ায় না অনেক গরিবই। এমন উদাহরণ অবিরল ধারায় হাজির করা যায়। এই ধরনের দুর্নীতি তাই অনেক সময় শোষিত মানুষদের শোষণজনিত ক্ষোভকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে। এই দুর্নীতি শোষিতদের প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের গ্লানিময় বিকল্প হিসেবে কাজ করে। [ফল : স্থায়ী সমাধানের কষ্টকর সংগ্রাম থেকে বিচ্যুতি]

(দুই) : দমন-পীড়ন-শোষণের দুর্নীতি চালাতে শোষকদলের যে লোকবলের প্রয়োজন হয়, তার একটা অংশ সংগ্রহ করা হয় শোষিতদের মধ্যে থেকেই। আর এটা সম্ভব হয়, শোষিতদের মধ্যে দুর্নীতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ফলে।

এই প্রক্রিয়ার ফলে আরও সুবিধে হল, এর ফলে শাসকশ্রেণি নিজেদের পরিবর্তে শোষিতদের ওই অংশকে জনগণের সামনে দমন-পীড়ন-দুর্নীতির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাঝে-মধ্যে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়। মাঝে-মধ্যে নেওয়া হয় জোরালো ব্যবস্থা। এ'ভাবেই ভাঙা হয় বে-আইনি মদের ঠেক, ধরা পড়ে কোটি টাকার সোনা কী হেরোইন, ভাঙা হয় প্রমোটারের বেআইনি কনস্ট্রাকশন। এ'সব ধরা পড়া দুর্নীতি শতাংশের একাংশও নয়। শাসকশ্রেণি এ-ভাবেই নিজেদের বিপ্লবী ইমেজ ধরে রাখতে মাঝে মধ্যে দুর্নীতি ধরে শোষিতদের বিভ্রান্ত করে। [ফল : সংগ্রামের লক্ষ্যে বিভ্রান্তি তৈরি]

(তিন) : দুর্নীতির দ্বারা অতি সফলভাবে শোষিতশ্রেণির মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত লোভ ও ভোগবাদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব হয়। [ফল : শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে না গিয়ে শোষকশ্রেণিকে সাহায্য করে আখের গোছাতে ব্যস্ত হওয়া]

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই মানেই অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই নয়। জ্বলন্ত উদাহরণ তো সামনেই রয়েছে—শেষন; টি. এন. শেষন। তিনি এ'দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছেন। তাঁর এই লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে

অভিনন্দন জানিয়ে এবং সম্মান জানিয়েও আমরা বলতে পারি, তাঁর এই লড়াই কখনই অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও লড়াই নয়। বরং তাঁর এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াকু মেজাজের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে থাকা ঈশ্বর, অবতার,ভাগ্য, কর্মফল ইত্যাদিতে প্রবল বিশ্বাস বহু শোষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, লক্ষ্যচ্যুত করবে।

অনেক সময় দুর্নীতি সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণভাবে শোষণকে চালাতে দেয় না। অনেক সময় ব্যাপক দুর্নীতি জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভও তৈরি করে। ফলে অনেক সময় শোষকরা এবং তাদের তল্পিবাহকরাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবাদের পার্থক্যটা তাই স্পষ্ট করে তোলা একান্তই জরুরি।

শোষকশ্রেণি ও তাদের তল্পিবাহকরা দুর্নীতির তথাকথিত বিরোধিতা করলেও অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রেখেই তা করেন। আমরা সাম্যকামীরা দুর্নীতির বিরোধিতা করি, অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ভাঙার লক্ষ্যে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের বুঝতে হবে, কেন তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে মনে করবেন।

এই চিন্তার আলোকে আসুন আমরা দেখি, শোষক ধনকুবের গোষ্ঠী যে সিংহাসনে বসে সমাজ কাঠামোকে পালন ও পুষ্ট করে, শোষণ প্রক্রিয়া চালায়, সেই সিংহাসনকে দাঁড় করিয়ে রাখা চারটি পায়ার ভূমিকা কে কী ভাবে পালন করে চলেছে।

সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের চারটি পায়া

শিল্পপতি ও বণিকরাই দেশের অর্থনীতির নিয়ন্তা। যারা অর্থনৈতিক ক্ষমতার সিংহাসনে বসে, শেষ পর্যন্ত তারাই সমাজ কাঠামোকে চালনা করে। সমাজ কাঠামো বা 'সিস্টেম' মানে যা সমাজের চলমান শোষণ প্রক্রিয়ার গতিকে বজায় রাখে। এই চলমান গতি সমাজের কাঠামো এবং উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের কাঠামো অর্থাৎ সমাজের অসাম্যের কাঠামোর গঠন-শৈলী কেমন হবে? দেশের মানুষদেরই শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ব, না কি এই দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই দেশের মানুষদের পাশাপাশি অন্যদেশের মানুষদেরও শোষণ করব? অথবা এদেশে ছেড়ে অন্যদেশে শোষণ চালাব, যেমন চালায় আমেরিকা?

সমাজের উপরিকাঠামোকে অর্থাৎ শিক্ষানীতি, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পানীয় জল,

বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প-সাহিত্য-ক্রীড়া থেকে দুর্নীতির ব্যাপকতা, বেশ্যাবৃত্তি, পর্নো ছবির রমরমা, যৌন উশৃঙ্খলতা ইত্যাদি কেমন চলবে, কতটা চলবে—সবই ঠিক করে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রাশক্তি।

এদেশের ফুটবল টিমগুলোর কথা ভাবুন। দলগুলোর মালিকরা অন্যদলের খেলোয়াড়দের বেশি দামে দলে টানে টিমের স্বার্থে। একই ভাবে শিল্পপতি বণিকরা অর্থমূল্যে নিজেদের দলে টানে রাজনৈতিক দল, রাজনীতিক, প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, আই পি এস, আই এ এস মানের আমলা, সেনাবাহিনীর উচ্চপদাধিকারীদের। এইসব সহায়ক শক্তিরাই অর্থনৈতিক ক্ষমতার সিংহাসনের চারটি পায়া। এরাই সিংহাসনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। একটি পায়া ভাঙলেই নড়বড়ে। পায়াগুলো হল (এক) শাসক দল বা শাসক গোষ্ঠী ও শাসন ক্ষমতায় বসার সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক দল, (দুই) প্রশাসন-পুলিশ-সেনা, (তিন) প্রচার মাধ্যম, (চার) বুদ্ধিজীবী।

আসুন, এবার আমরা এই চারটি শ্রেণিকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকি।

এক : সরকার ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল

আমাদের দেশের সংসদীয় নির্বাচনের চেহারাটা আমাদের কারও অজানা নয়। সংসদীয় নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতা দখলের দিকে এগোতে চাইলে, লোকসভায় বা বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য আসন পেয়ে দাপট বজায় রাখতে চাইলে সেই রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে বিপুল অর্থ ঢালতেই হবে। বর্তমানে নির্বাচন মানেই এক-রাজসূয় যজ্ঞ। ভোটার তালিকায় কারচুপি, সম্ভাব্য বিরোধী ভোটারদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুঠ, ধর্ষণ, খুন এবং সঙ্গে বিশাল প্রচার-ব্যয়, রিগিং, বুথদখল, ছাপ্পা ভোট এ-সব নিয়েই এখনকার নির্বাচন। এ এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মাসলম্যানদের পিছনেও বইয়ে দিতে হয় অর্থের স্রোত। নির্বাচনী ব্যয়ের এই শত-সহস্র কোটি টাকা গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের এক-টাকা দু-টাকা বা পাঁচ-টাকা চাঁদায় তোলা যায় না। তোলা হয়ও না।

নির্বাচনী ব্যয়ের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি টাকা জোগায় ধনকুবেররা। বিনিময়ে তারা এইসব দলগুলোর কাছ থেকে পায় স্বস্তিতে শোষণ চালাবার গ্যারান্টি। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো কৌশল হিসেবে খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে নির্বাচনী তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় করে দেখাতে চায় "মোরা তোমাদেরই লোক।"

এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন মাঠে-ময়দানে, পত্র-পত্রিকায়, বেতারে, দূরদর্শনে গরিবি হটানোর কথা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলেন, তখন কিন্তু এইসব তর্জন-গর্জনে শোষকশ্রেণির সুখনিদ্রায় সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটে না। শোষকশ্রেণি জানে তাদের কৃপাধন্য, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের এইসব বজ্রনির্ঘোষ স্রেফ শোষিত মানুষকে ভুলিয়ে রাখার কৌশল। হুজুরের দল চায় রাজনৈতিক দলগুলো শোষিতদের আপনজনের মুখোশ পরে শোষিতদের বিভ্রান্ত করুক, যাতে তাদের সম্মিলিত ক্ষোভ দানা বেঁধে বিস্ফোরিত হতে না পারে। এই সমাজ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শোষণ কায়েম রাখার স্বার্থেই শোষণকারীদের দালাল রাজনৈতিক দলগুলো শোষিত সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নানা ভাবে।

হুজুরদের কৃপাধন্য রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার মধুর লোভে সব সময়ই চায় ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে।

ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই চায় মানুষ অদৃষ্টবাদী হোক। বিশ্বাস করুক পূর্বজন্মের কর্মফলে। ঘুরপাক খাক নানা সংস্কারের অন্ধকারে। এমন বিশ্বাসগুলো শোষিত মানুষগুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য দায়ী করবে নিজের ভাগ্যকে, কর্মফলকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।

দেশের আর্থিক ক্ষমতার লাগাম যে ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে, তারাই নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিকদের, রাজনৈতিক দলগুলোকে। ধনকুবেররা সেই সব রাজনৈতিক দলগুলোকেই অর্থ দিয়ে লালন-পালন করে, যারা গদি দখলের লড়াইয়ে শামিল হওয়ার ক্ষমতা রাখে, অথবা ক্ষমতা রাখে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে দাপট প্রকাশের। বিনিময়ে এইসব রাজনৈতিক দলগুলো শোষণ প্রক্রিয়াকে সমস্ত রকম ভাবে মসৃণ রাখবে।

বিভিন্ন ধনকুবেরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াবার প্রতিযোগিতা। তারই ফলে কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করার পরও প্রধানমন্ত্রী থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী বাছাই নিয়েও চলে ধনকুবেরদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। উল্টো দিকে থেকে রাজনীতিকরাও বড় বড় কুবেরদের সমর্থন পেতে গোলাম থাকার দাসখত লিখে দেন।

বিষয়টা স্পষ্টতর করতে চলুন আমরা ফিরে তাকাই ১৯৯১-এর জুন মাসটির দিকে। এই সময় আমরা দেখলাম, নরসিমহা রাও যিনি কিনা নিজেকে একনিষ্ঠ জ্যোতিষ বিশ্বাসী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে 'প্রজেক্ট' করেন, তিনিই প্রধানমন্ত্রীর গদিটি বাগাবার জন্য ভাগ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছার দোহাই না দিয়ে, 'অবতার' নামক ঈশ্বরের এজেন্টদের শুকনো আশীর্বাদের উপর ভরসা না করে ধনকুবেরদের কৃপাপ্রার্থী

হতে দোরে দোরে দৌড়োচ্ছেন। অন্য দিকে শরদ পাওয়ারকেও আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর গদি বাগানোর লড়াইতে শামিল হতে এবং একইভাবে ধনিকদের দোরে ধরনা দিতে।

তারপর যা ঘটল, তা সবই ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্রিকায় চাটনি হিসেবে পরিবেশিত হলো। পাওয়ারকে পরাজিত করে নিজের পাওয়ারকে বজায় রাখতে শ্রীরাও বিড়লা, হিন্দুজা, আম্বানিদের মতো বিশাল শিল্পপতিদের বোঝাতে সক্ষম হলেন, তিনি গদিতে বসলে এইসব শিল্পপতিদের স্বার্থেই নির্ধারিত হবে দেশটির অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক নীতি। প্রকৃত দেশের রাজা ওইসব শিল্পপতিরাই হবেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ ও সেই পদের ক্ষমতায় যেটুকু সম্পত্তি স্বআত্মীয়ে কাচিয়ে তুলতে পারবেন, তাতেই তিনি বিলকুল খুশি থাকবেন।

পত্র-পত্রিকা পাঠে আমরা জানতে পেরেছি, শ্রীরাও নিজের পিছনে সাংসদদের সমর্থন আদায় করতে নাকি নিজের দলের সাংসদ পিছু ৫০ লক্ষ টাকা করে ভেট দিয়েছিলেন। টাকা জুগিয়েছিলেন 'মিনিস্টার মেকার' শিল্পপতিরা।

শ্রীপাওয়ারের পিছনেও ছিল একগুচ্ছ শিল্পপতির সমর্থন, তাঁর শিবিরে শামিল ছিলেন কির্লোস্কার, বাজাজ, নাসলি ওয়াদিয়া, গুলাবচাঁদ প্রমুখ শিল্পপতিরা। তাঁরাও শুধু হাতে নামেননি। টাকার থলির ভেট তাঁরাও পেশ করেছিলেন সাংসদদের। কিন্তু বেশি সাংসদদের কিনে ফেলেছিলেন শ্রীরাও সমর্থক শিল্পপতিরা। এইসব খবর প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯১-এর ২০, ২১, ২২ জুনের বিভিন্ন ভাষাভাষী দৈনিক পত্রিকায়।

'গোলাম' কেনার নিলামে নেমেছিল শিল্পপতি গোষ্ঠী। রাজনীতিকরা শিল্পপতি গোষ্ঠীকে চালায় না। শিল্পপতি গোষ্ঠীই চালনা করে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের। **এইসব রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিক হলো 'কুত্তা কা দুম'। ধনীরা এদের যেমন নাড়ায়, তেমনই নড়ে।**

পত্রিকাগুলো কি তবে সেই দিনগুলোতে সিস্টেমকে আঘাত হেনেছিল? আদৌ তা নয়। কারণ তারা পত্রিকার বিক্রি বাড়াতে রসালো চাটনি সরবরাহ করেছিল মাত্র। এইসব সাংসদ কেনা-বেচার হাটে শিল্পপতিদের দালালের ভূমিকায় সেদিন অনেক নামী-দামি সাংবাদিকও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এমন খবরও পত্র-পত্রিকাতেই আমরা দেখেছি। এই ধরনের খবর প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রচার-মাধ্যম কয়েকটি ধারণা সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল : (ক) রাজনীতি ও দুর্নীতি সমার্থক শব্দ। ফলে অসাম্যের রাজনীতিকে হটাতে সাম্যের সমাজ গড়ার রাজনীতিতে শামিল তরুণ-তরুণীদের সামাল দেবেন তাদের মা-বাবা ও অভিভাবকরাই। যুক্তি দেবেন, "রাজনীতির মধ্যে ঢুকিস না, যত সব নোংরা ব্যাপার"। (খ) স্বার্থপর একটি শ্রেণি গড়ে উঠবে ও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকবে

যারা মনে করবে—বেঁচে-বর্তে থাকতে গেলে, চাকরি জোটাতে গেলে, মস্তানি করে 'টু-পাইস' কামাতে গেলে, প্রমোটর হয়ে সাচ্ছল্যের জীবন কাটাতে হলে, ধর্ষণ করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হলে, নিরুপদ্রবে ব্যবসা করতে হলে, স্কুল-কলেজে অ্যাডমিশন পেতে হলে রাজনৈতিক ছত্র-ছায়ায় থাকতেই হবে। (গ) খোলাখুলিভাবে দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এমন দুর্নীতি এবং তারও পর নেতাদের বুক চিতিয়ে চলা, এবং এই দুর্নীতিগ্রস্তদের ঘৃণা ছুড়ে দেবার পরিবর্তে দেশের সম্মানিত সব বুদ্ধিজীবীদের, শিক্ষাবিদ্‌দের গদগদ ভক্তি-প্রকাশের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে প্রচার মাধ্যমগুলো, তাতে দুর্নীতিকে ঘৃণা করা সাধারণ মানুষ, সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা মানুষ নিরাশার শিকার হয়ে পড়েন। এমন নিরাশা ও অবদমিত বিষণ্ণতা বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতেই সহায়তা করে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা ভাবুন, বাস্তবকিই কি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীগুলো সততার সঙ্গেই এই রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতেই এমন খবর প্রকাশ করছেন? না কি, এই সংবাদ প্রকাশের পিছনে ছিল সেই সব উদ্দেশ্য, যেগুলো নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। ভাবুন প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনাদের শাণিত যুক্তিই আপনাদের সত্যের কাছে পৌঁছে দেবে।

বহু কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে এক একটি বৃহৎ সংবাদপত্র, এক একটি প্রচার-মাধ্যমের সাম্রাজ্য। এইসব সাম্রাজ্যের মালিক কোটিপতিদের কাছে এই সব পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমগুলো সাধারণভাবে স্রেফ একটা রোজগারের মাধ্যম একটা ব্যবসা মাত্র। যেমন ব্যবসা করেন শেয়ার দালাল, বিল্ডিং প্রমোটার, ফিল্ম প্রডিউসার কিংবা বস্ত্রশিল্পের মালিক। এঁরা নিশ্চয়ই অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়ে লোটা-কম্বল নিয়ে নিজেদের বঞ্চিত মানুষদের সারিতে দাঁড় করাতে চাইবে না, চাইতে পারে না। এই সত্যটুকু আমাদের বুঝে নিতেই হবে, সুন্দর সমাজ গড়ার স্বার্থেই বুঝে নিতে হবে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন—আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে শোষকশ্রেণির দালালির অধিকার লাভের প্রতিযোগিতা।

গণতন্ত্র মানে কী শুধুই ভোট দেওয়ার অধিকার? সেটাই বা ক'জনের আছে? ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল, চতুর রিগিং সেই অধিকারে তো অনেক দিনই থাবা বসিয়েছে।

তারপরও যদি ভোট দেওয়ার অধিকারের প্রসঙ্গ টেনে কেউ বলেন এই দেশের মানুষই কখনও ইন্দিরাকে তুলেছেন, কখনও নামিয়েছেন, কখনও রাজীবকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, কখনও বা ছুড়ে ফেলেছেন, কখনও এনেছেন ভি. পি-কে, কখনও পি. ভি-কে, তাঁদের আবারও মনে করিয়ে দেব পরম সত্যটি, অভিজ্ঞতার

সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলব কথাটি—মন্ত্রী যায় মন্ত্রী আসে, এদের বহু অমিলের মধ্যে একটাই শুধু মিল—এঁরা প্রত্যেকেই শোষকশ্রেণির কৃপাধন্য, পরম সেবক। এঁরা শোষকদের শোষণ বজায় রাখার ব্যবস্থা করে দেবার বিনিময়ে আখের গোছান।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, চারটি পায়াই সিংহাসনকে দাঁড় করিয়ে রাখার স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

দুই : প্রশাসন-পুলিশ-সেনা

প্রশাসক

'প্রশাসক' শব্দের অর্থ 'যিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা।

রাজার আমলে রাজার শাসন চলত। তাতে সাহায্য করতেন মন্ত্রীরা। এখন দেশে 'গণতন্ত্র' এসেছে। রাজার জায়গায় মন্ত্রীর রাজ চালু হয়েছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এরা প্রত্যেকেই পাবলিক সার্ভেন্ট। অন্তত সংবিধান তেমনই বলে।

মন্ত্রীরা আসেন-যান। এদের কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না।

একজন চাপরাশিকেও স্কুল-ফাইনাল পাশ করতে হয়। একজন মন্ত্রী হতে তারও প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রীদের হয়ে দপ্তর সামলাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় পেশাদার প্রশাসকদের। এদের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, সংক্ষেপে আই এ এস এবং তারপর আই আর এস অফিসাররা। এরাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ পেশাদার পদে আছেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, ইনকামট্যাক্স কমিশনার, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে এঁরাই বসেন।

বিভিন্ন রাজ্য ভিত্তিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়। এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ওইসব রাজ্যের মাঝারি মাপের প্রশাসকের কাজ করেন। যেমন বিডিও, এসডিও, অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি। সিনিয়র রাজ্য সিভিল সার্ভিস ক্যাডারদের কেউ কেউ 'ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট' পদেও বসেন।

এঁরাই শাসনটা চালান বলে মন্ত্রীরা ঝাড়া হাত-পা। পাবলিক বলে, ফোর-ফাইভের বিদ্যে নিয়ে রাবড়ি দেবী বিহারের মুখ্যমন্ত্রীত্ব সামলালেন রাজ্যের প্রশাসকদের সাহায্যে। রাজ্য চলবে গড়গড়িয়ে—তা সে ভালও হতে পারে, খারাপও হতে

পারে। মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রশাসকদের হুকুম দেন—আমার মেয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় ফেল করেছে, ওকে ফার্স্ট করে দাও। প্রশাসক ভাইস চ্যান্সেলার হুকুম তামিল করেন। অমুক স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি দাঁড়ায় না। আমার ভাই ওই স্টেশনে ট্রেনটি ধরতে চায়। ট্রেন ওই স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দাও। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে।

আজকের দিনে এমন বেআইনি আদেশ তামিল করার মত প্রশাসকের সংখ্যাই বেশি।

না, এ'সব বানানো গল্পো নয়, নির্ভেজাল সত্যি। গদিতে আসীন মন্ত্রী নামের শাসনকর্তা-কর্ত্রী হলেন 'প্রশাসক নম্বার ওয়ান'। তাঁদের দপ্তর যে সব মাইনে করা প্রশাসকরা দেখেন তাঁদের বেশির ভাগেরই স্ট্যান্ডার্ড বলে এখন কিছুই নেই। তাঁরা এখন মন্ত্রীদের চাকর-বাকরের ভূমিকায় নেমেছেন। মন্ত্রীদের নানা অনৈতিক ও দুর্নীতির সহায়কের কাজ করে নিজেরাও যথেচ্ছ লুটে-পুটে নিচ্ছে। ব্যতিক্রমীদের সংখ্যা পার্সেনটেজে পড়ে না।

বছর পঞ্চাশ আগে বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে এই রাজ্যের প্রশাসকদের মধ্যে সততা, আত্মসম্মানবোধ ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও সচিবকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করতেন বা আদেশ দিতেন, তবে তা দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করার মত সচিবের অভাব ছিল না। কারণ সচিবরা মন্ত্রীদের চিনতেন। বিশ্বাস করতেন, মন্ত্রী কখনই এ-নিয়ে সচিবদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে না।

গত পঞ্চাশ বছরে গোটা চিত্রটাই পাল্টে গেছে। এই রাজ্যটার দিকে তাকান।

এই রাজ্যের শাসনভার আর প্রশাসকদের উপর পুরোপুরি ন্যস্ত নেই। সেই ভার অনেকটাই অধিকার করে নিয়েছে শাসক দলের বড় শরিক সিপিএম। তারা বিশাল ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছে। প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি মহল্লায় এই ক্যাডার বাহিনীই প্রশাসনের তৃণমূল স্তর।

ওরাই 'প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' চালায়। পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ওরাই পার্টি অফিসে প্রতিটি পরিবারের, প্রতিটি ব্যক্তির খবর পৌঁছে দেয়। তারা কী খায়, কোন্ পত্রিকা পড়ে, কোন্ পার্টিকে ভোট দেয়, তাদের বাড়ি কারা আসে, সবই পার্টি অফিসের নজরে আনে। পার্টি অফিস চাইলে উনুন জ্বলবে, জমিতে

চাষ করা যাবে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্ক ঠিক রাখা যাবে। তারা না চাইলে থানায় অভিযোগ করা যাবে না, আদালতে যাওয়া চলবে না, বুথে ভোট দিতে যাওয়া চলবে না। বাড়ি করতে গেলে তোলা দিতে হবে, পাড়ার ক্যাডারদের কাছ থেকে ইট-বালি-পাথর কিনতে হবে। লিডার-ক্যাডাররা কারও বউ-বোনকে একটু-আধটু ধর্ষণ-টর্ষণ করলে পুলিশ-আদালত করা চলবে না। পার্টি অফিসকে জানাতে হবে। তাদের সালিশি মেনে নিতে হবে। বেয়াদপি করলে ধোপা-নাপিত বন্ধ। পরের ধাপে 'দমদম দাওয়াই'। তাতেও ঠিক না হলে প্রয়োগ করা হবে 'কেশপুর দাওয়াই'। জ্বালিয়ে দেওয়া হবে গৃহ সমেত গৃহবাসীদের।

প্রশাসনিক বড়-বড় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সি পি এম-এর রাজ্যদপ্তর। কে উপাচার্য হবে, কে হাসপাতালের সুপার, কে চিফ সেক্রেটারি হবে, কে হোম সেক্রেটারি, কে পুলিশ কমিশনার হবে, কে ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ—এ'সবই ঠিক করে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজ্যদপ্তর।

এই যে বিশাল এক প্যারালাল প্রশাসনের জাল রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার প্রভাব ভয়ংকর হতে বাধ্য। এইসব প্রশাসকরা সি পি এম-এর কৃপায় চেয়ারে বসতে পেয়ে সিপিএম-কে খুশি রাখতে গিয়ে চাকর-বাকর হয়ে পড়েন।

ক্যাডার থেকে সরকারি দপ্তরের সচিবরা পর্যন্ত দুর্নীতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দীর্ঘ বছর ধরে সাধারণ মানুষদের শাসন করে চলেছে। এরা কিছুতেই চাইতে পারে না যে—বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে সরে যাক; দুর্নীতিমুক্ত হয়ে উঠুক রাজ্যটা এবং রাজ্যের প্রশাসন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রশাসনের অবস্থাও অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের মতো। পার্থক্য শুধু এই—পশ্চিমবঙ্গের মতো ক্যাডার নেটওয়ার্ক আর কোনও রাজ্যে নেই। এই রাজ্যের ক্যাডার বাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ইলেকশন মেশিনারিজ থেকে মন্দির কমিটি সর্বত্র ওরা ছড়িয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্যাডারদের তাই ভয়ও আছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারালে পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রস্ত মানুষরাই যে ওদের পিটিয়ে মারতে পারে, সেটা জানে। ইন্দোনেশিয়ায় ১০ লক্ষ কমিউনিস্টদের হত্যা করার ইতিহাস ওরা ভোলেনি।

পেশিশক্তি দিয়ে কেউই চিরকালের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি, পারবেও না।

৬ এপ্রিল ২০০৮ রবিবার 'অল ইন্ডিয়া রিটায়ার্ড জাজেস অ্যাসোসিয়েশন' নামের এই সংস্থার সম্মেলনে বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। আলোচনায় এ'কথাও উঠে আসে— সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও সংগঠিত হিংসা এ'কথাই বলে, আমাদের দেশের গণতন্ত্র দুর্বল হচ্ছে।

. . .

এর ঠিক চার দিন পরে ১০ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্টের ৫ জনের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিল, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ৪৯.৫ শতাংশ জাত-পাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সংশোধনীটি সংবিধানসম্মত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক রায়টির ফলে এক দিকে অনগ্রসর শ্রেণিকে অগ্রসর করার নামে মেধার উৎকর্ষকে অবজ্ঞা ও শিক্ষার গুণগত মানকে নামিয়ে আনার কাজটি সমাধা হল। আর এক দিকে আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মায়াবতীর থাবা থেকে নিম্নবর্গীয় ভোট ছিনিয়ে আনতে কংগ্রেসকে সাহায্য করবে। কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্বেই এই সংরক্ষণ সংশোধনটি আনা হয়েছিল পার্লামেন্টে।

বিভিন্ন মহল থেকে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, সুপ্রিমকোর্টের এই রায় কি কংগ্রেস সরকারকে তুষ্ট করতেই দেওয়া হয়েছে? 'অল ইন্ডিয়া রিটায়ার্ড জাজেস অ্যাসোসিয়েশন' কি এমন কোনও আসন্ন দুর্নীতির ইঙ্গিত করেছিলেন?

প্রশাসনের সর্বস্তরে আজ দুর্নীতির রাজ চলছে। সাহিত্য আকাদেমি থেকে সঙ্গীত আকাদেমি—সর্বত্র সরকারের পেটোয়াদের রমরমা। মধ্যমেধার 'বুদ্ধিজীবীরা' সার কথাটা বুঝে গেছেন যে সরকারের কৃতদাস হলে সরকারি ফ্ল্যাট, পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণ, স্টাডি লিভ, বড় পদ ইত্যাদি জুটবে। আজ সাংস্কৃতিক জগৎ শাসন করছেন মধ্য মেধার বুদ্ধিজীবীরা—কথাটা কটূ হলেও সত্যি।

ভোটে জিতে সরকার গড়তে গেলে নানা ফ্যাক্টর কাজ করে। তারই মধ্যে অন্যতম হলো ভোটার লিস্ট তৈরি, ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর। এই ভোট প্রক্রিয়া-পরিচালনা করার অধিকারী প্রশাসকরা আমার দলের লোক হলে কেল্লা ফতে। লিস্টে জাল ভোটার ঢুকবে, সরকারের ইস্যু করা রেশনকার্ড দেখিয়ে। এখানেও সরকারকে তুষ্ট করতে চাওয়া রেশন দপ্তরের প্রশাসকের সক্রিয় সহযোগিতা চাই-ই। ভোটের দিন বুথে একই লোক দশ-বিশবার বোতাম টিপলেও ভোট বন্ধ হবে না। এজন্যেই সরকারি কর্মচারী থেকে শিক্ষকদের মধ্যে ইউনিয়নবাজি করতে হয়।

এই দুষ্ট-নষ্ট প্রশাসকদের তৈরি করেছে, পালন ও পুষ্ট করেছে শাসক দল ও তার প্রভুরা। এই বঙ্গ থেকে কেন্দ্র—সর্বত্র কম-বেশি একই ভূমিকায় প্রশাসকরা।

পুলিশ (এক)

ভারতবর্ষে যখন জমিদার-জোতদার-তালুকদার ইত্যাদি সামন্তপ্রভুরা রাজ করত, তখন তাদের প্রশাসকের দায়িত্ব ছিল নায়েব, খাজাঞ্চি, মুনশি ইত্যাদিদের ওপর। এইসব সামন্তপ্রভু ও তাদের প্রশাসকদের কথাই ছিল আইন। 'আইনের শাসন' বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল পাইক-বরকন্দাজ-পেয়াদাদের ওপর। এরাই ছিল তখন নানা শ্রেণির 'পুলিশ'।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পাওয়ায় পরাধীনই রয়ে গেছে। রাজা-জমিদাররা বিদায় নিয়েছে। পরিবর্তে এসেছে শাসকদল, রাজনৈতিক পার্টি।

পাইক-বরকন্দাজ-পেয়াদারা নাম পাল্টে হয়েছে পুলিশ। কাজ একই থেকে গেছে। বেয়াদপ প্রজাদের উচিত শিক্ষা দেওয়াটাই পুলিশদের কাজ। পুলিশ শাসকদলের স্বার্থ দেখবে, শাসকদলও পুলিশদের স্বার্থ দেখবে।

অতএব পুলিশরা বর্তমানে মস্তানদেরও মস্তান, গুন্ডাদেরও গুন্ডা। পুলিশরা জানে—এক হাতে নিই, তো এক হাতে দেই। পুলিশের উচ্চপদে রয়েছেন 'ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস' সংক্ষেপ আই পি এস অফিসার। শাসক দলের 'গুড বুক'-এ থাকলে এঁরা বড় বড় পদ পান। নতুবা গুরুত্বহীন পদেই রগড়ে যেতে হবে সারাটা জীবন।'

এখনও এ-রাজ্য সহ দিল্লি, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্নাটকের পুলিশ আন্তর্জাতিক মানে উঠতে পারে ঠেলায় পড়লেই। জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দন বসুর ব্রিফকেস থেকে জনৈকা মন্ত্রীর মোবাইল হাওড়া স্টেশনের ভিড়ে চুরি গেলেও পুলিশ চুটকি বাজিয়ে তা ধরে দেয়।

আসলে সব ধরনের অপরাধীদের নিত্যকার খোঁজ-খবর এলাকার পুলিশের জানা। ছিঁচকে চোর থেকে সুপারি-কিলার প্রত্যেকের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে হয়, হালহকিকত জানতে হয়। থানায় ডায়েরি বা এফ আই আর হলেই হিস্যা আদায় করতে হবে না। মন্ত্রীর বেলায় বেগার খাটনি!

মাঝে-মধ্যে বধূহত্যার অভিযোগ এলেই থানায় চন্‌মনে ভাব দেখা যায়। বর-শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ সবাইকে ধরে এনে হাজতে পুরে কেস হালকা করার জন্য দরাদরি করতে থাকে। গরিব হলে ২-৫ লাখ, ধনী হলে কোটির ঘরে বোঝাপড়া হয়।

পুলিশকে ফুটের দোকানি থেকে বাস-লরির কাছ থেকে তোলা আদায় করার বে-আইনি অধিকার দিয়েছে সরকার। বিনিময়ে সরকার চায়—পুলিশ তাদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকুক।

কাদের ডায়েরি নেবে কাদের ডায়েরি নেবে না, সে সবই ঠিক করে দেয় সরকারের পার্টির ক্যাডার-লিডাররা।

না। অতি কুখ্যাত বহু আলোচিত বরাহনগর গণহত্যা নিয়ে আলোচনায় ঢুকছি না। অন্য একটি খুবই কম আলোচিত ঘটনা তুলে আনছি।

এই বঙ্গে তখন কংগ্রেস রাজত্ব। সাল ১৯৭০, তারিখ ১৯ নভেম্বর। বিশাল পুলিশ বাহিনী বেলেঘাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘিরে ফেলে ও ৫০ জনের মতো যুবককে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ও ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। এই হত্যার মূল দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসিডিডি দেবী রায়। সিপিএম তখন বিরোধী পক্ষ। বিরোধী পক্ষের দাবিতে সাংসদদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গড়তে বাধ্য হয় সরকার। কমিটিতে ছিলেন ভি কে কৃষ্ণমেনন, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হীরেন মুখার্জি, অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি, জনাব বকর আলি মির্জা, সলিল গাঙ্গুলি, সুহৃদরঞ্জন মল্লিক চৌধুরী, জ্যোতির্ময় বসু ও শিবচন্দ্র জানা।

কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। আজও বামফ্রন্ট সরকারের কাছে তা রক্ষিত আছে। আজও মুক্তির আলো দেখেনি। তারই একটা অংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

"১৯ নভেম্বর ১৯৭০ সাল মধ্যরাতে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী বেলেঘাটার সি আই টি অঞ্চলসহ এক বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে ফেলে। কলকাতা পুলিশের ডিসিডিডি দেবী রায়ের নেতৃত্বে ১,৫০০ সশস্ত্র পুলিশ ওই এলাকার ৫৫৬টি ফ্ল্যাটে হামলা চালায়। ৫০ জনের মতো যুবককে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। রাত ৪টা নাগাদ ভ্যানগুলো রওনা হয়। 'বালুচর' নামের স্থানে পৌঁছে হাত বাঁধা কিছু যুবককে নামিয়ে এনে গুলি করে মারা হয়। তারপর দেবী রায়-সহ ভ্যান স্থান ত্যাগ করে।"

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার গদিতে বসল। বামপন্থী সাংসদদের পেশ করা রিপোর্ট কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনল না সরকার। দেবী রায় এই গণহত্যার জন্য শাস্তি তো পেলেনই না, বরং লাল সরকার দেবী রায়কে নানাভাবে পুরস্কৃতই করল।

ট্র্যাজেডি এই যে, এটাই ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন ১৯৯৭-৯৮-এর বার্ষিক রিপোর্টে বলেছে—পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন, ধর্ষণ বা হত্যার ঘটনা ঘটলে তা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাতে ব্যর্থ হলে, জানাজানি হয়ে গেলে অপরাধী-পুলিশকে বাঁচাতে গপ্পো বানানো হয়, মিথ্যে সাক্ষী হাজির করা হয়, নথিপত্র পাল্টে দেওয়া হয়। পুলিশি নির্যাতনের শিকার মানুষটি, তার পরিবার ও সাক্ষীদের পুলিশ ভয় দেখায়, টাকার লোভ দেখায়। এরপরও যদি মামলা কোর্টে ওঠে তবে অভিযুক্ত পুলিশ দিনের পর দিন আদালতে হাজির হয় না, তারিখের পর তারিখ নিতে থাকে। দোষী পুলিশদের

আর্থিক জরিমানা হলে তা দোষী পুলিশ মেটায় না। মেটানো হয় আমাদের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি তহবিল থেকে।

এরপর আমরা কার ওপর ভরসা করব? সরকার? নাকি পুলিশের ওপর?

পুলিশ (তিন) : পুলিশ-প্রশাসন যখন মিলেমিশে আইন ভাঙে

১৯৯৭-এর মার্চ। এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিভিন্ন মিডিয়ার সামনে ঘোষণা করেছিলেন, "পুলিশকে নির্দয় হাতে অপরাধীদের মোকাবিলা করতে হবে এবং দেখতে হবে যেন মানবাধিকারের অজুহাতে তারা দুর্বল না হয়ে পড়ে।" প্রশাসক পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুলিশকে আইন ভাঙতে উৎসাহিত করেছিলেন সেদিন।

২০০১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের ১ নম্বর প্রশাসক হয়ে পুলিশের উদ্দেশে বলেছিলেন, "সরকার আপনাদের যে বন্দুকগুলো দিয়েছে সেগুলো অপরাধ দমনে ব্যবহার করুন। মানবাধিকার-টানবাধিকার ব্যাপারগুলো আমি দেখব।"

পশ্চিমবঙ্গে তখনও মাওবাদী সংগঠন করা কোনও বে-আইনি কাজ নয়; কারণ মাওবাদী পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। তারপরও মাওবাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এই রাজ্যের পুলিশ যে-ভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তা সম্পূর্ণ বে-আইনি। মাওবাদী দলের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারের খবর আমাদের প্রায়ই দেখতে হয়। খবরে এও জানতে পারি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের কাছে নাকি মাওবাদী পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

পুলিশের এইসব সন্ত্রাসমূলক বে-আইনি কাজ থেকে এই রাজ্যবাসীদের রক্ষা করতে পারে রাজ্যের ১ নম্বর প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই যদি পার্টির বিরোধীদের বিরুদ্ধে, দেশবাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়ে যুদ্ধে নামেন তখন তাকে মানবাধিকারের শত্রু বুশের থেকে পৃথক করতে পারি কি? পারি না।

দুটি সাম্প্রতিক ঘটনা তুলে আনছি।

(এক) ২০০৬ সালে অক্টোবর দিল্লির কাছে নয়ডায় এক বিশাল প্রাসাদের চত্বর খুঁড়ে পাওয়া গেল অন্তত ১৯টি নারী ও শিশুর দেহাংশ। প্রাসাদের মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের হাজার কোটির মালিক। পেশায় ব্যবসায়ী। মনিন্দর সিং ও তার পরিচারক সুরিন্দর কোলি গ্রেপ্তার হয়। তারা সি বি আই ও পুলিশের কাছে বীভৎস স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। শিশু, কিশোরী ও তরুণীদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হত। তাদের কারো কারো বিশেষ দেহাংশ রান্না করে খেয়েছিল। গাজিয়াবাদ বিশেষ আদালতে মামলা ওঠে। সি বি আই তার চার্জশিটে মনিন্দর সিং-কে কার্যত ক্লিনচিট দিয়ে সব অভিযোগের দায় চাপিয়ে দেয় মনিন্দর সিংয়ের পরিচারক সুরিন্দরের ওপর। তখন থেকেই সি বি আইয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠে, মনিন্দরকে রক্ষা করতে চাইছে তারা।

মনিন্দর সিংয়ের প্রাসাদচত্বর থেকে পাওয়া গিয়েছিল এক বাঙালি পরিচারিকা পিঙ্কি সরকারের পচাগলা দেহ। পিঙ্কির বাবা যতীন সরকার গাজিয়াবাদের সি বি আই বিশেষ আদালতে মনিন্দরের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। যতীন সরকারের কাছে মনিন্দর সিংয়ের স্বীকারোক্তি সযত্নে রাখা ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ গাজিয়াবাদ আদালতে যতীনের সাক্ষী হিসেবে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে যতীনের মৃত্যু হয় ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে। মৃত্যু না হত্যা? এই প্রশ্ন প্রবল ভাবে উঠে এসেছে। কারণ যতীন ও তাঁর স্ত্রী বন্দনাকে কিছুদিন ধরে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল -মনিন্দরের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ যেন পেশ না করা হয়। বন্দনার অভিযোগ, হুমকি দিচ্ছিলেন স্বয়ং সি বি আই ডিরেক্টর বিজয়শংকর, হুমকি দিচ্ছিলেন সি বি আইয়ের এস পি জে এম গিলানিও।

(দুই) সি বি আই কর্তার বিরুদ্ধে সমস্ত কথা জানিয়ে বন্দনাদেবী ৮ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেন। ২৯ সেপ্টেম্বর চিঠি দেন নয়ডা থানায়। এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি বরং নয়ডার ডি এস পি দীনেশ যাদব এবং মুর্শিদাবাদের এস পি রাহুল শ্রীবাস্তব নাকি কোনও ব্যবস্থা তো নেননি উপরন্তু এফ আই আর গ্রহণ করেননি।

বন্দনা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান, (১) : মেয়ের খুনিকে আড়াল করতে মেয়ের বাবাকে ফোনে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। (২) : শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবাকে খুন করা হয়েছে। (৩) : পুলিশ এই ঘটনার এফ আই আর নিতে অস্বীকার করেছে।

১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জবাবদিহি করে নোটিস পাঠিয়েছে সি বি আই প্রধান বিজয় শংকর, সি বি আই এস পি গিলানি, নয়ডার এস পি দীনেশ যাদব এবং মুর্শিদাবাদের এস পি রাহুল শ্রীবাস্তবকে।

এই ঘটনার কথা মিডিয়া প্রকাশ্যে নিয়ে আসায় বহরমপুর থানা বন্দনার এফ আই আর গ্রহণ করতে হলো।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—বন্দনা কি ন্যায়বিচার পাবেন? পুলিশ-প্রশাসন এখানে কি ধনীদের রক্ষকেরই কাজ নিয়ে খুনি ও গুণ্ডার কাজ করেছে?

২২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় আগুন জ্বলল। হাজার-হাজার মানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ল পুলিশের ও শিল্পপতি অশোক টোডির বিরুদ্ধে। গোটা এলাকা দীর্ঘ সময়ের জন্য রণক্ষেত্র হয়েই রইল। প্রবল ইটবৃষ্টি, বাস-গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশের জিপে আগুন—কেন এই ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ শিল্পপতি ও পুলিশের আঁতাতের বিরুদ্ধে?

ফ্ল্যাশব্যাক—রিজওয়ানুর মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বিয়ে করেছে কোটিপতি ব্যবসায়ী অশোক টোডির মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে। ধনী শিল্পপতি হয়ে রিজওয়ানুর-প্রিয়াঙ্কাকে বিচ্ছিন্ন করতে গত কয়েক দিন ধরে চূড়ান্ত গুণ্ডামি করছিল কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আই পি এস অফিসাররা। দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ আইন মাফিক বিয়ে করেছেন—এ'সব তথ্যই ভালোমতো জানতেন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখার্জি, দুই আই পি এস অফিসার জ্ঞানবন্ত সিং ও অজয় কুমার। তারপরও এইসব আইনের রক্ষকরা টোডির হয়ে স্রেফ গুণ্ডামি করে গেছেন রিজওয়ানুর ও তাঁর পরিবারের উপর। ভয় দেখিয়েছেন মিথ্যে মামলায় জেলে ঢোকাবার, এমনকী খুনের।

২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পাতিপুকুর রেললাইনের ধারে রিজওয়ানুরের মৃতদেহ আবিষ্কার, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে বেওয়ারিশ লাশ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে জনতা ক্ষোভে, ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। ২০০৭ নভেম্বরের ৩ তারিখ। ইতিমধ্যে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই সি বি আই-এর তদন্তে ও মিডিয়ার দৌলতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে শিল্পপতিদের টাকার কাছে গোলামি করা পুলিশের চরিত্র। তারই পাশাপাশি স্পষ্ট হয়ে গেছে পুলিশ ও শাসক দলের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। পুলিশের অনৈতিক ও বে-আইনি কাজকর্ম বেআব্রু হওয়ার পরও ওইসব বড় মাপের পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স এনকোয়ারির আদেশ দেননি পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কারণটা স্পষ্ট। নির্বাচনে জিততে পুলিশকে পার্টির ক্যাডারের মত ব্যবহার করতেই হয় বুদ্ধদেব বাবুকে। অতএব বিনিময় মূল্য দিতে পুলিশের শত অপরাধেও চুপ করে না থেকে উপায় কী?

গোটা দেশেরই একটি রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েই গত কয়েকটা বছরের ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলাই আসুন। পশ্চিমবাংলায়

শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৯২-এর নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ কাসটডিতে (custody) বা হেফাজতে অভিযুক্ত মারা গেছেন ১৩৬ জন। Custody কথার অভিধানগত অর্থ 'নিরাপদ তত্ত্বাবধান', 'নিরাপদ রক্ষণ'। সন্তান যেমন পিতা-মাতার নিরাপদ তত্ত্বাবধানে বা হেফাজতেই বড় হয় পরম নিশ্চিন্তে, তদন্ত চলাকালীন তেমন নিশ্চিতেই পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তের থাকাটা আইনমাফিক স্বাভাবিক। সেই আইনকে ভঙ্গ করে পুলিশ যে বর্বরোচিত নির্যাতন অভিযুক্তদের ওপর চালায়, তা অভিজ্ঞতাহীন মানুষদের পক্ষে কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ১৬৩ নম্বর ফৌজদারী দণ্ডবিধি মত পুলিশ কখনই কোনও অভিযুক্তকে মারধর তো করতে পারেই না, এমনকি হুমকি বা ভয় পর্যন্ত দেখাতে পারে না। এই আইনটি-সহ প্রতিটি আইনের রক্ষক হলো পুলিশ। একই সঙ্গে সংবিধান অনুসারে পুলিশ আইনের অধীন। অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই সে আইনকে ভঙ্গ করতে পারে না। ভঙ্গ করলে সেও অবশ্যই অপরাধী, শাস্তি-যোগ্য অপরাধী।

কিন্তু আপনার-আমার অভিজ্ঞতা কী বলে? পুলিশ নিজেই আইন মানে না। প্রতিটি মুহূর্তে আইনের রক্ষকদের হাতেই আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। লরি আর বাসের ঘুষে সন্তুষ্ট নয়। চোরাকারবারি, ভেজালদার, ডাকাত, মস্তান, ড্রাগ ব্যবসায়ী, বিল্ডিং প্রমোটার, সবার সঙ্গেই আজ থানা ও পুলিশের দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক। আইন ভঙ্গকারীরা আইনের রক্ষকদের ছত্র-ছায়ায় আইন ভাঙছে। আইনের রক্ষকরা আইনের মুখে নিত্য প্রতিটি মুহূর্তে লাথি কষিয়ে বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের রক্ষকের ভূমিকা নিচ্ছে। বার-বার তাই পুলিশকে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বয়কট করেছে জঘন্য সমাজবিরোধী বিবেচনায়, চূড়ান্ত ঘৃণায়। এলাহাবাদ আদালতের বিচারপতির ভাষায় "পুলিশ মানে সবচেয়ে সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী।"

প্রসঙ্গতে ফিরি—পুলিশ হেফাজতে মৃত ১৩৬ জনের জন্য কতজন পুলিশকে সরকার শাস্তি দিয়েছে? একজনকেও না। তবে কি ওইসব মৃত্যুর জন্য পুলিশ দায়ী নয়? সকল অভিযুক্তই কি তবে আত্মহত্যা করেছিলেন? একটু চোখ বোলান পৃথিবীর আরও কিছু দেশে, এই যেমন সাউথ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ফৌজি একনায়ক শাসিত দেশগুলোতে, দেখবেন ও'সব দেশেও পুলিশ হেফাজতে অত্যাচার সহ্য করার শক্তি হারিয়ে লোকে মারা যায়। ও'সব দেশের সরকারও এ'দেশের সরকারের মতই পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তো দূরের কথা, কোনও অভিযোগই আনে না।

আবার পুরনো প্রসঙ্গে একটু ফিরে তাকাই। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ হেফাজতে ১৩৬ জন অভিযুক্তকে হত্যা করা হলো। আইনের রক্ষকদের হাতেই আইন ধর্ষিত হলো, মানবাধিকার একটা বিশাল তামাশায় পরিণত হলো, তবু রাজ্য সরকার একজনকেও শাস্তি দিল না। যেখানে শাস্তি হয়েছে, সেখানেও দেখা গেছে অত্যাচারিতের আপনজনেদের চেষ্টায় আইনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথে এই শাস্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

গত দশ বছরে পশ্চিমবাংলায়, কেবলমাত্র পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ৪৩টি। ১৯৮৭-র জুলাইতে তারকেশ্বর থানার কনস্টেবল তারই সহকর্মী মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এদের কতজনের শাস্তি হয়েছে? শুধুমাত্র একজনের কথা জানি, ৯১ সালে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের কায়দা বিবিকে থানায় এনে শ্লীলতাহানির প্রমাণে বড়বাবুর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বাকিদের?

শিক্ষিকা অর্চনা গুহকে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে এসেছিল। উদ্দেশ্য—অর্চনাকে জেরা করে তাঁর নকশাল ভাইয়ের খোঁজ জানা। আইনের রক্ষকরা জেরা করতে পারেন। কিন্তু কোনও ভাবেই পারেন না জেরা করে কথা আদায় করার নামে, কোনও মানুষকেই মারধর করতে, ভয় দেখাতে, এমনকি লোভনীয় কোনও টোপ দিতে। ভারতীয় সংবিধানের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারেই এ-সবই বেআইনি। আইন ভাঙলে পুলিশও শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে চিহ্নিত হবে। কিন্তু আমর অভিজ্ঞতায় কী দেখলাম? বর্বরোচিত অশ্লীল অত্যাচারে অর্চনা পঙ্গু হয়ে গেলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুণু গুহনিয়োগীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালিয়েছেন ন্যায়বিচারের আশায়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আশায়। কলকাতা পুলিশের 'রেগুলেশন' অনুসারে এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই নির্দেশকে অবহেলা করে রাজ্য সরকার ক্রমান্বয়ে রুনু গুহনিয়োগীর পদোন্নতিই ঘটিয়ে গেছে। এ সবই কি মানবাধিকারকে সরকার কর্তৃক লঙ্ঘনেরই প্রমাণ নয়?

১৯৯২-এর শেষার্ধে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পাঞ্জাব পুলিশ কলকাতার একবালপুর অঞ্চল থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করলেন "সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যপলাপ নিবারক আইন" (TADA)-এ। ওদের বিমানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পঞ্জাবে। দুই নিরস্ত্র মানুষকে বিমান থেকে নামিয়ে পুলিশ তাদের গুলি করে হত্যা করল। এই তো দেশের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। হত্যাকারী পুলিশদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, হবে না। রাষ্ট্রশক্তি স্বয়ং আজ সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, মানবাধিকার ধর্ষণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

লেখার এই অংশটা পড়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—শিখ উগ্রপন্থীরা যখন নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, তখন? সে বিষয়ে কী মতামত দেবেন? না কি মুখ বুজে থাকবেন?

এ-জাতীয় প্রশ্ন ওঠে, বার-বার ওঠে। প্রশ্নকর্তারা কখনও ব্যক্তি, কখনও বুদ্ধিজীবী, কখনও রাজনীতিক, কখনও পত্র-পত্রিকা, কখনও রাষ্ট্রশক্তি। হুজুরের দল ও তার কৃপাধন্যেরা বারবার এমন প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে নিজেদের বেআইনি কাজের প্রতি জনমত তৈরি করতে চায়, জন-বিক্ষোভ এড়িয়ে মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। যারা সরকার-ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী,

তারা যখনই কোনও নিরীহ বা অ-নিরীহকে হত্যা করছে তখনই দেশের আইন ভঙ্গকারী। শাস্তির স্পষ্ট বিধান দেওয়াই আছে। এবং সেই আইনমাফিক শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রশক্তির আছে। রাষ্ট্রশক্তি সেই আইন মাফিক না চলে আইনকে ভঙ্গ করে যা করছে তা অবশ্যই বে-আইনি। তা অবশ্যই রাষ্ট্র-সন্ত্রাস। তা অবধারিতভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন।

পুলিশ বার বার দুর্নীতি চালিয়েও পার পেয়ে যায়, কারণ পুলিশ সমাজ কাঠামো বা সিস্টেম'কে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এদেশের পুলিশরা আইনের রক্ষার জন্য পরিচালিত না হয়ে, প্রশাসনকে দেশ শাসনে সাহায্য না করে গদিতে বসা রাজনৈতিক দলের ইচ্ছের দ্বারাই পরিচালিত হয়। নির্বাচনে রিগিং হলে কখনও চোখ বুজে থাকে। কখনও বা সরকারের পক্ষে রিগিং পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে—এ'সবই তো আপনি, আমি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি।

জঘন্যতম কাজ-কর্ম, অত্যাচার ও দুর্নীতি 'পুলিশ' নামক সবচেয়ে সংগঠিত সরকারি গুণ্ডাবাহিনীকে চালাতে দেওয়া হয়। বিনিময়ে তারা এই অসাম্যের ও দুর্নীতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের হত্যাকারীর ভূমিকায় নামে। পুলিশ হত্যা করলে তাকে বলে 'এনকাউন্টার'।

রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির ওপর যথেষ্ট নজর রাখে সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর। গোয়েন্দা দপ্তরের রয়েছে বহু বিভাগ। আমাদের রাজ্য সরকারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টেরই রয়েছে তিরিশের ওপর বিভাগ বা সেল। ছাত্র, রাজনৈতিক দল, দেশের মানুষের যথার্থ স্বার্থরক্ষায় সংগ্রামী সংগঠন ইত্যাদি প্রত্যেকটা বিভাগের উপর নজর রাখার জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা সেল। গোয়েন্দারা এইসব সংগঠনগুলোর উপর নজর রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীরা গোয়েন্দাদের সাহায্যে তাদের নিজেদের দলের ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের উপর নজর রাখেন, নিজের গদিটিকে নিষ্কণ্টক রাখতে। বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনের হাল-চালের খবর রাখেন। প্রয়োজনে কৌশল হিসেবে কোনও কোনও আন্দোলনকে বাড়তে দেন। অনেক ক্ষেত্রে এইসব আন্দোলন শোষিত মানুষদের ক্ষোভকে বের করে দেওয়ার সেফটি ভাল্‌ভের কাজ করে। কিন্তু যখন গোয়েন্দা দপ্তর থেকে খবর মেলে কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠন বর্তমান সমাজ-কাঠামো বা সিস্টেমের পক্ষে বিপজ্জনক, তখন পুলিশ হয়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদী।

বিরোধী আসনে বসে পুলিশের বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলা রাজনীতির মানুষগুলোই গদিতে বসার অধিকার যখনই পেয়েছে, তখনই আন্তরিকতার সঙ্গেই চেয়েছে, পুলিশ থাক সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী হয়েই। পুলিশ থাক দুর্নীতির নেশায় মশগুল হয়ে। আর এই দুর্নীতিই পুলিশকে করে তুলবে জনগণের সেবকের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলের সেবক। ইতিহাস বার বার সেই সত্যকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আসুন ইতিহাস থেকে এক-আধটা উদাহরণ একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি।

১৯৭০ থেকে ৭৬-এ কংগ্রেস সরকারের আমলে জেলখানায় ৪০০ বন্দি হত্যা হয়েছিল। কলকাতার কাশীপুর বরাহনগরে এক দিন রাতের অভিযানে হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল। স্থানীয় মানুষ দেখেছে ঠেলায় চাপিয়ে গাদা করে কীভাবে গঙ্গায় ঢেলে দিতে চাপানো হচ্ছে মানুষের দেহগুলোকে। ১৯৭৭-এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের জামানা ('৭০—'৭৭)-র নায়কদের শাস্তি দেবেন। ২০০৮-এর শেষে দাঁড়িয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন—কতজন হত্যাকারীর শাস্তি হয়েছে? উত্তর পাওয় যাবে না।

ক্ষমতার সিংহাসনে যে চারটি পায়া, তারই একটি হলো পুলিশ। অতএব বিরোধী পক্ষে থেকে আইনভঙ্গকারী পুলিশদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যতটা সোজা, ক্ষমতার সিংহাসনে বসে শাস্তি দেওয়া ততটাই কঠিন।

অতীত ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বোলালে দেখতে পাব, ব্রিটিশ সরকারের বিনা-বিচারে আটকের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস বই প্রকাশ করেছিল, "পুলিশরাজ আন্ডার ব্রিটিশ ইন্ডিয়া"। ব্রিটিশ বিদায় নিতে ক্ষমতার সিংহাসনে বসে কংগ্রেস সেই 'পুলিশ-রাজ'-কেই বরণ করল।

মূলায়ম সিং যাদব সরকারের আমলে উত্তরপ্রদেশ সরকার সরকারি সিমেন্ট কারখানা বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইল। প্রতিবাদ জানাল শ্রমিকেরা। পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৫ জন শ্রমিককে হত্যা করল। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করল, "কাল আমরা শাসন ক্ষমতায় এলে যারা গুলি চালিয়ে নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করেছে, তাদের শাস্তি দেবই।" তারপর উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতার সিংহাসনে বসল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সিংহাসনের একটি পায়া পুলিশরাজকে ঠিক-ঠাক রাখতে জনগণের সামনে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিকে ছুড়ে ফেলে দিল আঁস্তাকুড়ে।

এই সিস্টেমে এমনটাই ঘটবে, তা সিংহাসনে প্রতিবিপ্লবী বসুক, কি অতিবিপ্লবী।

সেনা (এক)

প্রায় প্রতিটি দেশই সেনাবাহিনী পোষে প্রতিরক্ষার নামে। জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ সেনা-খাতে ব্যয় করে। এবং ইতিহাস থেকে লাগাতার ভাবে দেখেই চলেছি, কি ভাবে সরকার বার বার তার সেনাবাহিনীকে দেশের মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়েই চলেছে। ইংরেজি পত্র-পত্রিকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল দেখার সুযোগ যাঁরা পান, তাঁরা প্রায়ই এই ধরনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত।

এ'দেশের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন সেনাবাহিনী সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে প্রতিবাদী দেশবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছে পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। বাস্তবিকই তাই, নাগাল্যান্ড-মেঘালয়-মণিপুর-অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে ও অন্ধ্রে, সর্বত্রই বীভৎস ধর্ষণ, হত্যা এই হল এদেশের সেনাদের কাজ। আমি এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের আন্দোলনগুলোর প্রতি কোনও ভাবেই সমর্থন বা অসমর্থন প্রকাশ করছি না। এই ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি একটি বাস্তব সত্যকে—

সেনাবাহিনী হল 'সিস্টেম' বা 'সমাজকাঠামো'
রক্ষার ক্ষেত্রে শেষ শক্তি
প্রয়োগের ধাপ।

সেনা (দুই)

রাষ্ট্র এ কথাই প্রচার করে—'সরকার মানেই দেশ।' সরকারবিরোধী মানেই রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী। ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই এই চিন্তাটা ব্যাপ্তি পেতে শুরু করে, ইন্দিরাই প্রচার শুরু করেছিলেন 'Indira is India' অর্থাৎ 'ইন্দিরাই ইন্ডিয়া।

সরকারবিরোধীদের শিল্পপতিবিরোধীদের সন্ত্রাস চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিতেই শেষ অস্ত্র সেনা সন্ত্রাস।

একটি সমীক্ষা : হাঁড়ির একটি ভাত...

২০০২-এর ২০ জুন বৃহস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়। সমীক্ষক সৌভদ্র চট্টোপাধ্যায়, ইম্ফল। শিরোনাম ছিল—ফৌজি পীড়নে বিধ্বস্ত মণিপুরী কিশোর-কিশোরী।

১৯ জুন : বয়স ছিল ১৪। কাকা জঙ্গি, ফেরার। জঙ্গি কাকার খবর বার করতে তাকে, তুলে নিয়ে যায় অসম রাইফেলস। প্রায় দু' সপ্তাহ পরে ছাড়া পায় ছেলেটি। দ্বিতীয়বার একই কারণে তাকে আটক করা হয় ১৭ বছর বয়সে। তার পরে আরও একবার। যখন সে বিশ বছরের যুবক।

মণিপুরের উরিপক এলাকার ২৪ বছর বয়সের এই যুবক জোরালো শব্দ সহ্য করতে পারে না। অন্ধকারে থাকা পছন্দ করে। পোড়া বা কোনো উগ্র গন্ধে চিৎকার করে ওঠে সে। দুর্বল স্বাস্থ্য। অচেনা লোকেদের সম্পর্কে অসম্ভব ভীত। খিদে নেই। সারাক্ষণ গুটিয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে ১৫-২০ মিনিটের বেশি মনঃসংযোগ করতে পারে না নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের এই যুবক।

১৬ বছরের মেয়েটির কথাই ধরা যাক। তার জবানবন্দি অনুযায়ী, "মা মদ বিক্রি করত। সেখানে নিয়মিত মদ্যপান করতে আসত তিন সেপাই।" একদিন মায়ের অনুপস্থিতিতে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে একশো টাকার নোট ফেলে রেখে দিয়েছিল। হ্যাঁ, আগের দিন একটা লিপস্টিক উপহার দিয়েছিল বটে।

ইম্ফল উপত্যকার মৈতেই মেয়েটির কথায়, "আমার কোনো যৌন ইচ্ছা আর অবশিষ্ট নেই। আমি সারা দিন মদ খেতে পারলেই খুশি। আর কিছু চাই না এই জীবন থেকে।"

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কোর'-এর 'টরচার্ড চিলড্রেনস্ প্রোগ্রাম'-এ এমন শারীরিক ও মানসিক আঘাতগ্রস্তের উদাহরণ ভুরি ভুরি।

কেবল গ্রামাঞ্চলেই নয়, নিরাপত্তারক্ষীদের অত্যাচারে এমন জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে শহরের তথাকথিত 'সুরক্ষিত' এলাকার বহু শিশু, কিশোর, যুবক।

সম্প্রতি থৌবাল জেলার লাপলেন গ্রামে অসম রাইফেলসের অভিযানের পরে ২১ জন গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়ে ইম্ফল হাসপাতালে ভর্তি আছেন, তা কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। মণিপুরে এই ট্রাডিশন দীর্ঘদিনের।

গত প্রায় দুই দশক ধরে ক্রমাগত সংঘর্ষের পরিমণ্ডলে থাকতে থাকতে মণিপুরিদের অবস্থা কী রকম?

ইম্ফলের জওহরলাল নেহরু হাসপাতালের মনস্তত্ত্ববিধ শান্তিবালা দেবী, '৯৬-'৯৮, এই সময়টা চূড়াচাঁদপুর জেলায় ছিলেন। তাঁর কথায়, "বহু সাধারণ মানুষ হিস্টিরিক্যাল হয়ে গিয়েছিল। অনেকের মধ্যে প্রবল ভয় ছিল, এই বুঝি ফৌজিরা ধরতে আসবে, এই বুঝি কেউ খুন করে ফেলল!"

এই পরিস্থিতিতে মণিপুরে আত্মহননের প্রবণতা সাংঘাতিক রকমের বেশি। 'কোর'-এর সমীক্ষা অনুসারে, '৯৬—'৯৮ সালে মণিপুরে আত্মহত্যার হার ছিল প্রতি মাসে ৪.৪ জন। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করত প্রতি মাসে ৭ জন। '৯৮—'৯৯

সালে আত্মহত্যার হার বেড়ে দাঁড়ায় মাসপিছু ৮ জন। আত্মহত্যার তালিকায় পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ছিল ১:১।

'৯৭ সালে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিহতের সংখ্যা ৪১৬, অত্যাচারিত ৭১ জন। ৩৮ জন নিখোঁজ হয়েছে। ৭২ টি 'কাস্টডি ডেথ'-এর খবর প্রকাশিত হয়েছে। '৯৮-এ এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে, ৪১৭, ৭১, ১৪, ১০।

কোর-এর সভানেত্রী আনা পিন্টো জানিয়েছেন "গত তিন বছরে মণিপুরে মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংস্রতার ঘটনা ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।"

শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন-আক্রমণের ঘটনা '৯৭ সালে মণিপুরে ২টি হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০-এ।

গত সাত-আট বছর ধরে 'কোর' ইম্ফল, মোরে, উখরুলের শহর, আধা-শহর অঞ্চলে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল ৪০ বছর বয়সি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মানুষের উপর। দেখা গিয়েছে, প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে দিনরাত কাটিয়ে এদের মধ্যে ড্রাগ, মদ্যপান, জুয়াখেলার প্রবণতা বেশি।

শান্তিবালার কথায়, "উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যায় মানুষ বেশি ভোগেন মণিপুরে। এত মানসিক চাপের মধ্যে থাকার এটা অতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।"

নিরাপত্তারক্ষীদের অত্যাচারে মানসিক আঘাতগ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্য দুরস্থান, এই শ্রেণিভুক্ত শিশুরাও মণিপুরে বিশেষ সাহায্য পাচ্ছেন না।

আনা জানাচ্ছেন, "পেনকিলারের মতো অতি সাধারণ ওষুধপত্র দিই। বাইরে একা একা বেরোতে যারা ভয় পায়, তাদের হাসপাতালে আসা যাওয়ার জন্য কোনো একজন সঙ্গী। কিছু পরামর্শ। এইটুকুই।"

স্বেচ্ছাসেবী, আক্রান্ত—দু'পক্ষই নিরাপত্তারক্ষীদের ভয়ে এতটা সন্ত্রস্ত যে অত্যাচারিতের নাম বা সুনির্দিষ্ট ঠিকানা প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি চাইলেন আনা। কারণ? "অতীতে হয়েছে, অত্যাচারের খবর প্রকাশিত হওয়ায় ফের সেই ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে রক্ষীরা।"

আমার হিসাবে, মণিপুরে প্রায় হাজার তিনেক যৌনকর্মী। আর তাঁদের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে এ পথে এসেছেন। ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে এঁদের গ্রাহক নিরাপত্তারক্ষীরাই।

কোরের কাছে দেওয়া ১৭ বছরের এক মৈতেই মেয়ের সাক্ষাৎকারে 'বিচারে'র একটা স্বপ্ন আজও আছে।

তার কথায় "আমার এডস হয়েছে। আমি কাউকে কিছু বলিনি। যে সেনারা আসে তাদেরও জন্মনিরোধক ব্যবহার করতে বলি না। আমি চাই যে ওদেরও এডস হোক।"

সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের সেনারা নাগরিকদের রক্ষা করে না। নানা ভাবে উলটে-পালটে ভোগ করে। সব প্রদেশের সেনাদের ভূমিকা একই রকম। হাঁড়ির একটি ভাত টিপলেই বাকি ভাতের হালহকিকত টের পাওয়া যায়।

একটি নিস্তরঙ্গ ট্রেন ও কিছু সন্ত্রাসবাদী

৬ জুলাই, ২০০৬। ভারতের প্রায় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর। খবরটির সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে।

ট্রেনযাত্রীকে নগ্ন করে ঘোরাল মদ্যপ সেনারা

পাটনা, ৫ জুলাই : "খালি কর ট্রেনের কামরা, না হলে ওর মতো নগ্ন করে ঘোরানো হবে সবাইকে।"

ওর মতো অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার পরমাত্মা যাদবের মতো। যাকে কাল রাতে গুয়াহাটি-নিউদিল্লি নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসে নগ্ন করে ট্রেনের মধ্যে ঘোরায় সেনাবাহিনীর মদ্যপ জওয়ানেরা। এমনকি জওয়ানেরা তাঁর পায়ু মৈথুন করার চেষ্টা করেছিল বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ পরমাত্মার।

বারাউনি আর পি এফ সূত্রে জানা যায়, ওই জওয়ানেরা বারাউনি কাটিহার ডিভিশনের মানসি স্টেশন থেকে মদ্যপ অবস্থায় ওই জেনারেল কামরায় চড়ে। ট্রেনে উঠেই তাঁরা বসে থাকা যাত্রীদের সিট ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বলে। কিছু যাত্রী প্রতিবাদ করলে তাঁদের মালপত্র চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে জানায় পুলিশ।

ওই কামরায় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা রেল পুলিশকে জানিয়েছেন, যাত্রীদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত জওয়ানেরা মালপত্র ফেলে দিয়েও তাদের রাগ কমেনি। এরপর হঠাৎ ওই কামরারই যাত্রী বালিয়ার পরমাত্মা যাদবের জামাকাপড় জোর করে খুলে ফেলে জওয়ানেরা। বিবস্ত্র অবস্থায় পরমাত্মাকে মানসি থেকে বারাউনি স্টেশন পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিমি যেতে বাধ্য করে তাঁরা। ওই দূরত্বের মধ্যে পাশবিকভাবে তাঁর পায়ু মৈথুন করার চেষ্টা করে মদ্যপ এক জওয়ান বলে অভিযোগ।

সেনা-সীমান্তরক্ষী বাহিনী-পুলিশ প্রায় সব্বাই ই...য়ে...র এপিট-ওপিঠ। ভালোরাই এখন ব্যতিক্রমী, সংখ্যালঘু।

"সেনা-পুলিশ কেইসা, দেশ কা নেতা জেইসা।" এ তো আজকের এক জনপ্রিয় শ্লোগান।

এ কথা মনে রাখতে হবে—ভারত রাষ্ট্রে সেনাদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও মামলা করার অধিকার কোনও নাগরিকের নেই। কয়েকজন সেনা আপনার বোন, বউ বা মাকে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে ধর্ষণ করে, তাহলেও কিছুটি করতে পারবে না আমাদের মহামান্য আদালত।

সেনা (তিন)

সন্ত্রাসবাদী ভারত রাষ্ট্রে 'জঙ্গলের আইন' 'A F S P A' চলছে

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য হল, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল। এই সাতটি রাজ্যে চালু আছে 'Armed Forces Special Power Act' সংক্ষেপে 'AFSPA' 'আফ্‌স্‌পা'। AFSPA-র মতো জঙ্গলের আইন সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রেই শুধু চলতে পারে বলে মনে করে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন।

মণিপুরে ভারতের নাগরিকদের উপর ভারতেরই সেনারা যে অত্যাচার করছে, তা কখনোই মার্কিনি সেনারা পরদেশ ইরাকের জনগণের উপর তো করেইনি, এমনকী ইরাকি সেনাদের উপরও করেনি।

মণিপুরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বীর মণিপুরবাসীদের পাশে সোচ্চার হয়েছিল Humanists' Association এবং ভারতের বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্তচিন্তার মানুষ। 'AFSPA' আইনটি বিষয়ে, দেশবাসীকে সচেতন করতে Humanists' Association বিভিন্ন ভাবে ব্যাপক প্রচার চালায়। তারই একটি হল 'লিফলেট' ছাপানো।

তাছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠন ও যুক্তিবাদী সংগঠনের কাছে e-mail-এ পাঠানো হয়েছিল।

Humanists' Association-এর জেনারেল সেক্রেটারি সুমিত্রা পদ্মনাভন কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট ও ওয়েবসাইটের বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে দিলাম।

***AFSPA* কী? জানুন**

ভাবুন ... একটু ভাবুন...

মণিপুরবাসীর বিরুদ্ধে ভারত সরকার এক অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে গত চব্বিশ বছর ধরে। ১৯৫৮ সালের সশস্ত্র (বিশেষ ক্ষমতা) আইন—যা ১৯৪২-এ

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ব্রিটিশ এনেছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য—সেনাবাহিনীকে 'উপদ্রুত' অঞ্চলে 'জঙ্গি' দমনের নামে জনগণের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনে—

৪ এ ধারা বলছে—কোনো ফৌজি জওয়ান, স্রেফ সন্দেহের বশে কাউকে গুলি করে খুন করার অধিকারী।

৪বি ধরায়—সৈন্যরা জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করার অধিকারী।

৪ডি ধারায়—সেনাবাহিনী ওয়ারেন্ট ছাড়াই যখন খুশি যে কারোর বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালাতে পারে।

৬ ধারায়—জওয়ান যতই অপরাধ করুক, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ দায়ের করা যাবে না।

অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশির নামে অত্যাচার, ধর্ষণ, গ্রেপ্তার এবং সম্পত্তি ধ্বংস—এসব ছাড়াও কোনো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে, এমনকী যা আদৌ ঘটেনি কিন্তু "ঘটতে পারে" বলে সেনারা মনে করছে, সেই সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার বা নির্বিচারে হত্যা আইনত সম্ভব। কোনো ক্ষেত্রেই সেনাদের বিরুদ্ধে শাস্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। এই যথেচ্ছাচারের লাইসেন্স এর নাম AFSPA।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সাব কমিটি (Human rights Sub Committee of UNO) ১৯৯১ এবং ১৯৯৭ সালে 'AFSPA' আইনকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে ঘোষণা করেছিল। UNO আরও বলেছিল যে, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত ১৯৯৬ সালের আন্তর্জাতিক সনদ এবং ১৯৮৪ সালের অত্যাচার বিরোধী সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ভারত, এই আইন বলবত রেখে চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ করছে।

ভারতের 'ঘোষিত গণতন্ত্রের' সঙ্গে এই 'সন্ত্রাসের হাতিয়ার' একেবারেই বেমানান। অবিলম্বে এই কালাকানুন বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হোন।

সর্বোচ্চ পদে থাকা নৌ-বিমান-স্থল বাহিনীর প্রধান থেকে চার ধাপ নিচু পদের সেনা অফিসার—প্রায় প্রত্যেকেরই একটি বিষয়ে খুব মিল। এঁদের সুরা-নারী ও অর্থে আসক্তি প্রবল। ওরা বেল্ট জুতো পোশাক থেকে সাবমেরিন, যুদ্ধবিমান, কফিন কিনতেও. কাট্‌মানি আদায় করেন।

সরকার ও তার প্রভু শিল্পপতিরা ওদের ঘাঁটায় না। লুচ্চামি থেকে চুরি যা খুশি কর, তবে যখন যেখানে চাইব, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বেআদপের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

সেনাবাহিনীর কাজ দেশ রক্ষা করা নয়, সরকারের অনুগত থাকা। অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার সিংহাসন ঠিক রাখতে হলে, সেনাদের হাতে রাখতে হলে ওদের 'একটু-আধটু' বেয়াদপি করতে দিতেই হবে।

তিন : প্রচার মাধ্যম

আমাদের দেশে প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্রগুলো, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, দূরদর্শন ও বেতার। ঠিক তার পরের ধাপেই আছে বিপুল প্রচারিত কিছু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা এবং তারও পরের ধাপে বিদেশি টেলিভিশন।

প্রধানত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে এবং কিছুটা আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্র ও দূরদর্শনকে খবর সরবরাহের কাজ করে কিছু এদেশি ও বিদেশি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা।

'দূরদর্শন' জনগণের টাকায় শাসকশ্রেণির প্রচার মাধ্যম

দূরদর্শন সরাসরি দেশবাসীর টাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। যে দল যখনই গদিতে বসুক, দূরদর্শন তার মূল চরিত্র কিন্তু অপরিবর্তিতই রাখে। নানারূপে, নানাভাবে ভোগবাদী ও অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতির প্রচার চালিয়ে যায়। ভোগে-ত্যাগে মিলিয়ে সব মানুষের মাথাই একই সঙ্গে চিবিয়ে খাওয়া যায় বলেই আমাদের দেশের দূরদর্শন ও বেতার বিপুল বিক্রমে একই সঙ্গে প্রচার করে সাঁইবাবা আর বাবা সায়গলকে। একদিকে ঋষি অরবিন্দের বাণী স্মরণ, আর এক দিকে শারন প্রভাকরের চিত্তহরণ—বস্ত্রহরণ। একদিকে 'এসো পড়াই', আর এক দিকে—ধর্ষণ করে দেখাই। একদিকে 'হে ভারত ভুলিও না', আর একদিকে ভারতবাসীদের ভুলিয়ে রাখার বিশাল আয়োজন। একদিকে গৈরিক আর নামাবলি জড়িয়ে ভোগের মুখে মুগুর, আর একদিকে 'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়',.. দেখতে ভাদ্দুরে কুকুর। একদিকে সতীত্বে-মাতৃত্বে-ত্যাগে নারী মহাশক্তির লীলা, আর একদিকে ফ্যাশান প্যারেডে আধা-ন্যাংটো নারীর মেলা। একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের 'বিশ্ব ধর্মসম্মেলন', আর একদিকে সামান্থা ফক্স-ম্যাডোনা-মাইকেল জ্যাকসনের উদোম নৃত্যের 'মহামিলন'। দূরদর্শনের এমন ভুবন জোড়া ভোগ ও ত্যাগের ফাঁদ থেকে বাঁচা বড়ই কঠিন হে!

আমার এমনতর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ বলতেই পারেন, "দোষটা একা সরকার বাহাদুরের নয়, দোষটা আমাদেরও।"

যিনি এ-ধরনের বক্তব্য রাখেন, তিনি বুদ্ধিজীবী না হয়ে সাধারণ মানুষ হলে বলতে পারি—দোষটা একা তাঁর নয়, দোষটা মগজধোলাইকারী বুদ্ধিজীবীদেরও।

বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে মগজধোলাই শুরু করে বোঝাতে একটা উদাহরণ টানা যায়। ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ 'বর্তমান' দৈনিক সংবাদপত্রের 'হামলোগ' কলমে সমর বসু লিখলেন, "বোম্বাই-এর টাকার থলির ক্ষমতা যে কত প্রচণ্ড সে আমরা আঁচও করতে পারি না। সমস্ত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চলছে কালো টাকায়। সরকার বাহাদুর জানেন না? কিছু করতে পেরেছেন? সামান্য অশ্লীল পোস্টার ছাপা বন্ধ করতে পারেন না যাঁরা তাঁরা কিনা অশ্লীল ফিল্ম বন্ধ করবেন? তাও আবার শ্লীল নাটক করে? দোষটা অবশ্য একা সরকার বাহাদুরের নয়, দোষটা আমাদের রুচিরও। আমরাই চাই এই ধরনের ফিল্ম উপোসী ছারপোকা যেমন চায় সেক্স।"

সমরবাবুর এইটুকু বক্তব্যের দিকে আরও একটু সতর্ক দৃষ্টি দিন। তাহলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন সমাজে অশ্লীল ফিল্মের উপস্থিতির জন্য সরকারকে জোর একহাত নেওয়ার পরই দোষের একটা ভাগ এবং বড় ভাগটাই চাপিয়ে দিয়েছেন জনগণেরই উপর। সরকারকে গাল পেড়ে একদিকে নিজের প্রতিবাদী ইমেজ তৈরি করেছেন, আর একদিকে 'আমাদের' শব্দটা প্রয়োগ করে 'জনগণের আপনজন' মার্কা ইমেজও তৈরি করেছেন। দুয়ের ফাঁদে পড়ে জনগণ আরও বেশি বিভ্রান্ত হবেনই। মারাদোনার সূক্ষ্ম পায়ের কাজের মতই সমরবাবুর কলমের সূক্ষ্ম কাজে জনগণ টালমাটাল হয়ে যান। সমাজ কাঠামোর প্রয়োজনেই সমরবাবু অশ্লীলতা দূর করতে চান না। আর তাই তিনি একবারের জন্যেও জনগণের কাছে আহ্বান রাখেন না—আসুন এই অশ্লীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা জনমানসে ছড়িয়ে দিতে আন্দোলন গড়ে তুলি। সমরবাবুর মতো বুদ্ধিজীবীরা চান, আন্দোলন গড়ে সমস্যার মূলে না পৌঁছে, জনগণ সমাজের বর্তমান অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে নিজেদের বুকের দিকেই আঙুল তুলে দেখাক। সমরবাবু মানুষের মতস্তত্ত্ব বোঝেন। জানেন—অন্যায়বোধের দ্বারা সংগ্রামী মানুষেরও মন স্তিমিত হয়।

দূরদর্শন এ'ছাড়া আর একটি কাজ করে থাকে, সেটা হলো, যে দল গদিতে বসে, সেই দলকেই দেয় বাড়তি প্রচার। শাসক দলের গোটা, আধা, পোয়া মাপের নেতাদের প্রতিটি ফিতে কাটাকে টি.ভি. স্ক্রিনে হাজির করতে 'জো হুজুর' বলে হাজির থাকে দূরদর্শনের ক্যামেরা।

এ'সবের বহিরাবরণ সরালে আমরা দেখতে পাব, দূরদর্শনের ও বেতারের প্রচারের মূল সুরে রয়েছে শাসকশ্রেণির মতাদর্শগত কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা (এবং যে দলই শাসন ক্ষমতায় আসুক, প্রতিটি শাসকদলের মতাদর্শের 'নিউক্লিয়াস' একই)। শাসকশ্রেণির মতাদর্শ অবধারিতভাবে এই সিস্টেমের মতাদর্শেরই অংশ।

দূরদর্শন আমাদের ট্যাক্সের টাকায় চলে বলেই দূরদর্শনের এমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি প্রবল।

এদেশে 'প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা'

এদেশের প্রতিটি বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র, জনপ্রিয় সাপ্তাহিক, টিভি মিডিয়ার পিছনে মূলধন হিসেবে খাটে কোটি কোটি টাকা। কোটিপতি মিডিয়া মালিকদের কাছে 'মিডিয়া-ব্যবসা' আর পাঁচটা ব্যবসার মতই ব্যবসা। উৎপাদন কর, খদ্দের ধর, বিক্রি কর। আর পাঁচটা ব্যবসার মতই এখানেও—যত বেশি উৎপাদন, যত বেশি বিক্রি, তত বেশি লাভ। অন্যান্য ব্যবসায় বড় ভাবে পুঁজি নিয়োগ করার আগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পপতিরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা চালান। প্রাথমিকভাবে বুঝে নেন মার্কেটের অবস্থা। তারপরে নামেন উৎপাদনে। বৃহৎ মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সম্ভাব্য পুঁজি বিনিয়োগকারী বিশেষজ্ঞ দিয়ে সমীক্ষা চালান। সমীক্ষকরা কয়েক মাসব্যাপী সমীক্ষা চালান নানাভাবে, যার একটা বড় অংশ জনমত যাচাই। তারপর তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে মিডিয়ার চরিত্র কী কী ধরনের হলে সম্ভাব্য পাঠক ও দর্শক কতটা হতে পারে, তার একটা হদিশ দেওয়া হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে পুঁজিপতি ঠিক করেন তার মিডিয়ার চরিত্রের রূপরেখা, ঠিক করেন পলিসি। কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন সম্পাদক থেকে সাংবাদিক, ডিরেক্টর থেকে অ্যাকটর। এঁরা প্রত্যেকেই বুঝে নেন পত্রিকার চরিত্রের রূপরেখা, এই রূপরেখা ভাঙার কোনও স্বাধীনতাই থাকে না সম্পাদক থেকে সাংবাদিক কারও। 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' 'নিউজ চ্যানেলের স্বাধীনতা' বলে শব্দ দুটি আমরা অহরহ শুনে থাকি। শব্দ দুটি নিয়ে ফি-বছর গোটা কয়েক সেমিনার হয় দেশের বড়-মেজ শহরগুলোতে। শব্দটি একটিই মাত্র অর্থ বহন করে আর তা হলো মিডিয়া মালিকের মিডিয়া-চরিত্রকে বজায় রাখার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা নামের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সব মিডিয়া মালিকদের সংগঠিতভাবে আঘাত হানার সম্ভাবনা।

সম্পাদক থেকে সাংবাদিকরা মালিকের কাছে 'মিডিয়া পলিসি' মেনে বলার ও লেখার অলিখিত চুক্তির বিনিময়েই চাকরিতে ঢোকেন। মিডিয়া পলিসিকে অমান্য করার মত ধৃষ্টতা কেউ দেখালে, পরের দিনই তার স্থান হবে মিডিয়া অফিসের পরিবর্তে রাস্তায়।

সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের এই সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্টভাবে না জানা থাকার দরুন এবং পত্রিকা চরিত্র গড়ে ওঠার কাহিনি অজানা থাকার কারণে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটা বিপজ্জনক ধারণা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে—অমুক পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল, তমুক পত্রিকা প্রগতিবাদী। ধারণাটা আগপাশতলা ভুল। সমস্ত বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর ও নিউজ চ্যানেলের মালিকরাই এক একটি ধনকুবের, এবং সবারই মূল চরিত্র একই। সমাজ- কাঠামোকে আঘাত না দিয়ে আমি আপনি যত খুশি লম্ফ-ঝম্ফ দিতে পারি। চাই কী, তার জন্য প্রচারও পেতে পারি।

কিন্তু 'সিস্টেম'কে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করলে ওরা প্রত্যাঘাত হানবে সর্বশক্তি দিয়ে।

আর প্রচার মাধ্যমের সে শক্তি এতই বিশাল যে সাধারণের কল্পনাতীত। জনগণকে প্রভাবিত করার এই বিশাল শক্তিই তাকে দিয়েছে 'সিস্টেম'-এর বনিয়াদের এক গুরুত্বপূর্ণ পিলারের ভূমিকা। কয়েক বছর হল সংবাদপত্রের পাশাপাশি নিউজ চ্যানেল নিয়েও এই ধরনের ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের অকল্পনীয় শক্তির প্রসঙ্গে পরে আসব, আপাতত প্রসঙ্গে ফিরি।

বৃহৎ নিউজ মিডিয়াগুলো তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের খদ্দের ধরতে বহিরঙ্গকে সাজায় নানাভাবে। এদের কেউ সিপিএম-এর প্রতি জনগণের ক্ষুব্ধতাকে পুঁজি করে খদ্দের ধরতে পত্রিকার চরিত্রকে খাড়া করে। কেউ বা সিপিএম-র জনসমর্থনকে পুঁজি করে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে। কেউ বা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে তারই রাজনীতির ইমেজ বা সরকার-বিরোধী ইমেজ তৈরি করে বিক্রি বাড়িয়ে চলে। এইসব মিডিয়ার সম্পাদক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের ফুটবল টিমের কোচ ও খেলোয়াড়দের মতোই—যখন যে দলে খেলবেন, সেই দলকে জয়ী করতেই সচেষ্ট থাকেন। প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা বলে যাকে আপনি গাল পাড়েন, তারই অতিক্ষমতা সম্পন্ন দুঁদে বার্তাসম্পাদক কিংবা ঝানু সাংবাদিক আপনার মনে হওয়া প্রগতিবাদী পত্রিকায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার স্বার্থে কলম থেকে ঝরাতে থাকেন বিপ্লবী আগুন। একই ভাবে বিপরীত ঘটনাও ক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল পত্রিকার বিপ্লবী কলমও টিম পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কলম হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, বরং সাবলীল গতিশীল। এইসব বিপ্লবী, প্রতিবাদী, প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া প্রভৃতি প্রতিটি বাণিজ্যিক মিডিয়ার মালিকদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। একজনকে ধন-সম্পদে আর একজনের টপ্‌কে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে ওরা দারুণ রকম এককাট্টা।

মিডিয়াগুলোর ভানের মুখোশটুকু সরালে দেখতে পাবেন, প্রতিটি মিডিয়াই বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে জনমতকে পরিচালিত করে এবং বহিরঙ্গে এরা সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের কিছু কিছু দুর্নীতির কথা ছেপে সিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার মূল ঝোঁককে আড়াল করে। এমন সব দুর্নীতির কথা 'পাবলিক খায়' বলেই মিডিয়াগুলো প্রচারে আনে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চাবিকাঠি যাদের হাতে, তারা জানে, এমন দু-চারটে দুর্নীতি ধরার লালিপপ্ হাতে ধরিয়ে দিয়ে কী ভাবে অত্যাচারিতের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে হয়। তারা জানে, সিস্টেমের প্রেসার কুকারে নিপীড়িতদের ফুটন্ত ক্ষোভকে বের করে দেওয়ার 'সেফটি ভালভ' হলো মাঝে-মধ্যে দু-চারজনের দুর্নীতি ফাঁস। পরে অবশ্য

দুর্নীতিগ্রস্তকে শাস্তিটাস্তি না দিলেও ক্ষতি নেই। জনগণের স্মৃতি খুবই দুর্বল। ভুলে যাবে প্রতিটি ঘটনা, যেভাবে ভুলেছে বফর্স কেলেংকারি, শেয়ার কেলেংকারি। আর এর ফলে এক-আধটা রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ বা প্রশাসক যদি বধ হয়, তাতেও অবস্থা একটুও পাল্টাবে না। ফাঁকা জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকে না, থাকবে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে।

আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে একটা দৃষ্টান্ত বেছে নিতেই পারি। বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের শেষকৃত্যের সময় শ্মশানে স্বপন নামের জনৈক রাজনৈতিক মস্তানের হাতে লাঞ্ছিত হন মন্ত্রী থেকে যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, বুদ্ধিজীবী থেকে প্রাক্তন সাংসদ পর্যন্ত। পুলিশ স্বপনকে গ্রেপ্তার করল। প্রচার মাধ্যমগুলোর হইচই'তে স্বপন-বিরোধী একটা জনমত সৃষ্টি হল। স্বপনকে রাজনৈতিক নেতারাও বাঁচাতে পারলেন না। স্বপনের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেল। সরকার এমন দৃষ্টান্তমূলক দৃঢ়তা দেখানোয় অনেকে তুষ্ট হলেন। যে-সব রাজনৈতিক ও পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা স্বপনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়ে কৃতার্থ হতেন, তাঁদের নাম প্রকাশ পাওয়ায় পত্রিকার এমন 'মহান' ভূমিকায় অনেকেই উদ্বাহু হলেন, আমন্ত্রণ-গ্রহণকারীদের নামে টি-টি পড়ে গেল।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা এবার একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, কালীঘাট এলাকার মস্তান স্বপন ধ্বংস হলো বটে, কিন্তু কালীঘাট মস্তানমুক্ত হলো না। স্বপনের জায়গা নিল স্বপনের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক মস্তান শ্রীধর।

স্বপন এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও প্রচারমাধ্যমগুলোর সামনে এমন অশালীন তাণ্ডব ও হামলা চালানোয় জনগণের মধ্যে যে তীব্র ক্ষুব্ধতা দেখা দিয়েছিল, সেই ক্ষুব্ধতার আগুনকে প্রশমিত করতেই স্বপনের শাস্তির চুষিকাঠি জনগণের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লাখো স্বপনের স্রষ্টারা থেকে গিয়েছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

স্বপনের মতো হাজারো, লাখো সমাজবিরোধী তো একদিনে গজিয়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক মস্তানির প্রয়োজনেই এদের সৃষ্টি। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা চিরকালই মহৎ। তাই স্বপনের স্রষ্টারা অন্তরালে থাকে এক স্বপন গেলে আর এক স্বপন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। স্বপনদের জায়গা কোনও দিনই ফাঁকা থাকে না। এক যায়, আর এক উঠে আসে।

আরো একটু তলিয়ে দেখুন, স্রষ্টা রাজনীতিকরা শেষ হয়ে গেলে সে জায়গা কখনও ফাঁকা থাকে না। যেমনভাবে স্বপনের সমর্থক রাজনৈতিক দলের জায়গা দখল করেছে স্বপনের বিরোধী রাজনীতিকরা—শ্রীধরকে দিয়ে। ভারতের সর্বকালের সবচেয়ে ক্ষমতাবান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হঠাৎ মৃত্যুর পর রাজীব এলেন। রাজীবও হঠাৎ মারা গেলেন। রাজীব গান্ধীর জায়গা দখল করেছিলেন রাজীবেরই

দলের পিভি নরসিমা। রাজা যায়, রাজা আসে। আসন ফাঁকা থাকে না। আসন ফাঁকা থাকতে দেয় না আমাদের সমাজ কাঠামো, আমাদের 'সিস্টেম'।

এইভাবে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দুর্নীতিগ্রস্তরা আসে এবং বিদায়ও নেয়, কিন্তু দুর্নীতি টিকেই থাকে। এই দুর্নীতির সূত্রেই বাঁধা পড়ে থাকে 'সিস্টেম'কে টিকিয়ে রাখার সহায়ক শক্তিগুলো।

কখনও কখনও বাণিজ্য সাম্রাজ্যের অধিকারীরা রাজনীতিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা রক্ষা ও বর্ধিত করতে পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল উদ্যোগী হয়। এখানেও কিন্তু বাণিজ্য-সম্রাটের পক্ষে মিডিয়ার বাণিজ্যিক সাফল্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। যে পত্রিকা বিক্রি হয় না, যে চ্যানেল লোকে দেখে না তাকে কেন রাজনীতিক পাত্তা দেবে?

যে-সব সাংবাদিক বা মিডিয়াকর্মী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন দুর্নীতির শিকল ভেঙে সুসংস্কৃতির সমাজ গড়তে চান, তাঁদের পক্ষেও কলমকে মগজকে হাতিয়ার করে মিডিয়াকে রণভূমি করা সম্ভব হয় না। কারণ পত্রিকায় ব্যক্তি ইচ্ছে বা ব্যক্তি আবেগের স্থান সীমাবদ্ধ। মিডিয়ার পলিসির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই একজন সাংবাদিককে চলতে হয়। কোনও সাংবাদিকের পক্ষে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততক্ষণই সহযোগিতা করা সম্ভব যতক্ষণ না পেপার পলিসি ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায়।

মিডিয়া পলিসি কাউকে ব্ল্যাক-আউট করতে চাইলে বা কারও বিপক্ষে গেলে তাকে প্রচারে আনা কোনও সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু মিডিয়া মালিক যদি দেখেন কাউকে ব্ল্যাক-আউট করার ফলে অথবা কারও বিপক্ষে লেখার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মুখে, তখন ব্যবসার স্বার্থেই তাঁরা পলিসি পাল্টে ফেলেন, ডিগবাজি খান। এই ডিগবাজি খাওয়াটাও ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি বা সংস্থা পত্রিকা মালিকের অস্তিত্বের পক্ষে চূড়ান্ত সংকট হিসেবে হাজির হচ্ছে।

বাণিজ্যিক টিভি চ্যানেল পত্র-পত্রিকার বাস্তব কাঠামো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, ভুল বোঝার অবকাশ বেশি থাকে। আর এই ভুলই বহু সৎ ও গতিশীল আন্দোলনে ধস্ নামাতে পারে। সত্যিকারের আন্দোলনের পাল থেকে জনসমর্থনের হাওয়া কেড়ে নিতে মেকী আন্দোলনকারী খাড়া করে তথাকথিত প্রগতিশীল নিরপেক্ষ মিডিয়া যখন ময়দানে নামে, তখন ভ্রান্ত ধারণা বহু সমর্থককে, বহু আন্দোলন-কর্মীকে, দূরে সরিয়ে দেয়।

বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম বা পত্র-পত্রিকা যেমন বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ও সংগঠনের নেতৃত্বকে 'মিডিয়া পলিসি'র পক্ষে কাজে লাগায়। নিজস্ব ছাঁচের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ার পক্ষে কাজে লাগায়, তেমনই শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী কেন পারবে না প্রচার-মাধ্যমগুলোকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাতে? কাজে লাগানো সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। সৎ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ও লক্ষ্য সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব চেষ্টা করলে দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করে, প্রচার-মাধ্যম দ্বারা ব্যবহৃত না হয়ে প্রচার-মাধ্যমকেই ব্যবহার করতে পারেন।

যে মিডিয়ার পাঠক ও দর্শক সংখ্যা যত বেশি, জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও তার তত বেশি।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার দিকে একটু সচেতনতার সঙ্গে ফিরে তাকান, দেখতে পাবেন ওই পত্রিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চায়, সমাজের সেরা লেখক, সেরা শিল্পী, সেরা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের পত্রিকায় লেখেন, আঁকেন। এর পর ওরা ইচ্ছে মতন একজনকে প্রচারের তুঙ্গে তুলে নিয়ে যান, একজনকে ব্ল্যাক আউট করে জনগণ থেকে নির্বাসিত করেন। জনপ্রিয় সব পত্রিকাই কম-বেশি একই মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।

আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের দিকে আপনাদের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। "কোনো সমকালীন বিখ্যাত লেখকের নাম মনে করতে পারেন যিনি দেশ শারদীয় সংখ্যায় লেখেননি?" (২৮ আগস্ট ১৯৯০, আনন্দবাজার পত্রিকা)

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গর্বিত ঘোষণা স্পষ্ট—যাঁরা দেশ শারদীয় সংখ্যায় লেখার সুযোগ বা সম্মান পাননি, তাঁরা কেউই প্রকৃত অর্থে লেখকই নন।

জানি না, আনন্দবাজার গোষ্ঠী একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে সাহিত্যের শেষ কথা বলার অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম শুনেছেন কি না—যিনি মননশীল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সাহিত্যিক হিসেবে অগ্রগণ্য। শারদীয় দেশ কি আজ পর্যন্ত অমিয়ভূষণের লেখা ছাপাবার সম্মান ও যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন? বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মন, তপোবিজয় ঘোষ কোনও দিনই আনন্দবাজার

গোষ্ঠীর পত্রিকায় না লিখেও বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদানের জন্য সমঝদার পাঠক-পাঠিকাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। যতদূর মনে পড়ছে মিহির আচার্য, দেবেশ রায়, উদয়ন ঘোষ শারদীয় 'দেশ'-এ কোনদিন লেখেননি। যে কমলকুমার মজুমদারকে আজ আনন্দবাজার গোষ্ঠী নিজেদের 'আপনজন' হিসেবে প্রচার করতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট, সেই কমলকুমারও 'দেশ' শারদীয়ের লেখক ছিলেন না। কিন্তু এই ধরনের গর্বিত বিজ্ঞাপনও সরলমতি পাঠক-পাঠিকাদের মাথা খায়। অবশ্য মাথা খাবার জন্যই এমন বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি। একথা বলার জন্যই আমি উদাহরণগুলো টানলাম যে, 'দেশ'-শারদীয়'তে না লিখেও এঁরা লেখক হিসেবে খ্যাতির অধিকারী।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের কি তবে কোনও স্বাধীনতা নেই? ক্ষমতা নেই? নিশ্চয়ই আছে। ওদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আছে, পেপার পলিসির সঙ্গে সংঘর্ষে না নামা কাউকে প্রচার দেওয়া, বা বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, আইনি অধিকার বা বে-আইনি সুবিধে আদায়ে সহযোগিতা করা, অপছন্দের মানুষ বা সংস্থাকে কিঞ্চিৎ টাইট দেওয়া। এবং স্বভাবতই এই ক্ষমতা একটু বেশি পরিমাণেই থাকে সম্পাদকের ও তাঁর প্রি সাংবাদিকদের। অনেক সময় ওদের কৃপায় অনেক 'না' 'হ্যাঁ' হয়ে যায়, অনে 'মিথ্যে' হয়ে ওঠে 'সত্যি', অনেক জোনাকি মিথ্যে প্রচারের আলোতে নক্ষত্র হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে কিংবদন্তি।

এই বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে একটা দৃষ্টান্ত বেছে নিতেই পারি।

হলদে সাংবাদিকতার অনন্য নজির 'ট্রেন ভ্যানিশ'

আপনারা অনেকেই শুনেছেন জাদুকর পি.সি.সরকার (জুনিয়র)-এর যাত্রী বোঝাই অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশের কথা। জেনেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে, অথবা অন্য কারও মুখ থেকে। ঘটনাটা দেখেছেনও অনেকে, দূরদর্শনের পর্দায়। কিন্তু অল্পজন জেনেছেন, এই ট্রেন ভ্যানিশের প্রচারটা ছিল চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা, ইয়লো-জার্নালিজিমের এক ক্লাসিক প্যাটার্ন।

যাত্রীবোঝাই গোটা একটা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশের সুবাদে সরকার আজ কিংবদন্তি মানুষ। কিন্তু ওই জাদুর খেলায় না ছিল অমৃতসর এক্সপ্রেস, না হয়েছিল ভ্যানিশ। আসলে আদপেই ওটা ম্যাজিক ছিল না। কারণ, ম্যাজিকটা কেউই দেখেননি।

দেখানো হয়নি বলেই দেখেননি। দূরদর্শনে ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে যে গ্রামবাসীদের দেখা গিয়েছিল, তাঁদের বলা হয়েছিল—সিনেমার শ্যুটিং হবে। ওঁরা শ্যুটিং দেখার দর্শক হতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। কারণ, ওঁদের একজনও অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ হতে দেখেননি। অথচ ওঁদের যাত্রী বোঝাই ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে দূরদর্শনের পর্দায় হাজির করা হয়েছিল। কোনও বিশিষ্ট দর্শকও সেদিন প্যাসেঞ্জার ঠাসা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ হতে দেখেননি। দূরদর্শনের পর্দায় যা দেখানো হয়েছিল সেটা ছিল দর্শকদের প্রতারিত করার এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।

এটা জাদুর ক্ষেত্রেও এক ঐতিহাসিক অনৈতিক ঘটনা। যে জাদু কেউ দেখল না, যে জাদু কেউ দেখাল না, সে জাদু দেখানো হয়েছে বলে প্রচার করাটা একটা বড় মাপের সংগঠিত প্রতারণার দৃষ্টান্ত বই কিছু নয়।

এসব শোনার পরও আমার পরিচিত এক সাংবাদিক বলেছিলেন, "জাদুর ব্যাপারটাই তো কৌশল"। বলেছিলাম, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই কৌশল, কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট নীতি আছে। জাদুকর যখন দেখান একটা মানুষ শূন্যে ভাসছে, তখন তা দেখানোর পিছনে যে কৌশলই থাকুক, দর্শকরা কিন্তু তাদের চোখের সামনে দেখতে পায়, একজন শূন্যে ভাসছে। আমরা এই শূন্যে ভাসার দৃশ্য না দেখে কখনই বলব না, জাদুকর আমাদের সামনে একটা মানুষকে শূন্যে ভাসালেন। ট্রেন ভ্যানিশের ঘটনার যে প্রচার হয়েছে, সেখানে কোনও দর্শকই ট্রেন ভ্যানিশ হতেই দেখলেন না, তখন এটাকে শুধু জাদুর নীতি কেন, কোনও নীতিতেই 'দেখানো হয়েছে' বলে প্রচার করা যায় না।"

"আবার দেখুন, দেখা এবং দেখানোরও একটা নীতি আছে। যে খানা জংশনের কাছে তথাকথিত জাদুটি দেখানো হয়েছিল, সেখানকার অবস্থানগত কারণে প্রতিটি ট্রেনই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার কারণে এক সময় দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কেউ কোনও ফেস্টুন দিয়ে আড়াল করে ট্রেনকে চলে যেতে দিলে যদি সেটা ট্রেন ভ্যানিশ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আগামী যে কোনও দিন একই পদ্ধতিতে শিয়ালদা স্টেশনে আপনার চোখের সামনে দশ ঘণ্টায় শ'খানেক ট্রেন ভ্যানিশ করে দেখাতে পারি। আর সে জন্য আমাকে এমন কিছু করতে হবে না, একটা করে ট্রেন ছাড়বে, আপনার দৃষ্টির সামনে মেলে ধরব একটি রুমাল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বাঁক নিয়ে ট্রেনগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে থাকবে, আর আপনি ভ্যানিশ হওয়া ট্রেনের সংখ্যা গুনতে থাকবেন, পরের দিন আপনার কাগজের প্রথম পাতায় খবরটা ছাপাবেন বলে।" সব শুনে সাংবাদিক বন্ধুটি বললেন, "ও এই ব্যাপার! কিন্তু এই করেও তো উনি দিব্যি কিংবদন্তি বনে গেলেন।"

হ্যাঁ কিংবদন্তি বনে গেলেন, সংবাদ মাধ্যমের মিথ্যাচারিতাতেই বনে গেলেন।

আসল ঘটনা কী? আসুন সেদিকে আমরা ফিরে তাকাই।

এই না দেখা, না ঘটা ঘটনার খবর প্রচারিত হল দূরদর্শনে ১২ জুলাই, ১৯৯২। খবরের সঙ্গে দূরদর্শন দেখাল সেই না ঘটা ঘটনার ছবি। পরের দিন একটিমাত্র পত্রিকা 'আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত হলো খবরটি। তারপর সরকার খবর থেকে কিংবদন্তি।

ঘটনাটা খুবই সাদামাটা। সরকার ইস্টার্ন রেলের কাছ থেকে ভাড়া করেছিলেন একটা ইঞ্জিন ও ছ'টা কোচ। ইঞ্জিনটা ডিজেল চালিত, ইঞ্জিনের নম্বর ১/৪০৫। ছ'টা কোচের পাঁচটা সাধারণ, একটা A.C.। ইঞ্জিন এলো আন্দুল লোকোশেড থেকে। ছ'টা কোচ নিয়ে নকল 'অমৃতসর এক্সপ্রেস' এসে দাঁড়াল খানা জংশনের অনতিদূরে, খানা লিংক কেবিনের কাছে। ড্রাইভার ছিলেন অনিলবরণ দত্ত। কোনও গার্ড বা টিকিটচেকার ছিলেন না। দর্শকরা জানতেন, ওই ছ'কোচের ট্রেনটি 'অমৃতসর এক্সপ্রেস' নয়, শ্যুটিং-এর জন্য ভাড়া করা। ট্রেনে যাঁরা যাত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা সরকারের কর্মী ও রেলকর্মী। দর্শকদের বসানো হয়েছিল নিচু খেতে ও তার কাছাকাছি। কোচ নিয়ে ইঞ্জিন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে চার জোড়া লাইন চলে গেছে। চার জোড়ার দু'জোড়া লাইন হঠাৎ গেছে নেমে। এই লাইন দিয়ে ট্রেন একটু এগোলোই উঁচু মাটির আড়ালে চলে যায়।

ওই অনুষ্ঠান দেখতে একটি মাত্র পত্রিকার সাংবাদিক আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন, আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের শংকরলাল ভট্টাচার্য। ভিডিও রেকর্ডিং-এর জন্য উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। ইন্দ্রাণী শংকরলালের জীবনসঙ্গিনীও।

ট্রেন চলার পূর্বমুহূর্তে ট্রেনকে আড়াল করতে তুলে ধরা হলো ব্যানার। দর্শকদের সামনে ব্যানার, কানে জেনারেটরের বিশাল শব্দ। সঙ্গে বাজি-পটকার ঘন-ঘন শব্দ ও ঘন ধোঁয়া। ছবি রেকর্ডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রাণী। ইশারা পেয়ে ইঞ্জিন চালু করলেন অনিলবরণ। নিচে নেমে যাওয়া লাইন ধরে এগোলো তাঁর ট্রেন। রেকর্ডিং-এ ভ্যানিশ ট্রেনের চলার আওয়াজ যাতে ধরা না পড়ে তারই জন্য জেনারেটরটাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। উত্তেজনাহীনভাবে ট্রেনটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই ব্যানার সরিয়ে দেওয়া হলো। শেষ হল 'ট্রেন ভ্যানিশ'-এর খেলা।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ট্রেন ভ্যানিশের নেপথ্য দুর্নীতি জানাতে গিয়ে আমাদের সমিতি-সহ বহু বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় জাদুকরদের অভিজ্ঞতাই খুব তিক্ত। বহু সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাই আমাদের ও জাদুকরদের কাছ থেকে সব কিছু শুনেছেন, জেনেছেন, তথ্যপ্রমাণ নিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবরটির উপর প্রতিবারই নেমে এসেছে ব্ল্যাক-আউটের থাবা। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ

ক্ষমতায় 'যুক্তিবাদী' ও 'কিশোর যুক্তিবাদী' পত্রিকায় ট্রেন ভ্যানিশ নামক শতাব্দীর সেরা সাংস্কৃতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ করেছি। এই জাদুর নামে প্রতারণা বিষয়ে লিখেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট জাদুকর। কলকাতার অতি শ্রদ্ধেয় জাদু সরঞ্জামের নির্মাতা ও পরিবেশক শ্যাম দালাল লিখেছেন একটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জাদু পত্রিকায়। লিখেছেন বিশিষ্ট জাদুকর সুবীর সরকার ও ভারতের অসাধারণ জাদুশিল্পী কে. লাল। কিন্তু এসব লেখা বাংলা ভাষার বৃহৎ পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায়, প্রতারক হিসেবে যাঁর ঘৃণা কুড়োবার কথা, তিনি কুড়িয়েছেন কিংবদন্তির সম্মান।

'সানন্দা' একটি জনপ্রিয় পাক্ষিক। প্রকাশ করেন আনন্দবাজার গ্রুপ। 'সানন্দা'র ৫ আগস্ট ১৯৯৪ সংখ্যায় চিঠিপত্তর বিভাগে ট্রেন-ভ্যানিশের নেপথ্য কাহিনি দু-চার লাইনে লেখার একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার প্রকাশিত চিঠিটার তলায় লেখা ছিল : "চিঠিটির উত্তর দিচ্ছেন পি.সি.সরকার, আগামী সংখ্যায়"। পত্রিকার তরফ থেকে এই ধরনের ঘোষণা, অবশ্যই ব্যতিক্রম।

যাই হোক, ১৯ আগস্ট ১৯৯৪, সংখ্যার সানন্দায় মিঃ সরকারের উত্তর প্রকাশিত হলো। সরকার লিখলেন, "ট্রেন ভ্যানিশের ম্যাজিকটা আমি একটা বিশেষ এবং বিশাল কমিটির সামনে দেখিয়েছিলাম..."

সেই কমিটির এক নম্বর নাম হিসেবে সরকার যাঁর উল্লেখ করেছিলেন, তিনি হলেন কলকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ভি.আই.পিদের তালিকায় ছিলেন, "সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউ. এন. আই. এ-পি'র প্রতিনিধি। ছিলেন আনন্দবাজার গ্রুপ, আজকাল, গণশক্তি, ওভারল্যান্ড পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রতিনিধি। দূরদর্শনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর-সহ ছিলেন দূরদর্শনের সাংবাদিক ক্যামেরাম্যানদের বিরাট টিম তো বটেই... আপামর জনসাধারণকে দেখাবার জন্য দূরদর্শন নিউজ কভার করেছে।" "কুচুটে মনোবৃত্তির লোকেরা যত কুৎসাই রটাক না কেন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ইজ্জত বেড়েছে।"

উত্তর পাঠিয়েছি 'সানন্দা'র দপ্তরে, কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে। পাঠাবার তারিখ : ৮.১০.১৯৯৪। রেজিস্ট্রেশন নম্বর জি-৩৩৪৪। ওরা যে চিঠি পেয়েছেন, তার প্রাপ্তিস্বীকারের কার্ডও পেয়ে গেছি। এই প্রসঙ্গে সানন্দার সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৪ পেরিয়ে এখন ২০০৮ আগস্ট। এখনও পর্যন্ত সানন্দা আমার চিঠিটি প্রকাশ করেননি। মানছি, আমার চিঠি ছাপার বা না ছাপার পূর্ণ স্বাধীনতা সানন্দার আছে। কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে— দেখার দায় সানন্দার নয় চিঠিটিতে লিখেছিলাম :

"কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩ সেপ্টেম্বর '৯৪ প্রকাশ্য সভায় দ্বিধাহীন জানালেন—পি.সি. সরকার (জুনিয়র)-এর

ট্রেন ভ্যানিশের আমি একজন দর্শক ছিলাম। সেদিন অমৃতসর এক্সপ্রেসকে ভ্যানিশ করা হয়নি। একটা ইঞ্জিন ও কয়েকটা কম্পার্টমেন্ট ভাড়া করে আনা হয়েছিল, সেগুলো রেললাইন ধরেই চলে গিয়েছিল। দূরদর্শনের তরফে ছবি তুলেছিলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। পি.সি.সরকার (জুনিয়র) এ বিষয়ে আমাকে মুখ না খুলতে অনুরোধ করেছিলেন।

সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ৮ নম্বর কোর্টে, দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত। সভার শিরোনাম ছিল 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'। ব্যবস্থাপক : হাইকোর্ট লেডিজ ওয়েলফেয়ার কমিটি। সহযোগিতায় হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতি। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। মূল বক্তা প্রবীর ঘোষ। হল উপচে পড়া ভিড়ে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার শ্রী এস. এস. পান্ডে, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার শ্রী মলয় সেনগুপ্ত ও শ্রী পি. কে. সেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার শ্রীনিরোদবরণ হালদার, স্টেট কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীচুনিলাল চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশ্ন-এর জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীসিদ্ধেশ্বর শূর এবং হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

৮ মে ১৯৯৪ বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দাবিসহ দূরদর্শনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন কলকাতা দূরদর্শনের ডিরেক্টর শ্রীঅরুণ বিশ্বাসের কাছে। তাতে দুর্নীতির একটি অভিযোগ ছিল 'ট্রেন ভ্যানিশ' দেখিয়ে কলকাতা দূরদর্শন ১২ জুলাই '৯৪ যে সংবাদ প্রচার করেছিল, সেই ট্রেন আদৌ কোনও কৌশলেই ভ্যানিশ করা হয়নি। গোটাটাই করা হয়েছিল ক্যামেরার কৌশলে। এমন একটি মিথ্যে খবর প্রচার করে একদিকে একজনকে রাতারাতি কিংবদন্তি বানানো হয়েছে। অন্যদিকে কোটি কোটি দর্শককে প্রতারিত করা হয়েছে।

ডিরেক্টর শ্রীবিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রীঅমলেন্দু সিনহার ওপর।

শ্রীসিনহা তদন্ত রিপোর্টে জানান, দূরদর্শন কেন্দ্রের কোনও কর্মী বা টিম জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর অমৃতসর এক্সপ্রেসের ছবি তুলতে যাননি। খবরে যে ছবিটি দেখানো হয়েছিল তা তুলে এনেছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। শ্রীসিনহা আরও জানান, শ্রীমতী ভট্টাচার্য দূরদর্শন কেন্দ্রের কর্মী নন। ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে মাঝে-মধ্যে তিনি খবর পড়ে থাকেন মাত্র।

'অল ইন্ডিয়া ম্যাজিক সোসাইটি'-এর সভাপতি ভারতবর্ষের বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা গ্লোব-ডিটেকটিভ সার্ভিসেসকে দিয়ে এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করান। ওই সংস্থার ডিরেক্টরের স্বাক্ষর-সম্বলিত (রেফারেন্স নং-জি ডি এস/২৫৪০/৯২, তারিখ ১৮/৮/৯২) দীর্ঘ তদন্ত রিপোর্টে দ্বিধাহীনভাবে জানানো হয়েছে :

(১) অমৃতসর এক্সপ্রেস আদৌ ভ্যানিশ করা হয়নি। (২) তথাকথিত ট্রেন ভ্যানিশের জন্য একটি বিশেষ ট্রেন ভাড়া করা হয়েছিল, যার ডিজেল ইঞ্জিন নং-১/৪০৫। ড্রাইভারের নাম অনিলবরণ দত্ত। (৩) গ্রামবাসীদের বলা হয়েছিল সিনেমার শ্যুটিং হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে দেখিয়ে প্রতারিত করা হয়েছে। (৪) ভাড়া করা ট্রেনটি লুপ লাইন দিয়ে তার নিজের মতোই চলে গেছে। (৫) ম্যাজিকের নামে ট্রেন ভ্যানিশের ঘটনাটি ছিল নিছকই একটি ক্যামেরা ট্রিক। (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ ছাড়া আর কোনও পত্রিকা প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সাংবাদিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র দু'জন—একজন আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য এবং অপরজন দূরদর্শনের ক্যাজুয়াল নিউজ রিডার শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য যিনি শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের স্ত্রী। প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে 'গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসেস'-এর তদন্ত রিপোর্টের জেরক্স কপি পাঠালাম। প্রয়োজনে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিতে পারব, আর কোনও পর্ত্রিকাগোষ্ঠীই যায়নি; এবং মাননীয় বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় ও দূরদর্শনের ডিরেক্টর প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছি তাও কাঁটায় কাঁটায় সত্যি।

সানন্দার মতো জনপ্রিয় পত্রিকায় জাদুকর জুনিয়র সরকারের এই চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ায় আমার ও আমাদের সমিতির সম্মান ও মর্যাদা বিশালভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। যতদিন না এই চিঠির মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হচ্ছে, ততদিন এই মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে বয়ে বেড়াতে হবে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের ওপর এই ষড়যন্ত্রমূলক আঘাত ইতিহাস কোনও দিনই ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করবে না 'মিথ' হতে শ্রীসরকারের মিথ্যাচারিতাকে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠি প্রকাশ করুন—অনুরোধ"।

চিঠিটির সঙ্গে গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসেস'-এর তদন্ত সম্পূর্ণ প্রতিলিপিও পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু তারপর? প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার ভাবুন, ১৯৯২-এর ১২ জুলাই কী ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)? সংস্কৃতির জগতে দুর্নীতির ইতিহাস? প্রচার-মাধ্যমের অকুণ্ঠ সহায়তায় ট্রেন ভ্যানিশের নামে প্রতারকের কিংবদন্তি হয়ে ওঠার ইতিহাস? নাকি প্রচার মাধ্যমের হলদে সাংবাদিকতার অনন্য নজির স্থাপনের ইতিহাস?

ভারতের ইজ্জত কেমনভাবে বেড়েছে? হর্ষদ মেহেতা, দাউদ ইব্রাহিমের দুর্নীতির পাশাপাশি আরও একটি নাম উচ্চারিত হওয়ার সুবাদে ইজ্জত বেড়েছে?

আরও একটি প্রবল ক্ষমতা সংবাদ মাধ্যমগুলোর কর্তাব্যক্তিদের আছে। আর তা হলো, কাউকে 'ব্ল্যাক আউট' করার ক্ষমতা। সরকার ও একাধিক প্রচার মাধ্যমের বোঝাপড়ায় যে 'মিথ্যে' 'সত্যি' হয়ে গেল, তাকে 'চিরন্তন সত্যি' করে রাখতে আমাদের প্রতিবাদকে 'ব্ল্যাক-আউট' করা তো একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমাদের সমিতি যে কতবার এমন অনৈতিক ক্ষমতার শিকার হয়েছে এবং হয়েই চলেছে, তার পুরো হিসেব দিতে গেলে আরও একটি বই হয়ে যাবে।

সংবাদমাধ্যমগুলো বাস্তবিকই পারে 'জোনাকি'কে 'নক্ষত্র' বানাতে, সত্যের সূর্য ঢাকতে পারে 'ব্ল্যাক-আউট'-এর মেঘে

এই দুই ক্ষমতাই 'নামী' হতে চাওয়া, 'জনপ্রিয়' হতে চাওয়া, 'দামি' হতে চাওয়া 'পুরস্কৃত' হতে চাওয়া, 'সম্মানিত' হতে চাওয়া বুদ্ধিজীবীদের (যাদের মধে সাধারণভাবে ফেলা হয় সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীতশিল্পী, চিত্রকর, ভাস্কর, নৃত্যশিল্পী, শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্র পরিচালক-সহ অধুনা ক্রীড়াবিদদের পর্যন্ত) সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসে। 'নামী', 'দামি' হওয়ার একটা পর্যায় অতিক্রম করে আরও 'নামী' 'দামি' হতে গেলে সাধারণভাবে সংবাদ মাধ্যমগুলোর সঙ্গে আপস করা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বুদ্ধিজীবীদের এই আপসকামিতাকে, কৃপাপ্রার্থী মানসিকতাকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগায় প্রচার মাধ্যমগুলোর নিয়ন্ত্রক শক্তি ধনকুবের পুঁজিপতিরাই।

চার : বুদ্ধিজীবী

আমাদের সমাজের জীবনধারাই এই রকম—'নামী' হওয়ার একটা পর্যায় অতিক্রম করে আরও নাম কিনতে সাধারণভাবে বিভিন্ন স্পনসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপস করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এইসব স্পনসরদানকারী প্রতিষ্ঠান বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্যকে পিষে মেরে নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে চায়।

আমরা কী ধরনের গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা পড়ব, তা ব্যাপকভাবে নির্ধারিত করে দিচ্ছে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রকাশকরা। আমরা টেলিভিশনে কতটা মারদাঙ্গা দেখব, কতটা যৌনতা, কতটা ভক্তিরসে আপ্লুত হবো, ধর্মগুরুদের বাণীর দ্বারা কতটা আচ্ছন্ন হবো, আদর্শ নারীর গুণ হিসেবে পতিসেবা, পতির পরিবারের সেবা, লজ্জা ইত্যাদি নীতিবোধকে কতটা আমাদের মগজে ঠাসব—এ সবই ঠিক

করে দিচ্ছে বিভিন্ন ধনকুবের স্পনসররা ও রাষ্ট্রশক্তি। পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর প্রচার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তুর প্রতি ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। পোশাক-আশাক পাল্টে যাচ্ছে। আসছে বারমুড়া, শট্গান, ওয়াশ-জিন। চিঁড়ে-মুড়িকে বিদায় নিতে হচ্ছে 'কর্নফ্লেক্স', 'ফানমাঞ্চ', 'বিনিজ মাঙ্গতা'র স্বপ্নময় স্লোগানের ঠেলায়। পিপাসার্তকে জলের পরিবর্তে 'থামস-আপ', 'পেপসি', 'সেভেন-আপ', 'কোকাকোলা' ইত্যাদি পানে প্রলোভিত করছে বিজ্ঞাপনের স্বপ্ন-সুন্দরী ও সুঠাম সুন্দররা। কোন ধরনের সিনেমা দেখব, তা নির্ণয় করে কোটিপতি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সেন্সর-ক্ষমতার অধিকারী সরকার। এ-সবের দ্বারাই তো আমাদের রুচি, চাহিদা, চেতনা, মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়, গড়ে ওঠে জীবনধারা।

বুদ্ধিজীবীরা আজ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, শুধু প্রতিভা জনপ্রিয়তা আনতে পারে না। বসায় না সম্মানের সিংহাসনে। এর জন্য চাই প্রচার-মাধ্যমগুলোর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও শাসকদলের স্নেহ (যাতে বেসরকারি ও সরকারি পুরস্কার-টুরস্কার পাওয়া যায়)। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রচার-মাধ্যম ও তারপরই স্পনসর হিসেবে উল্লেখযোগ্য দুই শক্তি—শাসক ও ধনকুবের গোষ্ঠীর সম্পর্ক পরস্পরের স্বার্থেই সব সময় দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে সুন্দর। পত্র-পত্রিকাগুলোয় চোখ বোলালেই দেখতে পাবেন, 'গল্পপাঠের আসর; 'কবিতাপাঠের আসর', 'আবৃত্তির আসর', 'গানের আসর', 'নাচের আসর', 'নাটক' সবের বিজ্ঞাপনের তলাতেই 'সৌজন্যে' লিখে জ্বলজ্বল করে স্পনসরকারী সংস্থার নাম।

বুদ্ধিজীবীরা বর্তমান সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর কাছ থেকে নেন সরকারি জমি, সরকারি ফ্ল্যাট, সরকারি পুরস্কার, বিদেশে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ, পত্র-পত্রিকা বেতার-দূরদর্শনে প্রচার, বে-সরকারি নানা পুরস্কার ও একটা 'বাজার' যা তাদের দেয় অর্থ (অন্যান্য শাখার বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায় একই ব্যাপার)। বিনিময়ে বুদ্ধিজীবীরা তেমনই সিনেমা বানান, নাটক লেখেন, গল্প-কবিতা-উপন্যাসকে চিত্রিত করেন ইত্যাদি, যেমনটা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ধনকুবেররা চান। এই ধনকুবেররা চান, এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ও সবল করতে প্রয়োজনীয় একটি সাংস্কৃতিক বাতাবরণ। এই বাতাবরণ প্রধানত ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদ-নির্ভর।

পুরস্কার কি প্রতিভার স্বীকৃতি?

পুরস্কার দেওয়া ও পাওয়া নিয়ে একটা মজাদার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা আমাকে বলেছিলেন কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু। এই ঘটনাটাই বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'ড্যাফোডিল'-এর পাতায় প্রকাশ করেছিলেন সম্পাদক ওয়াহিদ রেজা, জানুয়ারি, ১৯৯১ সংখ্যায়।

সমরেশ বসু'র নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে 'ড্যাফোডিল' পত্রিকার তরফ থেকে কবি বাপী সমাদ্দার প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, সাম্প্রতিক পুরস্কারের বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন না—এই, দাতা ও গ্রহীতাদের কথা, অন্দরমহলের কেষ্টবিষ্টুদের কথা।"

সমরেশ বসু : ভাই দেখ, এই পুরস্কারের ব্যাপারটা আমাকে প্রশ্ন করে তোমরা আমাকে একটু বিপদে ফেলেছ, এই কারণে যে, পুরস্কার সম্পর্কে আমার নিজের কোনো—আমি পুরস্কার পেয়েছি, পাইনি তা নয়। কিন্তু একটি বিশেষ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার পেয়েছি। সেইজন্য, আমার নামে দুর্নামও আছে আমি বোধহয় সেই সংস্থার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে সেইজন্য তারা বুঝি আমাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। তারা যে-বছর প্রথম, আমি আনন্দবাজার পত্রিকার কথাই বলছি, তারা যে-বছর প্রথম পুরস্কার দিলেন, সেই বছর আমি-ই প্রথম পুরস্কার পাই আমি এবং বিভূতি মুখোপাধ্যায়। সেটি আমি পেয়েছিলাম 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য।

আমি জানি না এর মধ্যে কোথায় কি অপরাধ—কি অন্যায় লুকিয়ে আছে—

যাই হোক, তবে পুরস্কার ব্যাপারটা আমার কাছে স্বচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে তোমাদের একটা মজার গল্প বলি তাহলে বোধহয় আমাকে আর জবাব দিতে হবে না। তাহলে খুব, আমি নিজের দিক থেকে বেঁচে যাই। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মদিন, এখানে আমাদের নৈহাটিতে, কাঁঠালপাড়ায়, রেললাইনের ওপারে তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এসেছিলেন—তিনজনই এখন মৃত। এসেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এসেছিলেন বনফুল—এসেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম বক্তা ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন সদ্য রাশিয়া প্রত্যাগত এবং তোমরা বোধহয় জানো ওঁর কথাবার্তার মধ্যে বরাবরই বীরভূমি টান ছিল। উনি বীরভূমের লোক। ওঁর বলবার মধ্যে একটা ভীষণ ফোর্স কাজ করত। যখন বলতেন সে কথাটাকে খুব জোর দিয়ে বলতেন—উনি প্রথমে বললেন : আজকে এখানে এসে প্রথমেই আমার বলতে ইচ্ছে করছে যে, আমি যে-দেশে গেসলাম আমি সেই দেশে দেখে এলাম যে সে দেশে সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান দেওয়া হয়। আমি সোভিয়েট রাশিয়ার কথা বলতেসি। আমি বলছি সেখানে সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের সেই সম্মান দেওয়া হয় না। তারপরে তিনি আরও কিছু কিছু কথা বললেন।

ইতিপূর্বে কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভারতে মোটামুটি যতগুলো, মানে, রিজিওন্যাল পুরস্কার পাওয়া উচিত সাহিত্যিকদের তার সবগুলোই পেয়েছেন, কিন্তু বনফুল কোনোটাই পাননি। এর পরবর্তী বক্তাই বনফুল এবং বনফুলের একটা ব্যাপার ছিল, তিনি, মানে, এমনিতে তৈরি করে হঠাৎ বক্তৃতা

করতে পারতেন না। তিনি বক্তৃতা লিখে আনতেন সবসময়। তিনি উঠলেন, উঠে বললেন, যে আমি তো এমনিতে বক্তৃতা করতে পারি না, সেইজন্য আমি আমার বক্তব্য লিখে এনেছি। কিন্তু আমার পূর্ববর্তী বক্তা যা বলে গেলেন, তাঁর কথার জবাবে আমি একটি কথা বলে পরে আমি আমার বক্তৃতাটি পাঠ করছি আপনাদের সামনে। তিনি বিদেশে গেছলেন এবং সেখানে তিনি দেখে এসেছেন সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান দেওয়া হয় এবং আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের সেই রাজার সম্মান দেওয়া হয় না, কথাটা হয়তো খুবই ঠিক, খুবই সত্য। কিন্তু যে দেশের সাহিত্যিক পুরস্কারের জন্য মন্ত্রীর কাছে ছুটে যায়, যে-দেশের সাহিত্যিক পুরস্কারের উমেদারি করবার জন্য দিল্লিতে গিয়ে মন্ত্রীর বাড়িতে ঘনঘন যাতায়াত করে, মন্ত্রীর বন্ধুত্ব এবং মন্ত্রীর সেবা করতে চায়, সেই সাহিত্যিকদেরও কি রাজসম্মান দিতে হবে? আমার এটাই একমাত্র জিজ্ঞাসা।

আরও মজার কথা হলো তারাশঙ্করবাবু বক্তৃতার পর ভেতর ঘরে গিয়ে চা খাচ্ছিলেন—আমাদের নৈহাটিরই এক বন্ধু, অধ্যাপক বন্ধু, কবি বন্ধু, প্রাবন্ধিক বন্ধু, তিনি বললেন আপনি কি শুনেছেন আপনার সম্পর্কে বনফুল কী বললেন? আপনার বক্তৃতার পরে বললেন কী, এখনকার সাহিত্যিকদের রাজার সম্মান জানানো হবে কেন? সাহিত্য পুরস্কারের জন্য উমেদাগিরি করে বেড়ালে সম্মান জোটে না।

তারাশঙ্করের গাড়িতে বনফুল এসেছিলেন। বনফুলের গাড়ি ছিল না। তারাশঙ্করবাবু অত্যন্ত রেগে উঠে বললেন, ও! ও এই কথা বলেছে! ঠিক আছে, আমি চললাম আমার গাড়ি নিয়ে, আমার সঙ্গে ওকে যেতে হবে না।

তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, পুরস্কার ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা আমার জবানী নয়, তোমরা বড় দুই দিকপাল সাহিত্যিকের জবানী থেকেই শুনতে পেলে যে পুরস্কার ব্যাপারটা কী। অতএব আমি আর এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছি না।

এই ট্র্যাডিশন আজও বহমান সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই। সরকারি পুরস্কারের ব্যাপারে একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা শোনাই। তখন ১৯৯৩-এর 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' ঘোষিত হয়েছে। সংকর্ষণ রায়ের সঙ্গে খোলা-মেলা আড্ডা দিতে গিয়ে দেখলাম, আড্ডা তেমন জমছে না। বার বার কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছেন, বার বারই আড্ডার রেশ যাচ্ছে কেটে। সংকর্ষণ রায় এক সময় সম্ভবত অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে কিছুটা হালকা হতে বললেন, তিনি এবার রবীন্দ্র পুরস্কার বিচারক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সেখানে ঘটে যাওয়া অন্যায়কে ঠিক মত মেনে নিতে পারছেন না বলেই ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছেন। বিচারক-মণ্ডলীর বেশির ভাগ সদস্যই যদিও একটি বইকে সেরা মনে করে পুরস্কার দেওয়ার পক্ষে মত

প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সে মতামত বাতিল করে দিল মাত্র দু'জনের মতামত। দুজন সদস্যই নাকি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাবান মানুষ। তাঁরা নাকি মত দিয়েছিলেন—বইটির লেখক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরোধী, অতএব ওঁকে পুরস্কার দেওয়া চলবে না। তাঁদের গোঁ-এর কাছে বহুর মতামত বাতিল হয়ে গেল। বিচারক মণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেকেই সরকারি বড় বড় পদাধিকারী। ওইসব পদে থেকে সরকার পক্ষের মতামতের বিরোধিতা করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই প্রত্যেককে দুয়ের মতের পক্ষে স্বাক্ষর দিতে হল—'সর্বসম্মতভাবে আমরা নির্বাচিত করছি' বলে।

দুই ক্ষমতাবান বিচারক, যাঁরা নাকি বহুর মতকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, পাল্টে দিতে বাধ্য করতে পারেন, তাঁদের নামও সংকর্ষণ রায় জানালেন। দুজনই আমার কম-বেশি পরিচিত। একজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিভাগের ডিরেক্টর অপরজন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার। আর, বইটির নাম, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ২য় খণ্ড।

এই খবরটা আমার কাছে আকস্মিক বা অভাবনীয় ছিল না। খবরের আগাম আভাস আগেই পেয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক. প্রাক্তন উপাচার্য দিন কয়েক আগে আমাকে ফোনে বলেছিলেন, আমার পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবে এ বিষয়ে ওই ডিরেক্টরের সঙ্গে যেন কথা বলে বুঝিয়ে দিই যে, আমি সরকার বিরোধী নই। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—সিস্টেমের সোনার শিকল পছন্দ হয়েছে, ডিরেক্টরকে জানানো। ফোন করিনি। তাইতেই...কিন্তু আমি তো দুই বিচারকের পার্টির বিরোধী নই? (কোনও পার্টির কোনও ভাল কাজেরই বিরোধী নই) আমি দুর্নীতির বিরোধী।

এই জাতীয় উদাহরণ কিন্তু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এবং এই উদাহরণ দুটি আমাদের সমাজ কাঠামোয় পুরস্কারদাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যেকার একটা আপস-সম্পর্কের বহমান ধারাবাহিকতারই দৃষ্টান্ত মাত্র। যাঁরা পুরস্কার পান, তাঁরা নিশ্চয় সাধারণের চেয়ে প্রতিভাবান, তা কমই হোক, কি বেশি। কিন্তু প্রতিভাই এদেশে পুরস্কার পাওয়ার একমাত্র মানদণ্ড নয়। সঙ্গে চাই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কিঞ্চিত দেওয়া-নেওয়া, গাঁ শোঁকাশুঁকি, পিঠ চাপড়া-চাপড়ি, আপস ইত্যাদি জাতীয় সম্পর্ক। যা প্রকারান্তরে দুর্নীতি। কখনও কখনও এই দুর্নীতি বিশাল হয়েও ওঠে।

বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা

লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে কতটা স্বাধীন? এ প্রসঙ্গে সমরেশ বসু'র একটি উক্তি হাজির করছি : "আমি আমার নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করছি এবং সেখানে আমি আমার স্বাধীনতাকে প্রতিফলিত করছি। সেটা কবিতা

হতে পারে, সাহিত্যে গদ্য হতে পারে, ছবি হতে পারে, গান হতে পারে— যে কোনোদিকে তুমি তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারো। সুতরাং আমি আগেই বলেছি, তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার স্বাধীনতা যে আদৌ আমার আছে, তা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে আছে সংসারের (সমাজের) এমন সমস্ত ব্যক্তি, এমন সমস্ত সংস্থা, যে হয়তো আমার পক্ষে স্বাধীনভাবে সব কথা বলা, তাদের সম্পর্কে, সম্ভব হবে না।" ('ড্যাফোডিল' সাহিত্য পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সমরেশ বসুর ওই সাক্ষাৎকারটির একটি অংশ)।

এই প্রসঙ্গে সমরেশ বসু উদাহরণও টেনে এনেছেন। শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ও "সাহিত্য নিয়ে যারা মনোপলি বিজনেস করে, আজকে আমাদের ভারতে,

এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই কথা নয়, এটা সারা ভারতেরই কথা, যে কোনো সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকই কোনো-না-কোনো ভাবে বিগ বুর্জোয়া মনোপলি বিজনেস সাহিত্যের সঙ্গে আঁতাত করেন...

১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে দেশ পত্রিকায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামে বিভিন্ন লেখকদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারেই সেই প্রসঙ্গে টেনে এনে সমরেশ বসু আমাদের শুনিয়েছেন, সেখানে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের বন্ধু হিসেবে বুক ঠুকে প্রচার করা সাহিত্যিকদের ডিগবাজি খেয়ে উল্টো গাওয়ার গল্পো। সেখানে 'বিগ প্রেস'-এর সঙ্গে আঁতাত করতে এগিয়ে এসেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়...। সেদিন সমরেশ বসু আমন্ত্রণ পেয়েও লেখেননি, ভারতের তৎকালীন রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না বলেই লেখেননি।

বুদ্ধিজীবীদের ডিগবাজি খাওয়ার ব্যাপক এক প্রবণতা দেখা গিয়েছিল ১৯৬২-তে চিন ভারত-যুদ্ধের সময়। চিনের বিরুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করল রাষ্ট্রশক্তি। সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাল জাত্যাভিমানের ঝড় তুলতে। আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট ঘেঁষা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'দেশপ্রেমিক' প্রমাণ করে অনুকূল স্রোতে গা ভাসাতে। গণনাট্যের লড়াকু লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী গানের কথা পাল্টে ফেলে রাতারাতি নেমে পড়লেন দেশপ্রেমের জোয়ার আনতে। ভূপেন হাজারিকা তাঁর 'ভারত সীমানায়' গানের কথাই পাল্টে দিয়ে কমিউনিস্ট অপবাদ কাটিয়ে 'দেশপ্রেমিক' হয়ে গেলেন। গানের কথা ছিল, "চীনের জনতার জয়ধ্বনি শুনি"। এ-জায়গায় তিনি নতুন করে কথা বসালেন, "গাঁয়ের সীমানায় নিশীথ রাত্রির পদধ্বনি শুনি।" গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট সংগঠক অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস চিন-বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করলেন—পাছে পুলিশ তাঁকে চিনপন্থী বলে ঝামেলা করে। ডিগবাজি খাওয়ার ব্যাপারে কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কমিউনিস্টদরদী

রায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেউই পিছিয়ে রইলেন না। গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গের ভাপতি নাট্যকার দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সীমান্তের ডাক' নামে চিন-বিরোধী একটা াটকই রচনা করে ফেললেন। এমন ডিগবাজিকারদের সংখ্যা এতই বিপুল যে তাঁদের নামের ফিরিস্তি দিয়েই একটা গোটা বই লিখে ফেলা যায়। তবে এ-কথা বাস্তব সত্য যে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বড় অংশই ডিগবাজির খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। এমন এক হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়ার আত্মবিক্রির মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘের নাটক-গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নতুন সংস্কৃতি গড়ার আংশিক চেষ্টাটুকুও বিশাল ধাক্কা খেয়েছিল। অসাম্যের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার শুরুতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় নামা পুরোহিত সম্প্রদায় রাজশক্তির সঙ্গে আঁতাতের যে সূচনা করেছিল, এযুগের বহু বুদ্ধিজীবী সেই 'ট্র্যাডিশন' আজও বজায় রেখে চলেছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখলাম, বাবরি মসজিদ ভাঙার পর সরকারকে মদত দিতে প্রায় তামাম বুদ্ধিজীবীই ভাঙা কাঁসির মত বাজিয়ে চলেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের 'মহান বাণী', যা অবশ্যই আমাদের দেশের সংবিধানের বিরোধিতারই নামান্তর। কারণ, ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) শব্দের অর্থ করা হয়েছে—ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত থাকবে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোনও ভাবেই কোনও ধর্মের পক্ষেই নয়। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ

(১) ভারতীয় সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত থাকবে নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ধর্মীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকবে। সংবিধানকে মর্যাদা দিতে সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ :

(ক) রাষ্ট্রীয় সমস্ত রকম কার্যকলাপে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

(খ) শিক্ষায়তনগুলোতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রার্থনা, ও পঠন-পাঠনে ধর্মীয় নেতাদের জীবনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনা বৃদ্ধিকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(২) ধর্মীয় কার্যকলাপে রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৩) যে রাজনৈতিক দলের নেতা ধর্মীয় কার্যকলাপে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন অথবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, সেই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে, নতুবা গোটা দলকেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(৪) সরকারি প্রচার-মাধ্যমে ধর্মীয়-প্রচারকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৫) কোনও আবেদনপত্রে আবেদনকারীর ধর্ম জানতে চাওয়া চলবে না। কোনও রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকলে বা

সাম্প্রদায়িকতাকে পালন করার কাজে বা উসকে দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকলে সংবিধানের ১৯৮৯ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল (আমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টের ২৯(এ) ধারা বলে সেই রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজ করার বিধান আছে।

উপরোক্ত ধারা মতে, দেশের সংবিধানে যে মৌলিক নীতিগুলি আছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সেই মৌলিক নীতিগুলির প্রতি লিখিতভাবে আস্থাজ্ঞাপন করতে হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে। কোনও ক্ষেত্রে কোনও দল এই নীতিগুলি অমান্য করলে নির্বাচন কমিশন ২৯ (এ) ধারা বলে সেই রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিতে পারে।

বুদ্ধিজীবীরা কেন নেমেছিলেন আমাদের সংবিধানে দেওয়া 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ব্যাখ্যাকে পাল্টে দেওয়ার কাজে? কারণ শাসক ও শোষকরা তেমনটাই চেয়েছিলেন। দেশবাসীকে নানা ধর্মের নামে নানাভাবে বিভক্ত করার স্বার্থেই চেয়েছিলেন। নির্বাচনে ধর্মকে নিয়ে দাবা খেলার স্বার্থেই চেয়েছিলেন ধর্মীয় বিভাজন থাকুক।

গত কয়েক বছরে 'দেশ' পত্রিকাটির দিকে লক্ষ্য রাখলেই দেখবেন, 'ধর্ম' নিয়ে কতই না লেখা অফুরন্তধারায় প্রকাশিত হয়েই চলেছে। ধর্মের অমানবিক দিকগুলো যত বেশি বেশি করে আমরা, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীরা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছি, এবং ধর্ম ও ধর্মীয় নেতারা যখন সাধারণ মানুষদের কাছে প্রশ্নাতীত আনুগত্যের আসন থেকে চ্যুত হচ্ছে, তখন 'অশনি-সংকেত' দেখতে পেয়েছে সিস্টেমের মধুপানে পুষ্ট শোষক-শাসক প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা। বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত 'দেশ' পত্রিকাই অবস্থা ফেরবার মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। কাজে লাগিয়েছে অম্লান দত্ত'দের মত সিস্টেমের নির্ভরযোগ্য কুশলী কলমগুলোকে, যাঁরা ধর্ম ও যুক্তির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা লেখেন। এই সমাজ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করতেই লেখেন।

মগজবেচা বুদ্ধিজীবী

অসাম্যের সমাজ কাঠামোর সহায়ক শক্তিগুলো নানাভাবে তাদের স্বার্থের উপযোগী একটা সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করেই চলে, বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায়। এমন চেষ্টার মধ্যে রয়েছে নানা কূট-কৌশল, অনেক খুঁটি-নাটি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপার। বুদ্ধিজীবীরা একদিকে এইসব পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন পরামর্শদাতা হিসেবে, আর এক দিকে পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার কাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এই 'নির্দিষ্ট ভূমিকা'র মধ্যে সিংহভাগ জুড়ে থাকে তাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদকে নানাভাবে জনগণের কাছে হাজির করা ও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

শুধু 'ফরোয়ার্ড'-এর শক্তির উপর নির্ভর করে যেমন ফুটবল কি হকি খেলা জেতা যায় না, তার জন্য প্রতিপক্ষের আক্রমণের সামাল দিতে শক্তিশালী

'ডিফেন্স'-এরও প্রয়োজন; ঠিক একইভাবে দুর্নীতির এই সমাজ-কাঠামোর উপর আছড়ে পড়া হামলা রুখতে প্রয়োজন হয় শক্তিশালী একটি ডিফেন্স লাইনের। এই ডিফেন্স লাইন হিসেবে দুটি পদ্ধতি বর্তমান সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক শক্তির কাছে খুবই জনপ্রিয়। এক : যে সংস্থা বা সংগঠন এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে আঘাত করছে, সেই সংস্থার আদলে বহিরঙ্গকে সাজিয়ে কিছু সংস্থা তৈরি করে মেকি আন্দোলন গড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও সমাজ-কাঠামো বিরোধী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া। অথবা সমাজ-কাঠামো বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত সংস্থাগুলোর নেতৃত্বকে লোভ বা ভয় দেখিয়ে কিনে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে তাদের কাজে লাগানো। দুই : 'প্রগতিশীল', 'বিপ্লবী', 'প্রতিবাদী' ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কিনে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে সমাজ কাঠামো বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করানো। এগুলো পুরানো, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকর কৌশল। উদাহরণ হিসেবে এখানে শুধু একটি ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এককালের যুক্তিবাদের চরম সমর্থক আজিজুল হককে আমরা দেখেছি। তাঁর অনেক বক্তব্য যুক্তিবাদের সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি একথাও সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন, যুক্তিবাদী সমিতিই সেই মিছরি তৈরির প্রথম দানাটি, যাকে ঘিরে সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মানুষ এক হবেন।

তারপর সময় গড়িয়েছে। রাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতার রোদে তিনি লাল থেকে গোলাপি হয়েছেন। এবং কৃতজ্ঞতা শোধ করতে তিনি কলম ধরেছেন। এবং তাঁর কলম থেকেই বেরিয়ে এসেছে, "যুক্তির একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিমে ডোবে, এটা যুক্তিবাদ, যে-কেউ মেনে নেবে, কিন্তু এটা তো সত্য নয়। সূর্য ওঠেও না, ডোবেও না, আসল সত্য হল এটাই। সুতরাং 'যুক্তিবাদী' আর 'সত্যবাদী' এক ব্যক্তি নন। যুক্তিবাদ শেষ বিচারে টুপি-পরানোর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ।" [উবুদশ, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪]

আজিজুল সাহেব, আপনি যখন বলেন, "সূর্য ওঠে না, ডোবেও না, আসল সত্য হল এটাই", তখন একথা মানুষের কাছে গ্রহণীয় করতে আপনি যুক্তিরই আশ্রয় নেন। সেই সঙ্গে এও জানি যাঁরা আত্মার অমরত্বের সমর্থনে বলেন, তাঁরাও যুক্তিরই আশ্রয় নেন, এবং উভয় ক্ষেত্রেই দু'জনের যুক্তিতেই থাকে যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর। যার জন্য এগুলো শেষ বিচারে কু'যুক্তি হিসেবেই শেষ হয়ে যায়।

মাননীয় আজিজুল সাহেব, পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষদের চোখে সূর্যের 'ওঠা' ও 'ডোবা', দুই-ই বাস্তব সত্য। সূর্যের এই 'ওঠা' ও 'ডোবা' পৃথিবী যে নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে লাট্টুর মত ঘুরে চলেছে, তারই ফল। আপনি এমন সহজ যুক্তিটা বুঝলেন না কেন, মাননীয় আজিজুল সাহেব? জ্ঞানের খামতির কারণে? কিন্তু আপনি তো যথেষ্ট শিক্ষিত বলেই জানি। অতএব, স্কুলের থ্রি-ফোর-এর জ্ঞানটুকু আপনার নেই, মেনে নেওয়া মুশকিল। তবে কি রাষ্ট্রশক্তির

সঙ্গে সমঝোতাই আপনার এজাতীয় পাগলামোর কারণ? আর এই শেষ সম্ভাবনাটারই সত্যি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সবচেয়ে প্রবল? কারণ, আপনি লেখাটিতে 'যুক্তিবাদী সমিতি'র বিরোধিতা না করে গোটা 'যুক্তিবাদ'-এর চূড়ান্ত বিরোধিতায় নেমেছেন। দুঃখ হয়, সত্যিই দুঃখ হয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারাই পারেন বুদ্ধিজীবীদের টিনের তলোয়ার নিয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে 'ঝন্-ঝনা-ঝন্' নাটুকে লড়াইকে বন্ধ করতে, অথবা তাঁদের কথায় ও কাজে এক হতে বাধ্য করে বাস্তবিকই লড়াইতে নামাতে।

অধ্যায় : তিন

নিরপেক্ষতা'র মোড়কে

ধনকুবেরের দল চায়, বঞ্চিত মানুষরা যেন বঞ্চনার কারণ হিসেবে বঞ্চনাকারী ধনিক শ্রেণিকে দায়ী না করে দায়ী করে নিজেদেরই ভাগ্যকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে। বঞ্চনাকারীরা, জানে, দেশের বঞ্চিত, মানুষ তাঁদের বঞ্চনার প্রকৃত কারণ হিসেবে ধনকুবের গোষ্ঠীর দুর্নীতি ও শোষণকে চিহ্নিত করলে পরবর্তী পর্যায়ে পায়ের নিচের মানুষগুলোই ধনিকগোষ্টির পায়ের তলার জমি কেড়ে নেবেই। শোষকরা এও জানে, শোষিতদের ঘুম ভাঙলে, তারা শোষণের কারণগুলোকে উৎপাটিত করতে লড়াইতে নামলে সে লড়াই জেতার মত পুলিশ ও সেনা তাদের হাতে নেই। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি বিক্ষুব্ধ হলে, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পথে পা বাড়ালে পৃথিবীর কোনও শক্তিশালী সেনা বাহিনীরও সাধ্য নেই, সে লড়াই জেতার। ইতিহাস বারবার এই সত্য আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। এই সত্যই সমাজের অর্থনৈতিক নীতি ও আর্থিক কাঠামোর নিয়ন্তা ধনিকগোষ্ঠীর কাছে এবং তাদের প্রতিনিধি শাসক শ্রেণির কাছে মগজ ধোলাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তুলেছে। আর তারই ফলস্বরূপ প্রচার মাধ্যমগুলোর সংবাদ সরবরাহের 'নিরপেক্ষ' মোড়কের আড়ালে থাকে শোষকশ্রেণির ও সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেবার প্রচেষ্টা।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে নানা রঙে, নানা ঢঙে, বিভিন্ন বৈচিত্র্যে তাদের বহিরঙ্গকে সাজালেও, মূলগত ভাবে এরা প্রত্যেকেই বর্তমান অসাম্যের সমাজ কাঠামোর স্থিতাবস্থার দিকেই ঝুঁকে থাকে।

অসাম্যের সমাজ কাঠামো পাল্টে সাম্যের সমাজ কাঠামো তৈরির পক্ষে মূল্যবোধ ও মতাদর্শ প্রচারের জন্য বৃহৎ প্রচারমাধ্যম উদ্যোগী হলে সেই মিডিয়াকে কোণঠাসা করে লাটে তুলে দেবে এই সমাজ ব্যবস্থাই। আমরা তো দেখেছি, ইন্দিরা

গান্ধীর জমানার বিরুদ্ধে সমালোচনার জন্য কলকাতার বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর মালিকের বাড়িতে এ'বেলা-ও'বেলা, পুলিশ, কাস্টমস, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরদের 'রেড'। আমরা দেখেছি ইন্দিরার আমলে গৌরকিশোর ঘোষের মত স্পষ্টবক্তা, নীতিবোধ সম্পন্ন সাংবাদিকদের নানা অজুহাতে কারাগারে নিক্ষেপ। আমরা দেখেছি, নিউজপ্রিন্টের কোটা ও সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া ও না দেওয়ার চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা। এ'সব তো এক শাসকের বিরোধিতা করার ফল, গোটা সমাজ কাঠামোর বিরোধিতার ফল অবশ্যই এর চেয়ে বহুগুণ ব্যাপক। কারণ তখন আপনার শত্রু শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নেতা নয়, শত্রু সমগ্র ধনী সম্প্রদায়, বর্তমান সমাজ কাঠামোর ক্ষমতার মধুভোগী প্রতিটি রাজনৈতিক দল, ধনিককুলের কুক্ষিগত প্রচার-মাধ্যমগুলো ও বুদ্ধিজীবীরা, প্রশাসন-পুলিশ-প্রত্যেকেই।

প্রচার মাধ্যমগুলো বর্তমান সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পক্ষে নানা ভাবে মগজ ধোলাই করে চলেছে। শোষিত শ্রেণিকে এক কাট্টা হতে না দেওয়ার প্রশ্নাতীত প্রয়োজনে মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করে নানা ভাবে। এ'দেশের মানুষ যে আজ ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, প্রদেশের ভিত্তিতে, জাত-পাতের ভিত্তিতে বিভক্ত, তা তো এমনি এমনি হয়নি। সাংস্কৃতিক জগতকে প্রভাবিত করতে প্রচারমাধ্যমের তুলনা নেই।

মুখোশ হঠাও, দেখি কতটা নিরপেক্ষ

সি পি এম থেকে কংগ্রেস প্রত্যেকটি নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলই সুযোগ পেলেই ঘোষণা করে দেশের স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর এক সাথে চলা জরুরি। তাই সিপিএম কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করে গিয়েছিল।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দল বলে প্রায়ই ঘোষণা-টোষণা করে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে সি পি এম ও কংগ্রেস এমন প্রচার করে, যেন দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ করার স্বার্থে ওরা জোটবদ্ধ হয়ে সাড়ে-চার বছর ছিল। জাতীয়স্বার্থে। মহৎ উদ্দেশ্য ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতার শত্রু' বিজেপি-র আগ্রাসন রোধ করা। আর তাই বিজেপি-র হিন্দু তোষণ রাজনীতিকে ঠেকাতে মুসলমান তোষণের সাম্প্রদায়িক কাজে বাধ্য হয়ে লিপ্ত আছে ওরা।

ওইসব মুখোশধারী রাজনৈতিক দলগুলো খুব ভাল মতই জানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা রোখার দাওয়াই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা নয়। জেনে বুঝেও ওরা এইসব ভণ্ডামী করে, কারণ ভোট বড় বালাই। নীতি ধুয়ে ভোট বাড়ে না। ভোটযুদ্ধে কোনও কিছুই দুর্নীতি নয়।

কর্নাটকে ২০০৮-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র কাছে কংগ্রেস ও সিপিএম-এর পরাজয় দুই দলের পক্ষেই ধাক্কা। সিপিএম-এর সব প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে, এটা খুবই লজ্জার বিষয়। কংগ্রেস ও সিপিএম কর্নাটকে মুসলিম প্রধান এলাকায় মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ছিল। এক সময়কার ব্রাহ্মণবাদী বিজেপি নিজেদের যে পাল্টে নিয়েছে, তা প্রমাণ করল কর্নাটকে। তাদের স্লোগান ছিল, 'পক্ষনিরপেক্ষ' সরকার গড়তে বিজেপিকে ভোট দিন, অর্থাৎ শুধু ধর্মের বেলায় নিরপেক্ষ নয়, জাতপাত, ভাষা ও প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ থাকার মূল্যবোধের স্লোগান তুলেছিল। সেই স্লোগানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আওয়াজ তুলেছে—কেন্দ্রে ক্ষমতা পেলে 'এক দেশ এক আইন' প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বে। তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলগুলোর মতো বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক-পৃথক দেওয়ানি আইন চালু রাখার মতো দ্বিচারিতা করবে না। বিজেপি কর্নাটক জুড়ে তাদের প্রার্থী করেছে সৎ ও উপযুক্তদের মধ্য থেকে। ফলে জাত-ধর্ম-বর্ণ প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটুও গুরুত্ব পায়নি। উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করে মাত করে দিয়েছে বিজেপি।

কর্নাটক নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই কংগ্রেসের সম্পাদক রাহুল গান্ধি প্রকাশ্যে প্রার্থী মনোনয়নে বিজেপি-নীতির প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, বিজেপি-র মতোই কংগ্রেসেরও উচিত হিন্দু-মুসলিম, জাত-পাত ইত্যাদি গ্রুপবাজির কাছে মাথা না নুইয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড় করানো।

বিজেপি'র 'পক্ষনিরপেক্ষ' নীতি যে আমজনতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে—এটা খুবই আশার কথা। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের চেয়ে 'পক্ষনিরপেক্ষ' শব্দটি আরও ব্যাপক। আমরা কি 'পক্ষনিরপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহারে ও প্রয়োগে আনতে পারি না? মুখোশ ছেড়ে আন্তরিক হতে পারি না?

বুদ্ধিজীবীদের 'নিরপেক্ষতা' ও আনুগত্য

২০০৭-এর মার্চ ও নভেম্বরে উলঙ্গ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এসেছিল নন্দীগ্রামে। এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল শাসক পার্টির সন্ত্রাস প্রশাসনের সহযোগিতা।

৩১ বছরের ইতিহাসে প্রায় এমন সন্ত্রাস অনেকবারই চালিয়েছে সি পি এম পার্টির ক্যাডার, সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন যৌথভাবে। মরিচঝাঁপি, সাঁইবাড়ি,

পাঁশকুড়া, নানুর, ছোট আঙারিয়া, সিঙ্গুর, আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের হত্যা এমনি কত কিছুই না ঘটেছে। চলছিল বেশ। সঙ্গে চলছিল গ্রামে-গঞ্জে শহরে সি পি এম ক্যাডার-লিডারদের জমিদারির দাপট। দুর্নীতি, ব্যক্তিজীবনে নাক গলানো ও গুন্ডামি। সিঙ্গুর নিয়ে সি পি এম-এর ভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের অন্তরের কথা— "জমি কী কারোর বাপের, জমি হল দাপের।" ওরা দাপটের সঙ্গে জমি দখল করে টাটাকে মোটর কারখানা করতে ভেট দেয়। বিনিময়ে কে বা কারা কী পেয়েছিলেন জানা নেই। সঠিক জানা না থাকলেও অঙ্কটা যে খুবই বড় হবে সেটা অনুমান করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় না। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের আপামর বাঙালি সি পি এম-এর কোনও কাজ-কর্মে কোনও প্রশ্ন করেনি। ক্যাডারদের শত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে, নতুবা হাত কচলে মোসাহেবি করেছে। কিন্তু নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় ও পার্টি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার মানুষ গর্জে উঠল। পাশাপাশি শহরের শিক্ষিত মানুষরা, বিদ্বজ্জনেরা ফ্যাসিবাদী এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। বস্তুত এই বিদ্বজ্জনের প্রায় সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট সরকারের সমর্থক।

বামপন্থী লেখক-শিল্পী-নাট্যকর্মীদের প্রায় সকলেই হঠাৎ করে কমিউনিস্ট শাসিত সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ায় বাম সরকার অস্বস্তিতে পড়ল।

এমন বিপদে বামপন্থী সরকারের পাশে দাঁড়ালেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সুবোধ সরকার, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নামীদের সংখ্যা এক হাতের আঙুলেই শেষ।

তা হোক-গে। সংখ্যা আর যুক্তি এক নয়। মানলাম। তা কী বললেন সরকার পক্ষের এই পাঁচ উকিল?

সুনীল বললেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব নরম মনের মানুষ, নন্দীগ্রামের অনভিপ্রেত ঘটনায় নিশ্চয়ই মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন।

আনন্দবাজার থেকে দীর্ঘকাল সব সুযোগ-সুবিধে নিয়েছেন সুনীল। এখন অবসর নিয়ে দক্ষিণ ছেড়ে বাম শিবিরে যোগ দিয়েছেন। নামী লেখক, তাই দ্রুত বুদ্ধদেবের কাছের মানুষ হয়েছেন। বুদ্ধদেবের দুঃখ উনি অনুভব করতে পারলেন। কিন্তু বুঝতে চাইলেন না, রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে এমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঘটতেই পারে না।

দেবেশ রায় সুনীলের মতো দুর্বল মনের নন। তিনি জানিয়ে দিলেন, এ তো ভারি মজা! শিল্প করতে নন্দীগ্রামের প্রতিটি লোকের অনুমতি নিতে হবে নাকি? যে অঞ্চলে ৫০০ লোক বাস করে, সে অঞ্চলে একটা লাইট পোস্ট লাগাতে ৫০০ লোকের মত নিতে হবে নাকি?

দেবেশ আরও জানালেন, নন্দীগ্রামের কিছু মানুষ সেখানে পুলিশ-প্রশাসন-অপছন্দের মানুষদের ঢুকতে না দিয়ে মুক্তাঞ্চল করে রাখবে, আর সরকার বসে

বসে দেখবে? নন্দীগ্রামে আইনের শাসন আনতে গেলে একটু-আধটু গোলমাল তো হবেই।

আমি জানি না, কতখানি নীচে নামলে এমন তুলনাহীন বর্বরতাকে 'একটু-আধটু ঘটনা' বলে মনে হতে পারে। জানি না কতটা হৃদয়হীন ও মোসাহেব হলে রাষ্ট্রের ও পার্টির যৌথ সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে কৃষিজীবীদের জমি কেড়ে নেওয়াকে বিনা অনুমতিতে একটা লাইট পোস্ট লাগানো'র সঙ্গে তুলনা করা যায়।

'বামপন্থী' শব্দের অর্থ 'সাম্যপন্থী'। দেবেশ রায় বা তাঁর প্রভুরা কোনও অর্থেই 'বামপন্থী' নন। বুদ্ধবাবু বলেছেন সিঙ্গুরে বহু বেকারের চাকরি হবে। সংখ্যাটা কত? সবচেয়ে বেশি ৮০০ জনের চাকরি হতে পারে। সিঙ্গুরে জমি কাড়ার জন্য রোজগার হারিয়ে বেকার হবেন প্রায় ৫০ হাজার লোক। এই বামপন্থী সরকারের ৩১ বছরের রাজত্বে ৫৬ হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে। অনাহারে প্রতিদিন মরছে কর্মচ্যুত শ্রমিক। 'বামপন্থী' দেবেশবাবু আপনি কি এরপরও মনে করেন, এই 'বামপন্থী সরকার' সত্যিই 'বামপন্থী'? আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হলে বলতেই হবে, আপনি একজন স্বার্থজীবী ভণ্ড।

সরকারের অন্যায়কে সরব সমর্থন জানালে সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রামে বা অন্য কোনও অজুহাতে বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, স্টাডি-লিভ মেলে, কমিটির মেম্বারশিপ পাওয়া যায়, বই বিক্রি তেমন না হলেও মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের হলে প্রকাশক মেলে। তাই কোনও কোনও মধ্যমেধার বুদ্ধিজীবী বুদ্ধজীবী হয়েছেন। সুবোধকে এই দলে ফেলতেই পারেন বিদ্বজ্জন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে তিনি দারুণ বলেন। সুবোধ সরকার বাম সরকারের প্রত্যেকটা ভয়ংকর অন্যায় কাজের পক্ষে দুঁদে ল-ইয়ারের মতোই সওয়াল করেন। বুক বাজিয়ে বলেন, ভূমি-উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি শিশু ও মহিলাদের কেন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল? তাদের আড়ালে থেকে যখন প্রতিরোধ কমিটি পুলিশদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ছিল তখন একান্ত বাধ্য হয়ে পুলিশ গুলি চালায়। সামনে থাকা নারী ও শিশুরাই গুলিতে মারা পড়ল। এ তো ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির কাপুরুষতারই ফল।

মাননীয় সরকারের কাছে একটি প্রশ্ন—পুলিশ কেন বাধ্য হলো গুলি চালাতে? সশস্ত্র গ্রামবাসীদের আক্রমণে কতজন পুলিশ আহত হয়েছিলেন?

মৃণাল সেন বেশ কিছু দিন ধরেই বেশ 'ন্যালবেলে', যাকে বলে 'ডবল

স্ট্যানডার্ড' ব্যক্তি। নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তথা সি পি এম-এর বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন।

তারপরই সি পি এম-এর সন্ত্রাসকে জাস্টিফাই করতে, সি পি এম-কে তুষ্ট করতে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মিছিলে সি পি এম মিছিলে পা মেলালেন। দ্বি-চারিতার অসাধারণ উদাহরণ।

নন্দীগ্রামে গুলি চালিয়ে নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছে পুলিশ ও সি পি এম-এর হার্মাদ বাহিনী। ঘরের পর ঘর জ্বলছে, ধর্ষণ হয়েছে প্রকাশ্যে। ঠিক তখন এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সৌমিত্রর প্রতিক্রিয়া জানতে বিভিন্ন মিডিয়া ফোন করেছিল। সৌমিত্র সাফ জানিয়েছিলেন—কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন না। এত হত্যা, ধর্ষণেও যে মানুষের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না, সেকি মানসিক প্রতিবন্ধী? এমন প্রশ্ন উঁকি মারাটাই স্বাভাবিক। না কি লজ্জা পেলেন?

এইসব বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ কী শিখবেন? না আমরা ভণ্ড চাই না। ভণ্ডদের ঘৃণা করতে চাই। চাই যা, হবেও তা।

প্রধানমন্ত্রীও 'ডিসিশন মেকার' নন

সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম প্রত্যেকটি সন্ত্রাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবকে দায়ী করা হয়েছে। পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়েছে শহর কলকাতা ও মফস্‌সল—বুদ্ধদেবের দুটো মুলোর মত দাঁতের পাশ দিয়ে রক্তস্রোত নেমে আসছে।

বুদ্ধদেব তাঁর ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করতে নামিয়ে দিয়েছিলেন পুলিশ ও ক্যাডারদের—এমন ভাবনার মধ্যে একটা ভ্রান্তি রয়েছে। বুদ্ধদেব মুখ্যমন্ত্রী হলেও রাজ্যের বড় পরিকল্পনার রূপায়ণে একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী নন। এমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দলের বিভিন্ন নেতা, টাটা ও সালেম গোষ্ঠীর প্রতিনিধি (সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে), টার্গেট অঞ্চলের পার্টির নেতা, গুণ্ডাবাহিনীর পার্টি নেতা (যেমন লক্ষ্মণ শেঠ), সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, পুলিশ প্রধান, গোয়েন্দা প্রধান, প্রাক্তন সেনানায়ক, অ্যাকশন স্কোয়াডের বিভিন্ন নেতা, অন্যান্য ধুরন্ধর কালোবাজারি ব্যবসায়ী সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং থেকে জর্জ বুশ সবার বেলায় সত্য একটাই। কেউই একা ডিসিশন মেকার নন।

অনেকের এমন ধারণা—মনমোহন চলেন সোনিয়া গান্ধীর কথা মত। 'ওঠ' বললে ওঠেন, 'বোস' বললে বসেন। আবার অনেক সাংবাদিকের ধারণা সোনিয়াকে

চালান দু-জন। এক : সীতারাম ইয়েচুরি, দুই : প্রণব মুখোপাধ্যায়।

আসলে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এইসব অনুমানও পুরোপুরি ঠিক নয়। মনমোহন-সোনিয়া-বুশ প্রত্যেকেই বুদ্ধদেবের প্যাটার্নেই সিদ্ধান্ত নেন। তবে এসব ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ, সেনাপ্রধান, গোয়েন্দা প্রধান, র-এর প্রধান ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের বাড়তি উপস্থিতি থাকে।

সিদ্ধান্ত এরা সকলে সম্মিলিতভাবে নেয়, কারণ এদের সবার স্বার্থ একই সুতোয় বাঁধা।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অলিখিত ফ্রন্টের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকেই আমরা প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতার সিদ্ধান্ত বা পার্টি-প্রধানের সিদ্ধান্ত বলে ভুল করি।

এটাই বর্তমান রাজনীতির ধারা। হ্যাঁ, তারপরও বলতে পারি যে শ্রেণি অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, সেই শ্রেণিই অলিখিত ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

যারা গদিতে বসার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে (কেন্দ্রে এই মুহূর্তে যেমন বিজেপি ও তার ফ্রন্ট) তারাও অলিখিত ফ্রন্ট গড়ে। আলোচনা করে, গবেষণা করে, অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়। কর্নাটকের ২০০৮-এর বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচন ও স্লোগান নির্ণয়ে এমনই সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রয়াস ছিল, নেতৃত্বে বা আহ্বায়কের ভূমিকায় ছিলেন বিজেপির অরুণ জেটলি। তাঁর ভূমিকাকে অস্বীকার না করেও বলি, তিনি আইডিয়া দিতে পারেন, কিন্তু একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী নন।

এমন অবস্থা বিশ্বরাজনীতির সর্বত্র। একে কী বলব? রাজনীতির বিশ্বায়ন? নাকি বিশ্বরাজনীতির বাধ্যবাধকতা?

অধ্যায় : চার

নৈরাশ্য একটি সামাজিক ব্যাধি

বিষয়টাকে বুঝতে আমরা আলোচনাকে প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখি আসুন।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রচার মাধ্যমের দেওয়া যুক্তি, বিশ্লেষণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। তারপর একসময় এইসব যুক্তি, বিশ্লেষণকে নিজের বলে অফিসে, আড্ডায় প্রচার করে পাত্তা পেতে চায়। সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চায়। এবং তা পারেও। বাঙালি মধ্যবিত্তদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল সমাজবিজ্ঞানী থেকে ঝানু সাংবাদিকরা। তাঁরা এও জানেন মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মাথায় কোনও যুক্তি ও বিশ্বাসকে ঢোকাতে পারা মানে বাঙালি ভোটারদের মনেও ঢুকে যাওয়া।

এভাবে প্রচার মাধ্যমের ছড়িয়ে দেওয়া বিশ্লেষণগুলো সাধারণ মানুষের গভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়। যেমন—সি পি এম-দের এই রাজ্য থেকে হটানো অসম্ভব। পুলিশ-গুন্ডা-ইলেকশন মেশিনারি সবই ওদের হাতে। সুতরাং ভোটে ওরা জিতবেই—সি পি এম-এর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যাওয়া মানে নিজের বরবাদিকে টেনে আনা। এ-যেন 'আও বয়েল মুঝে মার'। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মানেই হয় না। দুর্নীতি কোন্ জায়গায় নেই?—সি পি এম ছাড়া রাজ্য শাসনের মতো একটা দল আছে? —মমতা? ও তো পাগলি। পুলিশ তোলা চাইলে দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, সাধারণ মানুষ পুলিশের সঙ্গে পারবে না।—ধনীরা খুন করেও পার পেয়ে যায়। মন্ত্রী থেকে পুলিশ সবাই কোটিপতির পক্ষে সরব হবে। ওদের শাস্তি কখনই হবে না। পুলিশ ও মিলিটারিদের বিরুদ্ধে গরিব মানুষগুলো লড়তে গেলে শেষ হয়ে যাবে।—গরিব বা আধা-গরিব দেশগুলো আমেরিকার বিরোধিতা করলে নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে।

এমন নৈরাশ্য চিন্তা সমাজের বর্তমান অবস্থানকে মজবুত করে। "সি পি এম-এর হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সি পি এম"—এমন নৈরাশ্য চিন্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ করার ইচ্ছেটুকুও জাগতে দেয় না, প্রতিবাদ তো দূরের কথা। কিন্তু এমন বিশ্বাস যে কত বড় মিথ্যে তার জ্বলন্ত প্রমাণ ২০০৭-এ বাংলার 'নবজাগরণ'। ২০০৭ থেকে ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল কমিটির

নির্বাচন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে সি পি এম সমস্তরকম দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েও লাগাতার ভাবে হেরে চলেছে। নিজের পুলিশ, নিজের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েও বিপর্যয় রোধ করতে পারেনি। রেশন দুর্নীতি থেকে পঞ্চায়েত-দুর্নীতি সবের বিরুদ্ধেই জনরোষ গত কয়েক বছর ধরে বিস্ফোরিত হয়েই যাচ্ছে। ফলে "সি পি এম-কে হটানো অসম্ভব" এই মিথ্ এই বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে।

শিবানী ভাটনগর হত্যা থেকে মধুমিতা শুক্লা হত্যায় যথাক্রমে আই পি এস অফিসার রবিকান্ত শর্মা ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তনমন্ত্রী বাহুবলী অমরমণি ত্রিপাঠী আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। বিখ্যাত, অতিবিখ্যাত, ধনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীরা অপরাধ করে পার পাচ্ছে না। গত কয়েক বছরের ইতিহাস এ কথাই বলে—আমেরিকাও হারে।

গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকা সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিল নেপালের রাজাকে। উদ্দেশ্য, মাওবাদীদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা। দোসর পেয়েছিল ভারতকে। কিন্তু তারপরও আমেরিকার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে নেপালে সাম্যবাদের জয় হয়েছে মাওবাদীদের জয় হয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত একটা সুন্দর সমাজ গড়ার একটা ফলপ্রসূ টোটকা: 'হবে না' চিন্তা মাথায় ঢোকালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেতা যায় না। ইতিবাচক চিন্তাই আপনাকে লড়াই জেতার নানা পথের সন্ধান দেবে, সমমনোভাবাপন্নদের চিনে নিতে সাহায্য করবে।

মধ্যবিত্তদের চালিত করেন বিদ্বজ্জন। বিদ্বজ্জনকে...

ভেবে দেখুন তো—২০০৬ সাল বা তার আগে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' শব্দটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কিনা? দশ-পনেরো বছরের পুরনো কাগজের ফাইল দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন শব্দটির ব্যবহারই ছিল না। তখন 'সন্ত্রাসবাদী' বলতে কেউ রাষ্ট্রকে বুঝত না। বুঝত নকশাল থেকে আলফা, অল্-কাইদা থেকে হিজাবুল মুজাহিদিন ইত্যাদি সংগঠনকে। মিডিয়ার লাগাতার প্রচারে এদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ যখন একই কথা ভাবছে, আড্ডায়, আলোচনায় লেখায় প্রচার করছে তখন ওদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করেছে সমাজ। সমাজ ওদের ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে নির্দয় খুনি ভেবে। এইসব সংগঠনের কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে খবর পেলে মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের নিজেদের একটা বড় জয় বলে ধরে নিয়েছে। এইসব 'সন্ত্রাসবাদী'দের জামিন দেয়নি বিচারকরাও। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে কোনও অমানবিক ব্যবহার

সমাজ অনুমোদন করে। মনে করে এমন সন্ত্রাসবাদীদের মানবাধিকারের রক্ষাকবচ পাওয়ার অধিকারী নয়। ফলে প্রভাবিত হন বিচারকও।

রাষ্ট্র কাঠামোর প্রধান সহায়কদের অন্যতম শক্তি শাসক দল। তারা চাইছিল, সরকার-বিরোধী ক্ষুধার্ত মানুষগুলো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ- আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করলে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দেগে দিতে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে সরকার চাইছে social sanction অর্থাৎ সমাজের অনুমোদন আদায় করতে। প্রচারমাধ্যমগুলোর আন্তরিক সহযোগিতায় সরকার এ বিষয়ে দারুণভাবে সাফল্য পেয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বলে দেগে দেওয়া মাওবাদীদের প্রতি তীব্র ভয়, ঘৃণা, ক্রোধ তৈরি হয়েছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে।

যাদবপুরে মাওবাদী সন্দেহে পুলিশ ও সি পি এম-এর স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা পাঁচ ছাত্রীকে হেনস্তা করল ২০০৮-এর ৭জুন। এতদিন 'মাওবাদী' বলে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার, অত্যাচার, হত্যা—সবই চালাচ্ছিল এই রাজ্যের পুলিশ ও সি পি এম পার্টি। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কী হল, মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে সুশীল সমাজ সকলেই এই ঘটনাকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার ও পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল। সি পি এম ও তার সরকার এতদিন প্রেসকে জানাত কোথায় কোথায় মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীরা ঘাঁটি গেড়েছে। শুনে-টুনে মনে হত, যেখানে সন্ত্রাসবাদ সেখানেই মাওবাদী। সেই মাওবাদীদের ধরতে গিয়ে নিজেদেরই 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখে সি পি এম ভ্যাবাচ্যাকা। মুখ্যমন্ত্রী জনরোষ থেকে বাঁচতে বলেছেন, পুলিশ অন্যায় করেছে।

"এ কী কথা শুনি আজি" মন্থরার...থুড়ি... বুদ্ধবাবুর মুখে?

কেন আজ সি পি এম-এর রিগিং ম্যাজিক ফেল করল পঞ্চায়েত ভোটে? কেন ১৪ মার্চ ২০০৭ নন্দীগ্রামে পুলিশ ও সি পি এম-এর হার্মাদ বাহিনী খুন, ধর্ষণ, লুঠ করেও গ্রাম-বাংলার মানুষদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করতে পারল না? এই ঘৃণ্য আক্রমণকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়ে গ্রামের মানুষ, শহরের মধ্যবিত্ত, সুশীল সমাজ সমস্ত ভয়, দ্বিধা কাটিয়ে গর্জে উঠলেন। সি পি এম বুঝতে পারছিল না, এতদিন যে বিদ্বজ্জন তাদের অনুগত ছিলেন, বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানাতেন, তাঁরা হঠাৎ কেন সি পি এম বিরোধিতায় নামলেন?

খোলামেলা মত প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলে ভেঙে যায় 'মিথ্'

একটু ভাবুন তো—গত তিরিশ বছরের বাম শাসনে ৫৬ হাজার কারখানা বন্ধ হল। এক লক্ষের উপর কারখানা রুগ্ণ। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলো একে একে বন্ধ হল। হাজার হাজার গরিব মানুষ অনাহারে মারা গেলেন। সি পি এম-এর

সন্ত্রাসে শ'য়ে শ'য়ে বাড়ি জ্বলল, মানুষ মরল, নারীরা ধর্ষিতা হলেন, কিন্তু তার পরেও এই বঙ্গের সুশীল সমাজ, বামবুদ্ধিজীবীরা কেন বামফ্রন্ট বা সি পি এম-এর বিরোধিতা করেননি? কেন? সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের বেলায় কেন বামবুদ্ধিজীবীরা সি পি এম-এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করলেন? সি পি এম-কে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করলেন, পুলিশ ও পার্টির সশস্ত্র ক্যাডারদের সন্ত্রাসকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলে সরব হলেন!

অধ্যায় : পাঁচ

Discourse (সর্বত্র আলোচনার ঢল)

গত ৩১ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে এই বঙ্গে মরিচঝাঁপি, নকশালবাড়ি, সাঁইবাড়ি, ধানতলা, বানতলা, ঘোকসাডাঙা, কেশপুর, গড়বেতা, আরামবাগ ইত্যাদি অঞ্চলগুলোতে রক্ত হিম করা পার্টি সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়েছে। বিজন সেতুতে দিনে দুপুরে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের গায়ে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এসব খবর কাগজে বেরিয়েছে, কিছু কিছু টিভিতেও দেখেছি আমরা। কিন্তু আমরা জ্বলে উঠিনি। কারণ ভয়মুক্ত হয়ে বাঙালিরা এসব নিয়ে সোচ্চার হয়নি, এমনকি একান্ত আলোচনাতেও ওইসব অত্যাচারের ঘটনা আমরা তুলে আনতে চাইনি। যদি সিপিএম জানতে পারে? এক অদ্ভুত অবিশ্বাসের বাতাবরণ।

ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করলেন। ভয়ের চোটে সিপিএম লিডার থেকে ক্যাডার বাঘ থেকে রাতারাতি বিড়াল। ইন্দিরা গান্ধির অত্যাচারের নানা ঘটনা একান্ত আলোচনার উঠে আসছিল। এই গোপন আলোচনা থেকেই discourse শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দ discourse, ফলে মিলিটারি পুলিশ দিয়ে ভোটে রিগিং করতে গিয়েই ডাহা হারলেন। যাদের উপর ইন্দিরা অ্যান্ড কোং ভরসা করেছিলেন রিগিং করে জেতাবে বলে, তারাও ইন্দিরার বিরুদ্ধে ছাপ মেরে ডুবিয়েছিল।

সিপিএম-এর বিরুদ্ধে কখন 'discourse' শুরু হবে? শুরু হবে কী? শুরু তো হয়ে গেছে। দেখছেন না, শুনছেন না, ট্রেন-ট্রামে-বাসে চায়ের দোকানে, অফিসে সিপিএম-এর স্বেচ্ছাচার, স্বজনপোষণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ উদম খিস্তি দিচ্ছে, ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে?

জরুরি প্রশ্ন হল—কোন্ ঘটনা বা পরিস্থিতিতে discourse শুরু হয়? মরিচঝাঁপি থেকে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী পোড়ানোর ঘটনায় কেন 'discourse' শুরু হয়নি? কারণ সিপিএম-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে বাঙালি ভয় পেয়েছে। ওরা একবার জানতে পারলে ... অতএব সর্বত্র আলোচনায় সমালোচনা উঠে আসেনি স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে। এই সর্বত্রগামী আলোচনা-সমালোচনা-ক্ষোভের নাম 'discourse'।

গত বছর তিরিশ ধরে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পায়ের তলায় রেখে শাসন করে গেছে। যেখানেই প্রয়োজন মনে করেছে সেখানেই বেয়াদপদের উপর নানা ডিগ্রির সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে। টিকে থাকতে গেলে সিপিএম-এর দুর্নীতি ও মস্তানির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে, এটা বুঝে নিয়েছিলেন রাজ্যবাসী।

সিপিএম সরকার এই রাজ্যে সন্ত্রাস চালায় পুলিশ, গুন্ডা ও ক্যাডারদের দিয়ে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে 'রাষ্ট্র' মানেই নানা মাপের সন্ত্রাস। রাষ্ট্র সন্ত্রাস চালায় তার সহায়ক শক্তিগুলোর সাহায্য নিয়ে। উদাহরণ—৩ নভেম্বর ২০০৮-এর দুটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর (এক) "এ বার মমতাকে বাধা দিল ন্যানো-বঞ্চিত সিঙ্গুর", (দুই) "সিঙ্গুরে মমতার সভা ভেস্তে দিতে তাণ্ডব সিপিএমের"।

রাষ্ট্রের তথা সরকারের অন্যতম সহায়ক শক্তি একটি পত্রিকা সিপিএম-এর নগ্ন তাণ্ডবকে 'ন্যানো-বঞ্চিত সিঙ্গুরবাসীদের বাধা' বলে চিহ্নিত করল। রাষ্ট্রের কাঠামোর নিয়ন্তা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হোলসেল এজেন্সি দেওয়া থাকে সরকারকে। নিয়ন্তা শক্তির ঠিক-ঠাক সেবা না করলে মন্ত্রীত্ব যেতে পারে, সরকারের গদি উল্টোতেও পারে।

গোদা-সন্ত্রাস চালাবার জন্যে সরকারের হাতে পুলিশ-প্রশাসন সেনা-ক্যাডার-গুণ্ডা কে নেই! রাষ্ট্রের চেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হয়নি, হবেও না।

এতদিন রাষ্ট্রের কৃপাধন্য বুদ্ধিজীবী ও প্রচারমাধ্যমগুলো আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে গেছে, সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা মানেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা। যারা সরকারের অত্যাচার, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারাই সন্ত্রাসবাদী, হোক না তারা ভুখা, নাঙ্গা।

এমন একটা ব্যাপক প্রচারিত চিন্তার পরিবেশ সমাজের স্থিতাবস্থা রাখার অনুকূল। অনুকূল পরিবেশে নিশ্চিন্তে কড়া হাতে রাজ করছিল সিপিএম।

এই যখন অবস্থা, তখন ২০০৬-এর নভেম্বরে একটা e-book প্রকাশিত হল—'Terrorist'। পৃথিবীর মননশীল জগতকে কাঁপিয়ে দিল বইটি। বইটা ইংরেজিতে। লেখক বাঙালি। রাজনৈতিক ও সমাজবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ বইটি ২০০৭-এর কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হতে চলেছে, এটা অনুমান করে প্রকাশ আটকাবার নানা প্রচেষ্টা শুরু হল। শুরু করল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্রষ্টারা। অনেক লড়াই, অনেক লুকোচুরির পর বইটি জানুয়ারি ২০০৭-এ বইমেলাতেই প্রকাশিত হল। নাম—প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...। বইমেলাতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমাজসেবার কাজে নিবেদিত সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে কানাকানি, কথা চলাচলি,

'সন্ত্রাস', ব্যান হবে। তাড়াতাড়ি কিনে নে। বইটিতে একটা নতুন শব্দ উঠে এসেছিল, 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা। তারপর 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' শব্দটা স্লোগানে, পোস্টারে, মিটিং-মিছিলে পত্র-পত্রিকায় আলোচনায় বারবার উঠে আসতে লাগল। মমতা থেকে জয় গোস্বামী, অপর্ণা থেকে শুভাপ্রসন্ন বহু বিশিষ্টদের কণ্ঠে বারবার শব্দটা শুনতে শুনতে, লেখায় ছবিতে শব্দটা দেখতে দেখতে মনে হতে লাগল কত পরিচিত এই 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' শব্দটি। অথচ নতুন এই শব্দটি অভিধানে এখনও স্থানই পায়নি। বোঝা গেল 'discourse' আসছে।"

বইটা নাড়িয়ে দিল রাজনীতিক থেকে শিক্ষিত সমাজের বেশ কিছু চিন্তা ভাবনাকে। মধ্যবিত্ত সমাজের এগিয়ে থাকা অংশ নতুন চিন্তার খোরাক পেল। দ্রুত প্রভাব ফেলল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের মধ্যে। সর্বত্র একটা নতুন হাওয়া—কিছু মানুষ যদি সুন্দর দেশটাকে দুর্নীতিতে ও সন্ত্রাসে ভরিয়ে দিতে পারে, তবে আরও কিছু মানুষ কেন অসুন্দর দেশকে আবার সুন্দর করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। সন্ত্রাসবাদী সিপিএম পার্টির প্রতিটি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, লড়াই দেওয়ার ইচ্ছে ব্যাপক গতি পেল। একেই আমরা চলতি কথায় বলি 'স্বতঃস্ফূর্ত' গতি। অর্থাৎ এটা সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তথাকথিত 'স্বতঃস্ফূর্ত'। আসলে আপনা-আপনি এমন আবেগ তৈরি হয় না। 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ'-এর তত্ত্ব বলে, এই গণআবেগ তৈরির পিছনে কোনও এক বা একাধিক মস্তিষ্ক কাজ করে। চালকের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা-ভাবনাই বহুতে প্রবাহিত হয়, গুণোত্তর নিয়মে। গুণোত্তর নিয়ম মানে ১ থেকে ২, ২ থেকে ৪, ৪ থেকে ৮, ৮ থেকে ১৬, ১৬ থেকে ৩২, ৩২ থেকে ৬৪ এমনই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বহুতে প্রবাহিত চিন্তা ভাবনার পরিণতিতে কখনও কখনও গণআবেগ তৈরি হয়। গণআবেগ থেকেই গড়ে ওঠে গণআন্দোলন। গণআন্দোলনের মূল বীজ বা নিউক্লিয়াস প্রায় সকলের কাছেই থেকে যায় অধরা। আমরা তখন ধরে নিই এই গণআন্দোলনটি আপনা-আপনি বা স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে গড়ে উঠেছে।

চালক মস্তিষ্কের চিন্তা থেকে তখনই গণআবেগ এবং পরিণতিতে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, যখন তার চিন্তা থেকে 'discourse' তৈরি হয়। Discourse অর্থে—প্রায় সর্বত্র মানুষ যখন ভয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে। মস্তিষ্ক যুদ্ধে এই discourse-এর ভূমিকা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ।

গত শতকের ছ'য়ের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দেখল, তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া। সাম্যপন্থী রাশিয়ার ছত্রছায়ায় শামিল হয়েছে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ দেশ। এতগুলো দেশ যদি সাম্যবাদী হয়ে যায়, তাহলে তৃতীয় বিশ্বের পিছিয়ে থাকা দেশগুলোও ওদের দিকেই ভিড়তে পারে। সাম্যবাদী দেশগুলোর আগ্রাসন অসাম্যপন্থী দেশগুলোর পক্ষে বিশাল বিপদ।

এই বিপদ থেকে বাঁচতে আমেরিকা যুদ্ধাস্ত্র তৈরির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হয়েছিল রাশিয়াও। অবস্থা এমন দাঁড়াল—দু'দেশ যুদ্ধে নামলে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হতে বেশি দেরি হবে না। এই সত্যটা উপলব্ধি করে আমেরিকা।

অস্ত্র ব্যবহার না করেই কী ভাবে রুশ সরকারকে ধসানো যায়, নিজেদের সাম্রাজ্যকে অটুট, আরও মজবুত করা যায়, এমনই একটা পথ তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল আমেরিকা। এই প্রয়োজন থেকেই বিশাল খরচসাপেক্ষ এক গবেষণার কাজে হাত দিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এই গবেষণায় যুক্ত করা হল মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সেনানায়ক, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বিশেষজ্ঞ, তৃতীয় বিশ্বের দেশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি এক ঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে। তাঁদের সম্মিলিত গবেষণার নাম ছিল, 'War of ideas' বা 'ভাবনার যুদ্ধ'। পরবর্তী কালে 'War of ideas' ই 'Brain war' বা মস্তিষ্ক যুদ্ধ নামেও পরিচিত হয়।

এই 'War of ideas' বা 'Brain war' তত্ত্ব থেকে মূল কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছিল। সাম্যে বিশ্বাসী দেশগুলোর জন্য পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছিল প্রধানত তিনটি বিষয়। (এক) ধৈর্যের সঙ্গে লাগাতার ভাবে রুশ জনতার কিছু অংশের মধ্যে ঢোকাতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্যবোধ। ক্যাবারে নাচ, ব্লু ফিল্ম ইত্যাদি দেখা, যৌনতা, কলগার্ল ও কলবয়ের নামে গোপন বেশ্যাবৃত্তি, যৌন উশৃঙ্খলত ইত্যাদি ভোগসর্বস্বতাকে মানুষের 'একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে ও দেশে গোপনে প্রচার চালাতে হবে। কমিউনিস্ট দুনিয়ার বাইরের জগতের মানুষ রূপে-রসে-গন্ধে কত সুন্দর আছে মাথায় ঢোকাতে হবে। যৌনতাকে উপভোগ করার মধ্য দিয়ে যে অর্থও রোজগার করা যায়—ইঙ্গিত দিতে হবে। অর্থলোভ ও যৌনতার মতো স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উসকে দিতে পারলে ম্যাজিক ঘটে যাবে। ভোগসর্বস্ব চিন্তার এমনই মাদকতা যে মানুষ তখন আত্মসুখের বাইরে কিছু ভাবতেই চাইবে না। সমাজের সমস্যার দিকে তাকিয়েও দেখবে না। ফলে সাম্য চিন্তা মাথায় উঠবে। একান্ত আত্মচিন্তাই দুর্নীতির জন্ম দেয়। একবার জন্ম দিলে তা গোটা সমাজে ছড়াবে ক্যানসারের মতোই।

(দুই) মানুষের চরিত্রের প্যাটার্নকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক : ভোগবাদী, দুই : ভাববাদী। ভাববাদীরা যিশু, আল্লাহ্, কৃষ্ণ ইত্যাদি ঈশ্বর বা অবতারে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ঐশ্বরিক ক্ষমতায়। তারা ভোগের চেয়ে ত্যাগ-ই ভালোবাসে। সাম্যকামী দেশের সব মানুষই ভোগবাদীর টোপ গিলবে—এমনটা ভাবলে ভুল হবে। যাদের মাথায় ত্যাগের ভূত সওয়ার, তাদের মগজে ঢোকাতে হবে নানা ভাববাদী চিন্তা। ভাববাদেরা বঞ্চনার কারণ খুঁজে বের করে তাদের শেষ করতে লড়াইতে নামবে না কোনও দিনই। তাদের চোখে যিশু-আল্লাহ্-কৃষ্ণ সত্য, জগৎ মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

যারা ভজন-পূজন নিয়ে থাকে, তারা কোনও দিনই শোষণ মুক্তির কথা ভাবে না।

(তিন) মানুষের মাথায় ঢোকাতে হবে—কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। বাক্ স্বাধীনতা নেই। ওদের বোঝাতে হবে, কমিউনিস্ট দেশে আছে কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব। কমিউনিস্ট পার্টির স্বার্থে দেশের মানুষ। মানুষের স্বার্থে কমিউনিস্ট পার্টি নয়। পার্টি যা বলবে তা-ই জুতোর শুকতলা হয়ে মানতে হয়। নতুবা মরতে হয়।

'দেশের কমিউনিস্ট সরকার সর্বশক্তিমান, চিরকাল থাকতে এসেছে'—এটা একটা অত্যন্ত ভুল চিন্তা। কেউই ক্ষমতা চিরকাল ধরে রাখতে পারে না। ইতিহাস বার বার এই কথাটাই প্রমাণ করেছে। এই সরকারও যাবেই। দুর্নীতিই ওদের শেষ করবে। মিথ্ ভাঙার প্রয়োজনে এমন প্রচার জরুরি।

এসব কথা কমিউনিস্ট দেশগুলোর প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা যায় না। কারণ প্রচার মাধ্যমের মালিক কমিউনিস্ট সরকার। এমন অবস্থায় এসব চিন্তা ওদেশে ঢোকাবার দায়িত্ব টুরিস্টদের। তারা দোভাষিদের, গাইডদের মধ্যে এমন চিন্তার বীজ বোনার কাজ শুরু করুক। রুশ লেখককে দিয়ে রাশিয়ার অবস্থা লিখে বই প্রকাশ করুক। বইটিকে পুরস্কৃত করুক, প্রচারে প্রচারে লেখককে 'মহান' করে তুলতে হবে। রুশ ভ্রমণে গিয়ে ভ্রমণকারীরা এই বইটির কথা ও বইয়ের বিষয়ের কথা তুলে ধরবে গাইড, দোভাষী ইত্যাদিদের কাছে, তবে সাবধানে। তৃতীয় বিশ্বের কোনও দেশ থেকে গবেষণার কাজে বা পড়তে আসাদের প্রচারকের ভূমিকায় নামতে হবে।

এসবই হল মুখে ছড়িয়ে দেওয়া ব্যাপক আলোচনার প্রস্তুতি। এমন আলোচনা থেকেই তৈরি হয় 'discourse' যা তথাকথিত সর্বশক্তিমানের রাজত্বে শেষ পেরেক ঠোকার কাজ করে।

'War of ideas' তত্ত্বের এই মূল তিনটি কৌশলই প্রয়োগ করেছিল আমেরিকা। বোমা-গোলার পরিবর্তে প্রয়োগ করল মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতি। আর তাতেই হুড়মুড় করে একের পর এক পূর্ব ইউরোপের মার্কসবাদী সাম্রাজ্য ধসে গেল।

হ্যাঁ, কফিনের শেষ পেরেকটা ঠুকেছিল 'discourse'। Discourse-এর সার্থক উদাহরণ, রাশিয়ায় কমিউনিস্ট সরকারের পতন।

২০০৭ সালকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি চিরকাল মনে রাখবে 'নবজাগরণ-বর্ষ' হিসেবে, 'জনজাগরণ-বর্ষ' হিসেবে। সে বছর আমরা দেখলাম সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে মুখর হলেন গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, পণ্ডিত সমাজ, সুশীল সমাজ। এই জনসাধারণের পিছনে কোনও রাজনৈতিক দলের আহ্বান ছিল না। এই বিশাল জনসমষ্টির ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে কুড়িটার উপর সংগঠন আজ জোটবদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতায় নেমেছে। ব্যবসায়িক মিডিয়াগুলো ব্যবসায়িক স্বার্থে জনগণের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিল। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বাজার বাড়াল। সি পি এম পার্টির মালিকাধান পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল, সিপিএম পার্টির লেজুড় পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল এবং টাটার চামচা পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল পরিকল্পিত মিথ্যে প্রচারে নেমে পড়ল। কিন্তু তারপরও লেজুড় ও চামচা মিডিয়াগুলোর মিথ্যের ব্যবসা পুরোপুরি ব্যর্থ হল শুধুমাত্র discourse-এর কারণে। সর্বব্যাপী আলোচনার ঢেউয়ে ডুবে গেল মিথ্যে প্রচারের প্রবল প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট শাসন যেন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির শাসন ভেঙে পড়ার আগের প্রতিচ্ছবি। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি মনে করত—পার্টির জন্য দেশবাসী। দেশবাসীর জন্য পার্টি নয়। কাঁটায় কাঁটায় একই চিন্তার শরিক এই বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি। তারাও মনে করে—

পার্টির জন্য রাজ্যবাসী। তাইতো পার্টির লড়াই
এখন টাটা-বিড়লা-আম্বানির বিরুদ্ধে
নয়। কৃষকদের বিরুদ্ধে।

এখানকার কমিউনিস্টরা শেষ অবস্থায় আস্থা রেখেছে 'টোটাল টেররিজম'-এ।

রিজওয়ানুর নামের এক প্রতিশ্রুতিবান যুবক কোটিপতি ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করল। প্রেম করে বিয়ে। এই স্পর্ধার জন্য জীবন দিতে হল অসময়ে। গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, প্রোমোটিং ও ক্রিকেট ম্যাচফিকসিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া ব্যবসায়ী অশোক টোডির হয়ে ভাড়াটে গুন্ডার ভূমিকায় আমরা নামতে দেখলাম কলকাতা পুলিশের কমিশনার থেকে কিছু আই পি এস অফিসার ও তাদের অধস্তন অফিসারদের। রাজ্য সরকার লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নেমে পড়ল গুণ্ডা-দুর্নীতিবাজ পুলিশ অফিসারদের বাঁচাতে। এছাড়া সরকারের উপায়ও ছিল না। যে পুলিশরা নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে পার্টির অনুগত কর্মী, ইলেকশনে বড় ভরসা—তাদের বিপদে বুক দিয়ে না পড়লে চলে?

আমরা এ-ও দেখলাম, ব্যবসায়ী-পুলিশ-সরকারের গাঁটছড়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে 'স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে। পশ্চিমবঙ্গে এমন স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণ এই প্রথম দেখা গেল।

২০০৭ সালে গ্রাম বাংলার মানুষ সমস্ত ভয় কাটিয়ে গর্জে উঠলেন। রেশনের চাল-গম-চিনি-কেরোসিন ডিলারদের ব্যাপক চুরির বিরুদ্ধে মানুষ সংঘর্ষে নামলেন।

গ্রামের মানুষদের জাগরণে সিপিএম ভয় পেল। প্রচণ্ড রকমের ভয়। এতদিন গ্রামবাসীদের চম্‌কে রেখে 'সিপিএম' নামের যে ভয়ের মিথ তৈরি করেছিল, সেই মিথ্ কি ভেঙে পড়ছে?

Discourse বা সর্বব্যাপী আলোচনার ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকলে এভাবেই ভেঙে পড়ে মিথ্।

এই যে জনজাগরণ, এই যে গণআন্দোলন, সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নির্মাণের শুরু, তার বীজ কোথায় ছিল? Discourse-এর বীজ কোথায় ছিল? ২০০৭-এর কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত যে বইটি আপসমগ্ন চেতনায় ঝাঁকি দিয়ে গেল বইটির নাম—'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...। রাজনীতিকদের বক্তব্যে, বুদ্ধিজীবীদের লেখায় সেই বক্তব্যে, মধ্যবিত্তদের এগিয়ে থাকা অংশের আলাপ আলোচনায় উঠে আসতে লাগল কিছু নতুন বিশ্বাস—রাষ্ট্রই সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী। শাসকদল কখনই গরিবদের বন্ধু হয় না। ধনীরাই রাষ্ট্রের নিয়ন্তা। সরকার ধনীদের সেবাদাস, বিনিময়ে পায় সংবিধানবহির্ভূত ক্ষমতা, অর্থ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাবার অধিকার।

এগিয়ে থাকা মানুষদের নতুন বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা গেল বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে। তারাও বিশ্বাসের এই মূল স্রোতে শামিল হলেন। ফলে এমন একটা সর্বব্যাপী জনমতের স্রোত discourse তৈরি হল যে তাকে সামাল দিতে গিয়ে আজ বেসামাল রাজ্যসরকার ও সিপিএম পার্টি।

অধ্যায় ছয়

সাংস্কৃতিক জগতে হচ্ছেটা কী?

আজকের সমাজ কাঠামোয় এ'দেশের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর একছত্র নিয়ন্তা ধনকুবেরগোষ্ঠী, তা সে বস্তুগত বা অবস্তুগত—যাই হোক না কেন।

সংস্কৃতির 'বস্তুগত উপাদান' কথার অর্থ—একটি মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহ। যেমন—ঝুপড়ি থেকে আকাশচুম্বী প্রাসাদ, গোরুর গাড়ি থেকে মহাকাশযান, হাতপাখা থেকে এয়ার কন্ডিশনার, প্রদীপ থেকে জেনারেটর, টিনের চোঙ থেকে স্যাটেলাইট, ধুতি থেকে জিনস্, ছাতু থেকে শ্যাম্পেন, শিলনোড়া থেকে গ্রাইন্ডার. ঝাঁটা থেকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, আলপথ থেকে রেড-রোড, ফোঁড়া কাটার নরুন থেকে মাইক্রোসার্জারির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব কিছুই।

অবস্তুগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র, ধর্মগ্রন্থ থেকে যুক্তিবাদী গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারমাধ্যম হিসেবে লিফলেট থেকে স্টার-টিভি, অন্ধবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা, পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা, আস্তিক্যবাদ থেকে নাস্তিক্যবাদ, ভাববাদ থেকে যুক্তিবাদ, নীতিহীনতা থেকে নীতিবোধ, চাটুকারিতা থেকে ঠোঁটকাটা স্পষ্টবাদিতা, দ্বিচারিতা থেকে আপসহীনতা ইতাদি সব কিছুই।

বস্তুগত এবং অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো নিয়েই একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, চলমান সংস্কৃতি।

এই বস্তুগত ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর নিয়ন্তা যে, ধনকুবেরগোষ্ঠী এ-টুকু বুঝতে আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি, সিনেমা ইত্যাদি প্রচারমাধ্যমগুলোর চিন্তার সর্বগ্রাসী প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তুর প্রতি ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। সাহিত্য, সংগীত, টিভি সিরিয়াল, সিনেমা, নাটক, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বার্থান্ধ, ভোগসর্বস্ব উত্তেজক সংস্কৃতির গন্ধ তৈরি করে মানুষের চেতনায় পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে 'ঈশ্বর' জাতীয় সেরা গুজবের ঘাস-বিচুলিকে কুশলী হাতে পরিবেশন করে মানুষকে 'হাম্বা' রবের চতুষ্পদীতে পরিণত করা হচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে নারী-পুরুষের পরস্পরকে

ভোগ করার সংস্কৃতি, উচ্ছৃঙ্খলতার সংস্কৃতি, ধর্ষণের সংস্কৃতি, সমকামীতার সংস্কৃতি, গুছিয়ে নেবার সংস্কৃতি, পেশিশক্তির সংস্কৃতি, ইভ-টিজারের সংস্কৃতি, ব্লু-ফিল্মের সংস্কৃতি, ব্যবসায়ী-মন্ত্রী-আমলা-পুলিশের অশুভ চক্রের দেওয়া-নেওয়ার সংস্কৃতি। পর্নো-পত্রিকা, সিনেমা পত্রিকা, সিনেমা ও টিভির বিজ্ঞাপনে শরীরকে অনাবৃত রাখার, যৌন আবেদনকে তীব্র করার যে অশুভ প্রতিযোগিতা—একে শুধুমাত্র সিনেমাস্টার থেকে মডেল গার্ল, পুরুষতান্ত্রিকতার ফল বলে চিহ্নিত করা যায় কি? যায় না। এই কোটিপতিরা প্রায় সকলেই কোটিপতি গোপন বেশ্যা।

কেউই বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া নারী নন। এরা সাধারণত আসে উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে। এরা ক্ষুধার অনিবার্য ফল নন। অপসংস্কৃতির অনিবার্য ফসল—যে অপসংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে রাষ্ট্রশক্তি ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীরা।

ভোগবাদী ও ভাববাদী চিন্তার সাঁড়াশি আক্রমণের পরও অনেক সময় প্রতিবাদী মানুষের চিন্তা এক থেকে বহুকে উদ্দীপ্ত করতে থাকে। শুরু হয় প্রতিবাদী সংস্কৃতির বিজয় অভিযান। শোষক ও শাসককুলের অজানা নয়, এমন প্রতিবাদী সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তাদের সর্বনাশের বীজ। আর তাই প্রতিবাদী সংস্কৃতিকে, রোখার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি ও তাদের সহায়ক প্রচারমাধ্যমগুলো প্রচারের আলোকে তুলে আনে মেকী প্রতিবাদীদের। এইসব ভণ্ড প্রতিবাদীরা চিন্তার প্রোটিনের ছদ্মবেশে চিন্তার বিনাশকারী ভাইরাস। একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলেই কিন্তু চেনা যায়। এইসব ভণ্ড প্রতিবাদী শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীদের স্পনসরের ভূমিকায় সর্বত্রই দেখবেন রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, ধনকুবের বণিকশ্রেণি বা প্রচারমাধ্যম— যার মালিক অবশ্যই বণিকশ্রেণিই।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে রাষ্ট্রশক্তি ও প্রচার মাধ্যমগুলোর তুলে আনা এক আধটি তথাকথিত প্রতিবাদী চরিত্রগুলোর প্রকৃত স্বরূপ একটু দেখি আসুন।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক অনিয়মিত বাংলা মাসিক পত্রিকা 'উৎস মানুষ'। (দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করা যাক সদ্য প্রয়াত এই পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।) পত্রিকাটি যারা মানুষের মনের উৎসে একই সঙ্গে যুক্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সোচ্চার। আমরা সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রকাশিত সংবাদ সূত্র থেকে জেনেছি কলকাতার প্রাক্তন মাননীয় মেয়র মার্কসবাদী আন্দোলনের নেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জাদুকর পি সি সরকারের কুসংস্কার বিরোধী সংগ্রামী প্রয়াসকে বাহবা দিয়ে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সি. পি. আই. এম. পার্টি ও তাদের শাখা সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' জাদুকর

সরকারকে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রজেক্ট করবে।

জাদুকর শ্রীসরকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। খুবই ভাল খবর। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি মানুষের যুদ্ধে নামা মানেই যেখানে সামান্য হলেও অগ্রগমন, সেখানে শ্রীসরকারের মত জনপ্রিয় মানুষটির অংশগ্রহণ তো একটা বড়সড় অগ্রগতি। এবার একটু খতিয়ে দেখা যাক জাদুকর শ্রীসরকারকে যুদ্ধ-বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে? না, যাত্রার আসরে? হাতের তরোয়াল ইস্পাতের? না টিনের?

জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) সত্যিই বেপরোয়া অকুতোভয় মানুষ। তিনি একই সঙ্গে ঘোষণা করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং সেই সঙ্গে সোচ্চারে ঘোষণা রেখেই চলেছেন—আত্মা, ভূত ও ঈশ্বরে তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা।

প্রমাণহীন আত্মা-ভূত-ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস রাখার জন্য শ্রীসরকারকে যখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া আরও কোন উপায় নেই, তখন তাঁকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হিসেবে 'প্রজেক্ট' করা নিশ্চয়ই দুর্নীতি। প্রকৃত যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবার প্রয়োজনেই প্রচারমাধ্যম ও রাজ্য সরকারকে দুর্নীতির পথটি বেছে নিতে বাধ্য করেছে। এদের সম্মিলিত সমর্থনে জাদুকর শ্রীসরকারের স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়েছে। তিনি তাঁর বিশ্বাসের পাশাপাশি গর্বিত ঘোষণা রেখেছেন, আগামী দিনে আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে।

একে কী বলব? যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কাড়ার চেষ্টা?

সুমন চট্টোপাধ্যায় জনপ্রিয় গায়ক। প্রচারমাধ্যম তাঁকে 'প্রতিবাদী' গায়ক হিসেবে প্রচার দিয়েছে এবং সে প্রচার বহুজনের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সুমন দিব্যি গাইছিলেন। ভালই গাইছিলেন। তারপর জনপ্রিয় হয়ে উঠতেই তাঁর ব্যাপার-স্যাপারই গেল পাল্টে। গানের ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চে দাঁড়িয়েই লুম্পেনকেও লজ্জা পাইয়ে দেওয়া ভাষায় নোংরা খিস্তি-খেউড়ের এক নতুন সংস্কৃতি তৈরির চেষ্টায় রত হলেন। সফলও হলেন। গানের আসরে (সময় : সন্ধ্যা, ২১ মার্চ ১৯৯৩; স্থান কলকাতার নজরুল মঞ্চ) এক সাংবাদিককে 'মাদার ফাকার' অর্থাৎ 'মাকে সঙ্গমকারী' বলে খিস্তি দিয়েও দর্শকদের কাছ থেকে পেলেন তীব্র ঘৃণার পরিবর্তে হাততালি। দর্শক-চিত্তে বিকৃত উত্তেজনার পরশ লাগানোর ফসলই এই হাততালি। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার গভীরভাবে ভাবুন—'সংস্কৃতির পীঠস্থান' বলে পরিচিত কলকাতায় থাবা বসিয়েছে এ কোন চতুর শৃগাল ও লোভী নেকড়ে? একই অঙ্গে

দুই রূপ! সুমনের খিস্তি-খেউড় এখানেই থেমে থাকেনি, বদ্ধ পচা জলার মত দুর্গন্ধ থাকে তাঁর রেওয়াজি খিস্তির দূষণ। এরপরও সুমন যখন গান ধরেন, "পাল্টে দেবার স্বপ্ন আমার এখনো গেল না", তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পাল্টে কোন সংস্কৃতি আনতে চান সুমনবাবু?

সুমনের এমন অশ্লীল সাংস্কৃতিক দূষণের বিরুদ্ধে, ভোগবাদী চিন্তার প্রসার প্রয়াসের বিরুদ্ধে একটি বাণিজ্যিক পত্রিকাও সোচ্চার হয়নি।

প্রতিবাদ আমাদের সমিতি করেছিল। অতীতে সুমন আমাদের কতটা প্রশংসা করেছেন, কতটা তোল্লাই দিয়েছেন, সেই সমস্ত আবেগ ও কৃতজ্ঞতাকে বিদায় করে দিয়ে সুমনের বর্তমান সুচতুর অবস্থান আমাদের দেশের সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকারক বিবেচনায় তাঁর কদর্য অশ্লীল ধ্বংসাত্মক শক্তির গতি রুদ্ধ করতে জনচেতনাকে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি—শেষ কথা বলেন জনগণ।

সুমনকে আমরা আরও নানা রূপে পেতে লাগলাম। ভোগবাদী সুমনের পাশাপাশি অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রচারক হিসেবেও সুমনকে আমরা পেলাম, তিনি গানের আসরে আত্মা নামাতে লাগলেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা বারবার গানের ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথনের মাঝে মাঝে গুঁজে দিতে লাগলেন। দুর্নীতির সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ঘুষ নেওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য হাজির করলেন (বসুমতী : ১৯৯৩-এর মহালয়ার বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে)।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার ভাবুন তো, 'প্রতিবাদী' সুমনের প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে? অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? না কি, তাঁর প্রতিবাদের ভানগুলো আসলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কিছুটা হাওয়া কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজনে? এই ভানের খোসা ছাড়ালে আমরা সেই সুমনকে পেয়ে যাব, যিনি চান, সামাজিক স্থিতাবস্থাকে জনগণ প্রশ্নহীনভাবে মেনে নিন আবেগের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে।

যুক্তিবাদীদের উদ্দেশে পত্র-পত্রিকার উপদেশামৃত

১৯৯৩-৯৪ সাল, 'যুক্তিবাদী সমিতি' তখন বাংলা প্রিন্ট মিডিয়ার কাছে অতি জনপ্রিয় নাম। নানা বাবাজী—মাতাজীদের ও জ্যোতিষীদের বুজরুকি ধরে বিরাট সাড়া ফেলে দিয়েছি বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে। মোড় ঘুরল ১৯৯৩-৯৪ সালে এসে। বউবাজারের যৌনব্যবসায়ীদের পুত্র-কন্যাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। তা নিয়ে বিশাল প্রচ্ছদ কাহিনি 'দেশ' পত্রিকায়। আমরা আরও একটু এগোলাম। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে দরিদ্র ও দলিত মানুষদের বোঝাতে লাগলাম—তাদের কী কী নাগরিক অধিকার সংবিধান দিয়েছে। জানিয়েছি—'দেশপ্রেম' মানে দেশের সংখ্যাগুরু—শোষিত-দলিত মানুষদের প্রতি প্রেম। বলেছি— 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানে

কোনও ধর্মের পক্ষে নয়, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' মানে রাষ্ট্র থাকবে সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' মানে যারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। পচনধরা সমাজে প্রতিটি সুস্থ মানুষই বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য।

১৯৯৩ তে বিবিসি-র চ্যানেল ফোর ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে এক ঘণ্টার একটি তথ্যচিত্র তুলল। তাতে ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে এক বিশেষজ্ঞের মতামত তুলে ধরা হল। মতামতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হল,

> "ভারতের বাম রাজনীতিতে একটা স্পষ্ট
> বিভাজন আছে—প্রবীর ঘোষের
> পক্ষে ও বিপক্ষে।"

হ্যাঁ, এই সময় বাম রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিল, মত বিনিময় করছিল, তাদের সবাইকে নিয়ে কমন প্রোগ্রামের ভিত্তিতে এক সঙ্গে চলার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আমাদেরই চেষ্টায়।

এই সময় দেখলাম এক নম্বর বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বড় বড় প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে আমাদের সমিতিকে জ্ঞান দিয়ে। তাতে বলা হয়েছে—যুক্তিবাদী সমিতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেবার কাজ করুক, বাবাজী-মাতাজী ধরুক। যুক্তিবাদী সমিতি বর্তমানে যে ভাবে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির কাজে নেমেছে, তা কখনই যুক্তিযুক্ত কাজ নয়।

আমরা বুঝলাম, ঠিক লাইনে আছি।

এরপর আরও একটি দৈনিক সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করল। বিষয়বস্তু—যুক্তিবাদী সমিতির কাজ-কর্ম কি হওয়া উচিত, কীভাবে হলে ভাল হয়, বিজ্ঞান আন্দোলনের সঠিক রূপরেখা কি হওয়া উচিত, ইত্যাদি নিয়ে। প্রবন্ধগুলির লেখকরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নামী-দামি।

প্রবন্ধগুলোতে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হয়েছে

(এক) : বিজ্ঞান আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়া (প্রিয়-পাঠিকারা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক এই সুরে, এই কথাই বলেন সরকারি সাহায্যপুষ্ট ও নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা হিসেবে গড়ে ওঠা প্রতিটি বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাই)।

(দুই) : ঈশ্বর বিশ্বাস, জ্যোতিষ বিশ্বাস জাতীয় মানুষের গভীর বিশ্বাসকে আঘাত দেওয়া অনুচিত (এ-বিষয়ে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র ও 'উৎস মানুষ' একই কথা বলে। উৎস মানুষ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৪ সংখ্যায় ২৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা

হয়েছে—ঈশ্বর বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলব না। "যেহেতু এই সংস্কার সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও অধ্যাত্মিক বোধ উন্মেষের কাজে সাহায্য করে, তাই এই সংস্কারকে আমরা কুসংস্কার বলব না")।

(তিন) : বিজ্ঞান আন্দোলনের সঠিক প্রয়োগ হলো—মডেল প্রদর্শনী, জমির উর্বরতা পরীক্ষায় সাহায্য, মৌমাছির চাষ, মাছ চাষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া (অর্থাৎ সমাজের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও আঘাত না করে, তাকে টিকিয়ে রেখে সরকারি প্রশাসনকে সাহায্যের মধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলনকে বন্দি করে রাখা। এমন আন্দোলনই করেন জনবিজ্ঞান ও গণবিজ্ঞানের নামের সরকারি সাহায্যে হৃষ্টপুষ্ট ও প্রভাবে ক্ষীণ সংগঠনগুলো)।

(চার) : যুক্তিবাদী সমিতির উচিত অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মকে আঘাত না দিয়ে জনসেবায় নিজেদের শক্তিকে ব্যয় করা, যেমন সেবার কাজ করে থাকেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (আমরাই তো জনগণের প্রকৃত সেবা করি, কারণ আমরা চাই শোষণমুক্ত সাম্যের সমাজ ব্যবস্থা। আর সেই লক্ষ্যেই তো আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্ম। কুসংস্কার মুক্তির কাজের পাশাপাশি নিপীড়িতদের আইনি সাহায্যও তো 'যুক্তিবাদী সমিতি' ও 'মানবতাবাদী সমিতি' নামের আমাদের এই সংগঠন দুটি দিয়ে থাকে। এরই পাশাপাশি আমাদের এই দুটি সংগঠন রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান, ফ্রি কোচিং-সেন্টার, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদিও করে থাকে। আরও বহু সংগঠনই সেবামূলক কাজ-কর্ম করে থাকেন। তাঁদের এইসব কাজ-কর্মের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়েও বলতেই হয়,

শেষ পর্যন্ত সেবা শোষিত জনতার শোষণমুক্তি ঘটাতে পারে না। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজা ভারতের শোষিত জনতার শোষণমুক্তি ঘটাতে পারবে না।

বরং এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবা পারবে জনসেবার আবেগে সিক্ত, কৃতার্থ জনগণের হৃদয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল ইত্যাদি ভ্রান্ত চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে, যেগুলো শেষ পর্যন্ত সাম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণকে সাহায্যের নামে, শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শোষক ও শাসকগোষ্ঠীকেই ওরা সাহায্য করে। অনেক সময় শাসক ও শোষকগোষ্ঠী এবং বিদেশি ধনকুবেরদের বিপুল অর্থ সাহায্যও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। জনসেবার আড়ালে এরা সেবা করে শোষক ও শাসকশ্রেণিরই এবং ভর্তি করে নিজের পকেট।

(পাঁচ) : সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী জিজ্ঞাসা ছুড়েছেন, মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত সংস্কৃতির খোলা হওয়া যখন সমস্ত মানুষ, সংগঠন ও দেশ গ্রহণ করেছে,

তখনও যুক্তিবাদীরা কেন নমনীয় না হয়ে হেতুহীন কট্টর! (আসলে যুক্তিবাদীরাই সবচেয়ে নমনীয়। যেখানে যুক্তি, সেখানেই যুক্তিবাদীরা নতজানু। কাল পর্যন্ত তথ্য, প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যে বিষয়কে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গ্রহণ করেছিলেন, আজ এই মুহূর্তে সেই তথ্য প্রমাণকে অসম্পূর্ণ বলে বাতিল করে দিয়ে অন্য কোনও তথ্য যদি প্রমাণসহ হাজির হয়, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষরা নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করবেন। যুক্তিবাদীদের কট্টরতা, অনমনীয়তা তাদের আদর্শের প্রতি। মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত সংস্কৃতি, কাদের স্বার্থে বাণিজ্য? কাদের স্বার্থে সংস্কৃতি? এ'সব না জেনে মুক্তকচ্ছ হওয়াটা শুধুমাত্র যুক্তিহীনই নয়, নির্বুদ্ধিতারও পরিচয়।)

হ্যালডেন-সত্যেন্দ্রনাথ-রাহুল সাংকৃত্যায়নকে সিস্টেমের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা

গত শতকের ৯-এর দশকের গোড়ার কথা। প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে আমরা এক নিশ্বাসে জেনে ফেলেছি তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও 'যুক্তিবাদী' ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ পালনের নানা খবর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেই এই তিন বিজ্ঞানীর নানা কাজকর্ম নিয়ে, তাঁদের নানা চিন্তাকে নিয়ে, তাঁদের যুক্তি-মনস্কতাকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে নানা প্রবন্ধ। এঁরা হলেন, প্রশান্ত মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জে. বি. এস. হ্যালডেন।

এই তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জন্মশতবর্ষ মহাসাড়ম্বরে পালনে মেতেছেন আমাদের রাজ্য সরকার এবং তৎসহ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান পত্রিকা। এদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করলে সরকারি অর্থ সাহায্যও মিলছে। একটা লক্ষণীয় বিষয় প্রত্যেকেই এঁদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এমনভাবে প্রজেক্ট করছেন যেন এই তিন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান আন্দোলন বা যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত মহান নাম। এঁরা বাস্তবিকই যদি আন্তরিকতার সঙ্গে, প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে করতেন—যুক্তি দিয়ে বিচার করে, শুধুমাত্র তারপরই গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত—তবে এভাবে প্রজেক্ট করা থেকে নিশ্চয়ই বিরত থাকতেন।

প্রশান্ত মহলানবিশ 'নিষ্ঠাবান' ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম বা পরমপিতায় বিশ্বাসী। আবার ব্রাহ্মধর্ম প্রেতচর্চা ও প্ল্যানচেটে বিশ্বাসী না হলেও প্রশান্ত মহলানবিশ বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্ল্যানচেটের আসরে উপস্থিতও থাকতেন। হাতের কাছে প্রমাণ পেতে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থ আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঈশ্বরে ও অলৌকিকত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক অলৌকিকবাদের চরণে মাথা ঠেকাতে তিনি যেতেন। সে'সব তাঁর ছাত্র-ছাত্রী বহু বিজ্ঞানীদেরই অজানা নয়। কিছু কিছু অলৌকিকবাবারা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভক্তি

গদগদ সার্টিফিকেট ও ছবি নিজেদের প্রচারমূলক বইতে ছেপে থাকেন।

জে. বি. এস. হ্যালডেন সম্পর্কে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা বলা হয় তা হল—"হ্যালডেন শুধুমাত্র একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সামাজিক দায়বদ্ধ এক মহান পুরুষ। সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ তাঁর আস্থা ছিল। "... একদিকে বিজ্ঞানের গবেষণা অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া, এই ছিল তাঁর আদর্শ।" (কথাগুলো হ্যালডেনের The Inequality of Man and other Essays"। নামের প্রবন্ধ সংকলন থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ 'মানুষের বিভিন্নতা'য় প্রকাশিত 'প্রকাশকের নিবেদন'-এর অংশ বিশেষ) যে কলম থেকে উৎসারিত হয় হ্যালডেনের সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ আস্থার কথা, সেই কলমই কিন্তু হ্যালডেনের ই. এস. পি. ও টেলিপ্যাথি বিশ্বাসে আমরণ আস্থা বিষয়ে নীরব থাকে। হ্যালডেনের নিজের কথায়, "আমি বুঝি না যে একজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী কেন পূর্বসিদ্ধভাবে টেলিপ্যাথি বা আলোকদৃষ্টির ঘটনা বলে যা দাবি করা হয় সেগুলির সম্ভাবনা অস্বীকার করবেন। আমি নিঃসন্দেহ, যেসব ঘটনার কথা বলা হয় সেগুলোর অধিকাংশ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রতারণার ঘটনা।" [The Marxist Philosophy and the Sciences গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'বিজ্ঞান ও মার্কসীয়দর্শন; জে. বি. এস. হ্যালডেন। প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন; ১৯৯০; পৃষ্ঠা-১০৭]

অর্থাৎ, হ্যালডেন বস্তুবাদীদের টেলিপ্যাথিসহ বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার না মানায় যথেষ্টই বিস্মিত এবং কিছুটা ক্ষুব্ধও। তাঁর মতে এ'সব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতারণা হতে পারে, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। কি সর্বনাশ! হ্যালডেন একই সঙ্গে মার্কসবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন, এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন।

হ্যালডেনকে আরও একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলে আশা করি আরও কিছু বিস্মিত হওয়ার খোরাক আমরা পাব। হ্যালডেন দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, "মন হলো দেহের একটি দিক এবং দেহ ছাড়া মন থাকে একথা মনে করবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।" আবার সেই সঙ্গে এও মনে করতেন, "মনের প্রকৃতি যদি শরীরের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় তার অনুসিদ্ধান্ত হবে প্রত্যেক ধরনের মানবমন ইতিপূর্বে অনন্তবার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। শরীর যদি মনের নিয়ামক হয় তাহলে বস্তুবাদ অনন্তজীবনের ধারণা থেকে বিশেষ কিছু পৃথক নয়। আমার নিজের মন বা আত্মার অনুরূপ মন বা আত্মা অনন্তকাল ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরে থাকবে।" (মানুষের বিভিন্নতা, হ্যালডেন; চিরায়ত প্রকাশন; ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭৭)

হ্যালডেনের এই অমর মন ও অনন্তবার সৃষ্টিতত্ত্ব (যা জন্মান্তরজাতীয় চিন্তা মাত্র) কোনও পরিপ্রেক্ষিত—বিচ্ছিন্ন চিন্তা নয়। বরং স্পষ্টতই এই উক্তি তাঁর মূল

চিন্তাধারার সঙ্গে অতিমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হ্যালডেনকে যখন বিভিন্ন মহল থেকে 'বস্তুবাদী' বলে প্রচার করা হচ্ছে, তখন হ্যালডেনের লেখায় আমরা পাচ্ছি, "আমি নিজে বস্তুবাদী নই, কারণ বস্তুবাদ যদি সত্য হয় তাহলে আমার ধারণা আমরা জানতে পারি না যে সেটা সত্যি। আমার মতামতগুলি যদি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চলতে থাকা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হয় তাহলে সেগুলি নির্ধারিত হয় রসায়নের নিয়মে, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মে নয়।" (মানুষের বিভিন্নতা, হ্যালডেন, পৃষ্ঠা-৬৮) এর পরেও হ্যালডেনকে বস্তুবাদী, মহান মার্কসবাদী বলে প্রজেক্ট করা কি নীতিগর্হিত নয়? মিথ্যাচারিতা নয়? উদ্দেশ্যমূলকভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নয়?

রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপনে এগিয়ে এসেছে বহু সংগঠন, প্রধানত বাম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করা সংগঠনগুলো। রাহুল সাংকৃত্যায়নকেও একইভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, 'মার্কসবাদী' 'বস্তুবাদী' ইত্যাদি বলে। এ কথাও ঠিক, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ভারতীয় দর্শনে ও মার্কসীয় দর্শনে সুপণ্ডিত। কিন্তু কেউ কোনও বিষয়ে সুপণ্ডিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে সে সেই বিষয়ে আস্থাশীল। ধনবাদী আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ অনেক বুদ্ধিজীবীই মার্কসবাদে সুপণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্য তাঁরা মার্কসবাদকে উৎখাত করার কাজেই নিয়োজিত করেছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মার্কসবাদে পাণ্ডিত্যকে যাঁরা মার্কসীয় দর্শনের প্রতি ও বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি গভীর আস্থার নিদর্শন বলে মনে করেন, তাঁরা হয় এটা ভুলে যান, নতুবা ভুলে থাকতে চান যে রাহুল মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। রাহুল একই সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনে আস্থাশীল এবং চ্যূত বৌদ্ধদর্শনে আস্থাশীল—এটা হয় কী করে? আমার মাথায় ঢোকে না। কারণ বৌদ্ধদর্শন অতি স্পষ্টতই অ-বস্তুবাদী দর্শন।

আজ ভেবে দেখার সময় হয়েছে—কেন প্রচারমাধ্যমগুলোর বশংবদ বুদ্ধিজীবীরা এমন কিছু চরিত্রকে 'আদর্শ' 'বিজ্ঞানমনস্ক' ও 'বস্তুবাদী' হিসেবে জনসাধারণের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তুলে ধরছেন; যাঁরা একই সঙ্গে 'বিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদী', 'বিজ্ঞান আন্দোলক ও অধ্যাত্মবাদী', 'বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী' ইত্যাদি! আমরা নিশ্চয়ই এইসব বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের মূলগতভাবে অশ্রদ্ধেয় মনে করি না, বা অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি প্রচারের ষড়যন্ত্রের অংশীদার বলেও মনে করি না। বরঞ্চ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ও স্মরণ করাই একজন যুক্তিবাদীর পক্ষে উচিত বলে মনে করি। কিন্তু তাঁদের যা যা সীমাবদ্ধতা (এবং আমরা দেখলাম, যেগুলো প্রত্যেকটাই মারাত্মক) সেগুলোকে পাশে সরিয়ে রেখে তাঁদেরকে একতরফাভাবে 'যুক্তিবাদী', 'বিজ্ঞানমনস্ক', 'সমাজসচেতন' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে ভক্তি গদগদ প্রচারের কারণ কী হতে পারে? এই ধরনের

প্রচারের ফলে সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, তেমনই নির্বিচারে ব্যক্তিপুজোর মইতে চড়ে ঐ সীমাবদ্ধতাগুলোই চরম যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার নিদর্শন হিসেবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। ফলে যুক্তিবাদী ধ্যানধারণা তথা আন্দোলন তাতে করে পিছিয়ে যাবে হাজার বছর। কেন এই অসুস্থ প্রবণতা? এই অসুস্থ প্রবণতা কি সমাজ-বিচ্ছিন্ন ঘটনা? অস্বচ্ছ চিন্তার ফসল? নাকি বৃহত্তর কোনও সুগভীর চক্রান্ত বা পরিকল্পনারই অঙ্গ? 'ব্রেন-ওয়্যার' বা চিন্তা-যুদ্ধের সাহায্যে সাম্য-চিন্তাকে নিঃশব্দে ধ্বংস করার যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন ধনবাদী দেশের বিত্তবানেরা, এইসব অসুস্থ চিন্তার বপন কি সেই স্বপ্নেরই ফলশ্রুতি নয়?

যুক্তিবাদী দর্শনকে আটকাতেই কি এমন বিভ্রান্তিতে ভরা চরিত্রগুলোকে 'মহান', 'যুক্তিবাদী', 'বস্তুবাদী' ইত্যাদি বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে না?

ভাববার সময় এসেছে বন্ধু। শত্রুর শক্তিকে হালকা ভাবে না নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময়।

শুধু অতীতে চরিত্রগুলোকেই এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে না, বর্তমান সময়ের একই অঙ্গে যুক্তিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী', 'ঈশ্বরবিশ্বাসী যুক্তিবাদী', 'ভূত বিশ্বাসী যুক্তিবাদী', 'জ্যোতিষে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী', 'ঘুষের দুর্নীতিতে বিশ্বাসী প্রতিবাদী', 'পুরুষকে ঘৃণা করা মানবতাবাদী' ইত্যাদির উপর প্রচারের আলো ফেলা হচ্ছে—এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এক্ষুণি কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—আপনারাও তো প্রচার চান! উত্তরে বলব—নিশ্চয়ই চাই। তবে তা আদর্শের প্রচার; আমাদের মতাদর্শের প্রচার। এবার কেউ কেউ বলবেন—আপনারা প্রচার তো পানও! উত্তরে বলব, আদর্শ বেচে, দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতাসর্বস্ব শ্রেণির তাঁবেদারি করার সুবাদে প্রচারের আলোয় থাকার চেয়ে আদর্শ না বেচে প্রচার পাওয়া যেমন অতি কঠিন, তেমনই অতি উত্তম। আমরা বার-বার এই কঠিন পথ ধরেই প্রচারের ছিটেফোঁটা পেয়েছি। আদর্শে আপসহীন থাকার পরও আমাদের খবর প্রচার-মাধ্যমগুলো যখন প্রচার করে, তখন তার মধ্য দিয়ে আমাদের আন্দোলনের গুরুত্ব ও শক্তি যে প্রমাণিত হয়, সেটা যে কেউ বুঝবেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বানভাসি আবেগ ও নির্বিচার ভালোবাসা, ব্যক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে শাণিত যুক্তির নিরিখে বিষয়টিকে আগাপাশতলা বিশ্লেষণ করুন।

অধ্যায় সাত

সব আন্দোলনই সিস্টেম ভাঙার আন্দোলন নয়

গত কয়েক বছরে আমরা বিভিন্ন ধরনের দাবি আদায়ের আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখেছি। 'চিপকো', 'নর্মদা বাঁচাও'র মত বিভিন্ন দাবি বা ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এইসব আন্দোলনের নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়তা আছে, এগিয়ে থাকা সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে এদের নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু এইসব আন্দোলন যেহেতু 'সিস্টেম' পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে জনমানসকে সমাবেশিত করতে পরিচালিত নয়, তাই সমাজ কাঠামো জিইয়ে রাখার অংশীদার রাজনৈতিক দল, প্রচারমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিরা দলগত-স্বার্থ, ব্যক্তিগত-স্বার্থ, ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক সময় এই জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করেন।

অসাম্যের সমাজকাঠামো ভাঙতে...

প্রিয় সহানুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকা, আপনারাই পারেন 'সিস্টেম' নামের শোষক-শাসক-প্রচারমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের দুর্নীতির আঁতাতকে আঘাতে আঘাতে গুঁড়িয়ে দিতে। আপনাদের ঘৃণাই পারে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পা'গুলোকে ভেঙে ফেলতে।

প্রিয় সংগ্রামের সাথীরা, এরই সঙ্গে মনে রাখতে হবে একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা—অতীত ইতিহাস আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্রক্ষমতা বদলের ক্ষেত্রে, সমাজ কাঠামো পাল্টে দেবার ক্ষেত্রে সফলতা এসেছে তুলনামূলকভাবে সহজে, যখন সমাজ কাঠামোর সমর্থক শক্তির মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে টেনে আনা গেছে তাদেরই একটা অংশকে।

নকশালপন্থী দলের সদস্য না হয়েও তাদের আদর্শকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসতে দেখেছি বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের। সেটা ছিল গত শতকের ছ'য়ের দশকের শেষ লগ্নে ও সাতের দশকের গোড়ার ঘটনা। সেদিন নকশালপন্থীদের পরিকল্পনার মধ্যে একটা বড় ভুল ছিল। এই শিল্পী-সাহিত্যিক- বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে

একটি প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়নি। ভুল, কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইলে সশস্ত্র আঘাত হানার জন্য সংগ্রামী বাহিনী নামাবারও আগে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বাহিনীকে নামানো। একথা সমস্ত শ্রেণির ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য।

আমরা দেখেছি, পূর্ব ইউরোপের মার্কসবাদী দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া চালিয়ে গিয়েছিল মার্কসবাদ-বিরোধী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রক্রিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে চালাতে তারা সহযোগিতা নিয়েছিল সেইসব মার্কসবাদী দেশের বুদ্ধিজীবীদের, প্রচার মাধ্যমগুলোর, শাসক শ্রেণির ও প্রশাসনের মধ্যেকার কিছু কিছু দুর্নীতির ঘুণপোকায় কাটা মানুষের। ওইসব দেশে ধৈর্যের সঙ্গে লাগাতার ভাবে মার্কিন সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে। ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে। মানুষের চেতনায় নিরন্তর উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপনের খোরাক পাঠানো হয়েছে। এইসব উত্তেজনার, এইসব ভোগসর্বস্ব চিন্তার এমনই মাদকতা যে মানুষ তখন আত্ম-সুখের বাইরে কিছু ভাবতেই চাইবে না। 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের আখের গোছানোর এই চিন্তার মধ্য দিয়েই তারা পরিচালিত হবে। বৃহত্তর সমস্যার প্রতি, অন্যের সমস্যার প্রতি তাকিয়েও দেখবে না, দেখতেই চাইবে না।

সেই সঙ্গে ওইসব দেশে অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকেও পাঠানো হয়েছে। কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, খ্রিস্ট সবাই এসে আসর জাঁকিয়েছে। ক্ষমতার ঘুণপোকায় শাসকদের সাম্য-চিন্তাকে কখন যে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, টেরই পাওয়া যায়নি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভাবেই টের পাওয়া যায়নি, চেতনা কখন লোভী হয়েছে। লোভী চেতনার কিছু শাসকই নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করতে, অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থার দিকে সমাজের চাকাকে ঘোরাতে এইসব ভোগবাদী ও অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি আমদানি করতে দিয়েছে। তারপর এক সময় আমরা দেখলাম মার্কিন সংস্কৃতির গন্ধে মাতাল হতে মার্কসবাদী দেশের পুলিশ ও সেনাকে। ফলে মার্কসবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করতে মার্কিন গোয়েন্দা সি. আই. এ'রা বোমা, গোলা, বারুদ কিছুই প্রয়োগ করল না। প্রয়োগ করল 'মগজ ধোলাই' ও সমাজ কাঠামোর সিংহাসনের পায়াগুলোর মধ্যে সরাসরি বিভাজন করার ব্রহ্মাস্ত্র। আর তাইতেই হুড়মুড় করে একের পর এক মার্কসবাদী সাম্রাজ্য বসে পড়ল।

অস্বীকার করার উপায় নেই সর্বত্র নাক গলানোর ব্যাপারে সি. আই. এ-র যেমন জুড়ি নেই, তেমনই চিন্তাকে একমুখী করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারেও তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সবার কাছ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। চিন্তার অন্ধত্বে আবদ্ধ না থেকে শেখার মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হলে অবশ্যই অনেক কিছুই শেখা যায়। সি. আই. এ-র ঘটানো ঘটনাগুলো থেকে আমরা অবশ্যই একটা শিক্ষা নিতে পারি, একটা সত্যে পৌঁছাতে পারি—জনচিন্তাকে একমুখী করে ও অসাম্যের সমাজ কাঠামোর সহায়ক শক্তিগুলোর মধ্যে থেকেই আমাদের আদর্শের

সমর্থক বন্ধু সংগ্রহ করে, এই সমাজ কাঠামোকে ধসিয়ে দেওয়া যায়। বিশ্ব-ত্রাস রাষ্ট্রশক্তির মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার করা যায়।

এই শিক্ষাকে আমরাই বা কেন কাজে লাগাতে পারব না। আমরাও যদি জনচেতনাকে বঞ্চিত মানুষদের পক্ষে একমুখী করি তবে, আমাদের দেশের সরকারই বা গণেশ উল্টোবে না কেন, ভারতবর্ষের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী সামরিক শক্তির সাহায্য নিয়েও যখন গণ-বিদ্রোহের মুখে পূর্ব ইউরোপের মার্কসবাদী দেশগুলোকে পিছু হটতে হয়েছে, তখন ভারতের ক্ষেত্রেও একমুখী গণ-বিক্ষোভের মুখে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করা যাবে না কেন?

সাংস্কৃতিক চেতনাকে এক-মুখী করে ভোগবাদী ও ভাববাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করে জনগণকে যদি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামানোর কাজটি সি.আই.এ সার্থকভাবে পালন করতে সমর্থ হয়, তবে আমরাই বা কেন বঞ্চিত মানুষদের চেতনাকে সুস্থ-সংস্কৃতির খাতে বইয়ে জনগণকে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামাতে পারব না?

যাঁরা তোতাপাখির মতই আউড়ে যান—"সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামই আনতে পারে শ্রেণি-মুক্তি", তাঁরা অবশ্যই বিশ্বের তাবৎ ঘটনার থেকে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখেন শুধুমাত্র বইয়ের পাতায়। জীবন থেকে শিক্ষা নেবার পরিবর্তে এঁরা শিক্ষা নিতে চান শুধুই ছাপার অক্ষর থেকে। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাববাদও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দাঁড়িয়ে নেই শোষণের প্রক্রিয়াগুলো। জিততে গেলে বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থেই শোষণের আধুনিকতম কৌশলগুলোকে বুঝতে হবে, শোষকদের বিরুদ্ধে আধুনিকতম কৌশলগুলোরই প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য যতই স্থির থাকুক, আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে মান্ধাতার আমলের অস্ত্র নিয়েই লড়াই চালানো যায় না। এখানে অস্ত্র বলতে বোঝাচ্ছি—'মগজ-ধোলাই' নামক শক্তিশালী অস্ত্রের কথা। এই অস্ত্রের কার্যকারিতা ও সাফল্য প্রশ্নাতীত বলেই আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তিই অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছে।

যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে একটা বিভেদের পাঁচিল তুলে দেন, তাঁরা চোখটি খুলে দেখতে চাননি সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কাল্পনিক বিভেদের পাঁচিল বার বারই ভেঙে পড়েছে।

দুই আন্দোলনকর্মীরাই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

একটা লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকলে সৎ নেতারাও বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে উঠতেই পারে। আখের গোছানো, স্বজনপোষণ ইত্যাদি দুর্নীতি ঘাড়ে চাপতেই পারে এমনটা পূর্ব ইউরোপের মার্কসবাদী দেশগুলোর নেতাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে মানুষের চিন্তাকে একমুখী করে তোলা সম্ভব, মানুষকে মোটিভেট করা সম্ভব—এটা আজ প্রমাণিত সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি—বিপ্লবের আগে, বিপ্লব কালে এবং বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম।

নিপীড়িত মানুষদের চিন্তাকে একমুখী করতে, দ্রুত ও সফলতার সঙ্গে করতে বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের আদর্শের খবর পৌঁছে দিতে হবে, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। চেষ্টা আন্তরিক হলে কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানুষকে এই কাজে সঙ্গে পাওয়া যাবেই, যেমন আমরা পেয়েছি। আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা বলে, শাসক, প্রশাসন, পুলিশ সবার মধ্যে থেকেই সাম্যের সমাজ গড়ার আদর্শের সমর্থক পাওয়া যায়। কঠিন হলেও পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় বলেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে অনেক অসম লড়াই আমরা জিতে চলেছি।

শেষ লড়াইও জেতা যায়, এবং তা আমরা জিতবই। অসাম্যের এই সমাজ কাঠামো ভেঙে, নতুন সমাজ কাঠামো আমরা গড়বই।

তৃতীয় পর্ব
জাতিস্মরদের নিয়ে সত্যানুসন্ধান

অধ্যায় : এক

হিন্দু ছাড়া কেউ জন্মান্তর মানে না

হিন্দু উপাসনা ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে আত্মা 'অজ', অর্থাৎ জন্মহীন; 'নিত্য' অর্থাৎ অমরা আরও মনে করে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই ধর্ম-জাত-ভাষা নির্বিশেষে আত্মার এই ধর্ম চিরন্তন সত্য।

প্রাচীন আর্য-বা হিন্দুরা একটিমাত্র স্বর্গে বিশ্বাসী ছিলেন, এই স্বর্গের নাম ছিল 'ব্রহ্মলোক', অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মের রাজ্য। প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পর আত্মা ব্রহ্মলোকে যায়।

পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে এল কর্মফল। বলা হল, যারা ইহলোকে ভাল কাজ করবে, তারা তাদের ভাল কর্মফল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে থাকবে। তারপর আবার ফিরে এসে জন্ম নেবে পৃথিবীতে আপন কর্মফল অনুসারে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, চন্দ্রলোকেই পিতৃপুরুষের আত্মারা থাকে। চাঁদ থেকেই প্রাণের বীজ ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে।

হিন্দুরা গোড়ার দিকে 'নরক' বিশ্বাস করতেন না। পরে, ভয়ের দ্বারা মানুষকে ধর্ম মেনে চলতে, ভাল কাজ করতে, গোষ্ঠীজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু নীতি মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য সৃষ্টি হল নরকের। প্রাচীন যুগের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের শোষণ করার ব্যবস্থাকে কায়েম করতে সৃষ্টি করল কর্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ তত্ত্বের। এই তত্ত্বে বলা হল—সামাজিক বৈষম্য অন্যায় কিছু নয়, কারণ বঞ্চিত মানুষটির গতজন্মের কর্মফলেই এ জন্মে এই অবস্থা। বলা হল—সামাজিক বৈষম্য না থাকলে তোমার এজন্মের কষ্টকে রমণীয়ভাবে বরণ করে নেওয়ার পুরস্কার আগামী জন্মে পাবে কী করে? পুনর্জন্ম নিয়ে ভারতীয় সাহিত্য ছান্দোগ্যতে বলা হয়েছে, "যাঁরা রমণীয় স্বভাবসম্পন্ন তাঁরা অবশ্যই রমণীয় যোনি, ব্রাহ্মণ যোনি, ক্ষত্রিয় যোনি বা বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হবেন এবং যারা দুরাচারী (অর্থাৎ ধর্মীয় আচার-অনুশাসন মান্য করে না) তারা অবশ্যই সারমেয়, বরাহ অথবা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হবে।" (ছান্দোগ্য; ৫/১০/৭)

কৃষক ও দাস সম্প্রদায়ের মাথায় ঢোকানো হল এ'জন্মে প্রতিবাদহীনভাবে বঞ্চনা

নামক কর্মফলকে মেনে নিলে আগামী জন্মে মিলবে বৈভব। উচ্চবর্ণের মানুষ এক সময় বুঝতে পেরেছিল কৃষক ও দাস সম্প্রদায়কে পুনর্জন্ম ও কর্মফলের আশায় ভুলিয়ে রাখতে পারলে ওরা বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না।

ইতিপূর্বে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছিল ধর্মের অনুশাসন, বর্ণাশ্রম মানে, বর্ণ অনুসারে তাদের নির্দিষ্ট ছিল কাজ। শূদ্রদের কাজ ছিল উচ্চতর তিনটি বর্ণের সেবা। এই শূদ্রদের মধ্যে পড়ত কৃষক, শ্রমিক ও দাস। কৃষক, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা ছিল! দাসদের পারিশ্রমিক বা বেতন দেওয়া হত না। কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিকদের বেতন এমনই ছিল যাতে তারা অতি মোটা কাপড়ের দ্বারা যৎসামান্য লজ্জা নিবারণের নামে প্রায় উলঙ্গ থাকে এবং আধপেটা খেয়ে শুধু জীবনটা ধরে রাখে। শূদ্রদের এই ধরনের অর্ধউলঙ্গ ও আধপেটা খাইয়ে রাখার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় আইন-কানুনের বিভিন্ন গ্রন্থে—যাদের সাধারণভাবে বলা হয় 'স্মৃতিগ্রন্থ'। প্রায় বিনাখরচে শ্রমশক্তি বিনিয়োগের প্রয়োজনেই উচ্চবিত্তেরা সৃষ্টি করেছিল 'শূদ্র' নামের বর্ণটি। উচ্চবর্ণের লোকেরা শূদ্রদের 'মানুষ' বলে বিবেচিত হওয়ার সব অধিকারই কেড়ে নিয়েছিল। তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ধর্মীয় অধিকার, না অর্থনৈতিক অধিকার। এই অধিকারহীনতার ফলে শূদ্ররা প্রভুশ্রেণির উপদেশ ও নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত হত। 'স্মৃতি গ্রন্থ'গুলোর উপদেশ প্রভুরা শোনাত শূদ্রদের—তারা ঈশ্বরের বিধান মত বর্ণ মেনে প্রভুর সেবা করলে, প্রভুর সম্পদে লোভ না করলে মৃত্যুর পর যে জন্ম হবে, সেই জন্মে সুখ ভোগ করবে। তারা এজন্মে যে কষ্টভোগ করছে, তা পূর্বজন্মের কর্মফল মাত্র।

ভারতবর্ষে দাসপ্রথা ছিল, কিন্তু কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে এই বিরাট দেশের কোথাও দাস বিদ্রোহ হয়নি, যেমনটা হয়েছে অন্যান্য বহু দেশে। এর ঐতিহাসিক কারণটি হল—পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম বিশ্বাসেই জন্মান্তর ও অতীত জন্মের কর্মফল লাভের কথা নেই।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন—বিশ্বের যে কোনও ধর্মের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা পাপ বা পুণ্যফল হিসেবে অনন্ত দুঃখ বা অনন্ত সুখ ভোগ করে। এখানে অনন্ত মানে, সীমাহীন, যার শেষ নেই। যিশু আত্মাকে অমরত্ব দান করেছেন। যিশুর জন্মের আগে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মাদেরও মৃত্যু হত। খ্রিস্টধর্ম হিন্দুদের পুনর্জন্ম তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করে।

প্রাচীনপন্থী গোঁড়া খ্রিস্টানরা মনে করেন, অমরত্ব ও নিত্যতা আত্মার স্বভাব

ও ধর্ম নয়। এঁরা মনে করেন অমরত্ব লাভ করা যায় ভাল কাজ ও যীশুর প্রতি বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ। প্রাচীনপন্থী খ্রিস্টানরাও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না।

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ সমস্ত মানুষ তৈরি করে শ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আত্মা (নফ্‌স) ও প্রাণশক্তি (রূহ)। আত্মা থাকে হৃদয়ে। যাঁরা আল্লার নির্দেশ মেনে চলেন, তাঁদের আত্মাকে আল্লাহ্ নিয়ে এসে বেহেস্তে স্থান দেন। বেহেস্তে আছে গাছের ছায়া, বয়ে চলেছে জলের নদী, দুধের নদী, মধুর নদী ও সুরার নদী। বেহেস্তের চিরযৌবনা হুরী-পরীরা পুণ্যাত্মাদের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় সুরায়। যাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করেন, তাঁদের আত্মা স্থান পায় 'দোজখ' বা নরকে। আত্মারা এই স্বর্গসুখ বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত। হাজার হাজার বছর ধরে যত মানুষ মারা গেছে, সব ধর্মের সব মানুষদের বিদেহী আত্মার পুনরুত্থান হবে শেষ বিচারের দিনটিতে। মুসলিমরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না।

ইহুদিরা বিশ্বাস করেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা জেহোভা। আত্মা ও প্রাণবায়ু তাঁরই সৃষ্টি। আত্মা কখন কোথায় জন্মাবে, কখন দেহত্যাগ করবে, সবই জেহোভার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। মানুষ ও জেহোভার মাঝখানে আছেন দেবদূতরা। দেবদূতরা জেহোভার বার্তাবহ। কোনও রমণী গর্ভবতী হলে দেবদূত প্রাণের বীজ ও আত্মা নিয়ে হাজির হন জেহোভার কাছে। জেহোভা হবু জাতকের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেন। ইহুদিরা তাই বিশ্বাস করেন ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত এবং কোনওভাবেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ইহুদিরা মনে করেন, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল জেহোভার গুণগানে সময় কাটানো। মৃত্যুর পর আত্মা ও প্রাণবায়ু ফিরে যায় জেহোভার কাছে। ইহুদিরা জন্মান্তরবাদে ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন না।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা ও ঈশ্বরের নিত্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্য অনিত্যতা। বেদ শাস্ত্রের উপর বৌদ্ধধর্ম বিশাল আঘাত হেনেছিল। আর্য ও হিন্দুরা বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মানুষের রচনা নয় বলে ঘোষণা করেছিল। তাদের মতে বেদ অনাদি, এর কোনও আরম্ভ নেই। কোনওকালে পরিবর্তিত হবে না। বেদ সত্যপ্রতিষ্ঠ, স্বতঃপ্রমাণ। বেদ যা বলেছে, সবই চিরন্তন সত্য। বেদের উক্তি সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ প্রকাশও অপরাধ। বেদ মানুষের রচিত নয়, তাই এতে ভুল বা প্রতারণা নেই।

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের শেষ। বেদের শেষাংশ উপনিষদ। উপনিষদভিত্তিক যে দর্শন, তাই বেদান্ত-দর্শন। বৌদ্ধ-দর্শন বেদের নিত্যতা, অনাদিত্য অপৌরুষেয়ত্ব সব কিছুকেই অস্বীকার করল। বৌদ্ধ দর্শন বলল—সত্যকে জানতে হবে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে—যুক্তি-তর্ক-বিচারের মাধ্যমে।

বেদের চতুর্বর্ণ ভেদ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা, আত্মাতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল বৌদ্ধ-দর্শন। বলল, মানুষের জীবনে আছে ব্যাধি

জরা মৃত্যু। এগুলো অনতিক্রম্য। অনিত্য এই ক্ষণিক জীবনে শান্তি আনতে পারে সমস্ত প্রাণীর প্রতি ভালবাসা এবং সংযমী ও নৈতিক জীবনযাপন। তবে এ কথাও ঠিক—দুঃখবাদকে বৌদ্ধধর্ম বড় বেশি রকম গুরুত্ব দিয়েছিল, এবং দুঃখের মূল কারণগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছিল। বুদ্ধের মতে দুঃখের কারণগুলো ছিল জৈবিক—জন্মের সূত্র ধরেই মানুষের জীবনে আসে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। বুদ্ধের সময় যে দাস প্রথা ছিল, শূদ্র নামক নিম্নবর্ণের শোষণ ছিল তাদের দুঃখের কারণ যা জৈবিক নয়—সামাজিক, সে বিষয়ে বৌদ্ধ-দর্শন ছিল নীরব।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর একশো বছর নাগাদ বৌদ্ধ ধর্ম স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। পরবর্তীকালে এই দুটি শাখা আরও বহুভাগে বিভক্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাবেরই ফলস্বরূপ এসেছে জাতক কাহিনি ও জন্মান্তরে বিশ্বাস। কিন্তু আদি বৌদ্ধ দর্শনে জন্মান্তরের কোনও প্রশ্নই নেই, যেহেতু আত্মাই অনিত্য।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি, জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের একটি অন্ধ ও আরোপিত বিশ্বাস, পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণহীন, প্রমাণহীন বিশ্বাসমাত্র।

এখনও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একটু গভীরভাবে ভাবুন তো, আপনার এই বিশ্বাসের পিছনে কী যুক্তি আছে? আপনার কি মনে হচ্ছে—গীতা, বেদ, উপনিষদ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ অধ্যাত্মবাদীদের সব কথাই সত্যি? তবে আর একবার ভাবুন তো—আপনি যদি জন্মাতেন কোনও খ্রিস্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ বা ইহুদি পরিবারে, তবে পরিবারের পরিবেশ থেকে এই বিশ্বাসের মধ্যেই বেড়ে উঠতেন—পুনর্জন্ম একটি ভ্রান্ত ধারণা।

আত্মা ও পুনর্জন্ম নিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের বিভিন্নতা ও বিরোধই প্রমাণ করে-এ'সবই প্রমাণহীন বিশ্বাসমাত্র।

অধ্যায় : দুই

আত্মার অস্তিত্বে আঘাত হেনেছিল চার্বাক দর্শন

ভারতীয় দর্শনকে বিশ্লেষণ করে মূল ও সংক্ষিপ্ত যে চিত্রটা আমরা পেতে পারি, তা এই রকম :

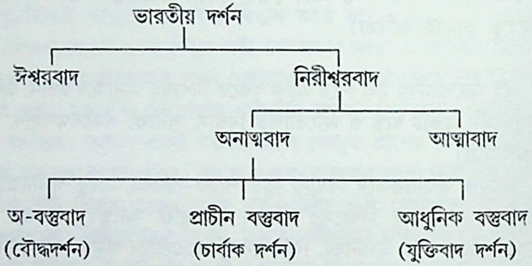

চার্বাক দর্শন

আগে আমরা অনাত্মবাদী বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব অনাত্মাবাদী এবং ভারতের প্রথম বস্তুবাদী দর্শন চার্বাক দর্শন নিয়ে। এই চার্বাক দর্শনেরই আর এক নাম লোকায়ত দর্শন।

প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনটির নামটা নিয়ে একটু আলোচনা স্বল্প পরিসরে সেরে নিলে বোধহয় অনেকের কিছুটা কৌতূহলও মেটানো যাবে এবং আত্মা প্রসঙ্গে যে দর্শনের মতামতের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাইছি, তার বিষয়েও কিছু বলা হবে।

'চার্বাক' কথাটা কোথা থেকে এল? অনেক দার্শনিকের মতে 'চারু + বাক্' থেকে চার্বাক কথাটা এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির কথা মাথায় রেখে যে দর্শন 'চারু' বা সুন্দর কথার জাল বুনে 'ইহ জগতেই সব কিছুর শেষ, মৃত্যুর পরে অন্য কোনো জগৎ বলে কিছু নেই, অতএব ভোগ কর' বলে মানুষদের

চিত্ত আকর্ষণ করেছে, সেই দর্শনই চারু + বাক্ বা চার্বাক দর্শন।

অন্য মতে 'চর্ব' (অর্থাৎ চর্বণ) করে যে—এই অর্থে চার্বাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যায় তারা বলতে চান—চর্ব-চোষ্য খানা-পিনার মধ্যেই জীবনের চরমতম সার্থকতা যে দর্শন খুঁজে পায়, সে দর্শনই চার্বাক দর্শন।

ব্যাকরণ মানতে গেলে দুটো মতকেই বাতিল করতে হয়। 'চারু + বাক্' থেকে 'চারুবাক্' অথবা 'চার্বাক' বা 'চার্বাক্', কোন অবস্থাতেই 'চার্বাক' নয়। অথচ প্রাচীন প্রতিটি লেখাতেই আমরা দেখতে পাই 'চার্বাক'-এর 'ক'-এ হসন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।

আবার 'চর্বণ করে যে' সে চার্বাক' নয় চার্বক', অর্থাৎ 'ব'-এ আ-কার হবে না।

পালি সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত রিস ডেভিডস (Rhys Davids)-এর ধারণায়—মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাক-এর নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির নাম রাখেন চার্বাক দর্শন। মহাভারতে আছে—চার্বাক ছিল দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু আর এক দুরাত্মা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বিজয়ী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী চার্বাক জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাক-এর আসল পরিচয় জেনে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।

প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার সৃষ্টির জন্যই এমন এক রাক্ষস চরিত্রের নামে দর্শনটির নাম রেখেছিলেন।

সে যুগের কিছু ভাববাদী চার্বাক দর্শন বা লোকায়ত দর্শনকে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণে আছে—অসুরদের পরাক্রমে বিধ্বস্ত দেবকুলকে রক্ষা করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন বৃহস্পতি। অসুরদের ধ্বংসের জন্য, অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত দর্শন রচনা করলেন, তারপর অসুরের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। ফলে নীতিভ্রষ্ট, ভ্রান্ত অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হল।

এখানেও দেখতে পাই—বস্তুবাদী দর্শনই অসুরদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, এমন প্রচারের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির স্পষ্ট চেষ্টা।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকেরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে 'লোকায়ত' নামে অবহিত করার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন—দর্শনটি ইতর লোকের দর্শন, তাই 'লোকায়ত' দর্শন।

এখানেও ভাববাদী দাশনিকদের লোকায়ত দর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট।

অনেক পাঠক-পাঠিকার মনেই এ-চিন্তা নিশ্চয়ই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে কী এমন কথা বলা হয়েছে, যা অবহেলায় পাশে সরিয়ে দেওয়ার

সাধ্য সে যুগের রথী-মহারথী দার্শনিকদের ছিল না? স্পষ্টতই ভয় থেকেই ভাববাদী রথী-মহারথীরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ আক্রমণ হেনেছেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের দর্শনটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর মতো মহাকাব্যগুলোতেই ঢুকে পড়েছে অনেক কাহিনি। অনেক নীতিকথা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের দিকে তাকান। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে। ভরত এলেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্য- পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন :

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥

অর্থাৎ "আশা করি তুমি লোকায়তিক (যুক্তিবাদী) ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মারে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সংকেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে পশুজীবনের বহু কষ্টের কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন, অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সঞ্চয় করে এই মানবজন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম মানবজীবন, বিশেষত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মলাভের পরেও কেউ কি পারে সে-জীবন ধ্বংস করতে? অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শিয়াল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু সে-জন্মে চূড়ান্ত মূর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়ালজন্ম।

চূড়ান্ত মূর্খের মত মহাপাতকের কাজটা কী? এ-বারই বেরিয়ে এল নীতিকথা—

অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম।।
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্।।
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ।।

(শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ-সমালোচক তর্কবিদ্ পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচারসভায় ছিলাম যুক্তির প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কি না

পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দর্শনের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 'উপনিষদ' সাহিত্যে। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বা বস্তুবাদী যুক্তিবাদের সূচনা সঠিক কবে হয়েছিল বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'পঞ্জিকা'তে বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই।

কমলশীলের গুরু শান্তরক্ষিত নিজের মতের সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি দর্শনগ্রন্থ রচনা করে। তাঁর রচনায় দেখতে পাই বস্তুবাদী যুক্তিবাদী দর্শনকে তিনি 'চার্বাক' না বলে 'লোকায়ত' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

শান্তরক্ষিত থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দার্শনিকের রচনায় 'লোকায়ত' বা 'চার্বাক' নামের যুক্তিবাদী দর্শনটির উল্লেখ দেখতে পাই। সে-সময় ভারতীয় দর্শনের প্রথামত পরমত খণ্ডন করেই নিজের মত স্থাপন করা হতো। পরমত হিসেবেই এইসব ভাববাদী দার্শনিকেরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক দর্শন বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দর্শন যা ছড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল মানুষের মুখে মুখে। অলিখিত এই ছড়াই লোকগাথার রূপ পেয়েছিল।

আত্মা অবিনশ্বর হলে তবেই মৃত্যুর পর আসে স্বর্গ বা নরক ভোগের প্রশ্ন, জন্মান্তর পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদির প্রশ্ন। আত্মা নশ্বর হলে এইসব প্রশ্নই অর্থহীন হয়ে যায়।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে আত্মার বিষয়ে এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যেগুলো ইতরজন বা সাধারণের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। যুক্তিবাদী এই দর্শনে আত্মা বা চৈতন্যকে দেহধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বক্তব্যই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের সুদীর্ঘ লড়াই চলেছিল শুধুমাত্র আত্মা 'অমর' কি 'মরণশীল' —এই নিয়ে।

লোকায়ত দর্শন মতে—কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অমর আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ বলে চার্বাক দর্শন মনে করলেও তারা প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানকেও মর্যাদা দিয়েছিল। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুমানের মূল শর্ত অবশ্যই হবে 'পূর্ণ প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে অনুমান। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীতে মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান কখনই হতে পারে না।

ভাববাদীদের চোখে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল সামান্য অথবা অবান্তর। তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, 'ঋষি' নামধারী ধর্মগুরুদের মুখের কথাকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে—যার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবিদ্যা।

আজও যাঁরা বলেন, "বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং অধ্যাত্মবিদ্যা এবং অধ্যাত্মতত্ত্বই 'পরম বিজ্ঞান', তাঁরা এটা ভুলে যান—প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপটিতে পা রাখাই সম্ভব নয়।

লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল—চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। দেহ ধ্বংস হওয়ার পর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অজ্ঞান ও ধূর্তদের কল্পনা মাত্র।

লোকায়ত দর্শনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে যুক্তি রেখেছিলেন তা হল—লোকায়ত দর্শনের মতে দেহের মূল উপাদান, জল, মাটি, আগুন, বায়ু ইত্যাদি ভূত-পদার্থ। এই প্রতিটি ভূত-পদার্থই জড় বা অচেতন পদার্থ। তাহলে এই অচেতন পদার্থে গড়া মানুষের মধ্যে চেতনা আসছে কোথা থেকে? আসছে নিশ্চয়ই এই সব অচেতন পদার্থের বাইরে থেকেই। অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত —চৈতন্য বা আত্মা দেহের অতিরিক্ত একটা কিছু। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য বহু অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক যে-সব তর্কের ঝড় তুলেছেন, তাঁদের অনেকের বক্তব্যেই শঙ্করাচার্যের এই যুক্তির সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—জড় বা অচেতন পদার্থের গড়া দেহ তো সরল যুক্তিতে অচেতনই হবার কথা। তবে মানুষের চৈতন্য আসছে কোথা থেকে?

লোকায়ত দর্শন এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্তিও হাজির করেছে—মদ তৈরির উপকরণগুলোতে আলাদা করে বা মিলিত অবস্থায় কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোকেই এই ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলন ঘটানোর পর সম্পূর্ণ নতুন এক গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও একই জাতীয় ঘটনা।

লোকায়তিকদের চৈতন্যের সঙ্গে মদশক্তির তুলনা নিয়ে কোন বিপক্ষ দার্শনিকই কূটতর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে, তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এনেছেন মৃতদেহের তুলনা। চৈতন্য যদি দেহেরই লক্ষণ বা ধর্ম হয়, তবে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকার কথা, থাকে না কেন? মৃতদেহও দেহ।

লোকায়ত দর্শনের আত্মা বা চৈতন্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এটাই সবচেয়ে জোরালোতম যুক্তি।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের এর বিপক্ষে জোরালো কোন যুক্তি হাজির করতে পারেনি। প্রাচীনকালের পটভূমিতে শারীরবিদ্যার অনগ্রসরতার যুগে এই ধরনের যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ বিজ্ঞানের তথা শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানব। যেটুকু-জেনেছি, তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দেহ ও মৃতদেহের ধর্ম সমান নয়। চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া।

মৃতদেহের ক্ষেত্রে মৃতদেহেরই অংশ মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষেরও যেহেতু মৃত্যু ঘটে, তাই স্নায়ুকোষের ক্রিয়াও ঘটে না, ফলে মৃতদেহের ক্ষেত্রে চৈতন্য বা চিন্তা থাকে অনুপস্থিত।

লোকায়ত দর্শনে আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যেগুলোর তীক্ষ্ণতা এ যুগের যুক্তিবাদীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মত। দু-একটা উদাহরণ তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদিও নিশ্চিতভাবে জানি আমার অক্ষম বাংলা তর্জমায় মূল শ্লোকগুলোর রস অনেকটাই শুকিয়ে যাবে।

উদাহরণ ১ : ব্রাহ্মণ জীবিকা হেতু করেছেন শ্রাদ্ধাদি বিহিত।
এ-ছাড়া কিছুই নয় জেনো গো নিশ্চিত।।

উদাহরণ ২ : যদি, শ্রাদ্ধকর্মে হয় মৃতের তৃপ্তির কারণ।
তবে, নেভা প্রদীপে দিলে তেল উচিত জ্বলন।।

উদাহরণ ৩ : পৃথিবী ছেড়ে যে পঞ্চভূতে
তার পাথেয় দিতে পিন্ডদান বৃথা।
যেমন, ঘর ছেড়ে যে গ্রামান্তরে
তার পাথেয় (খাদ্যবস্তু) ঘরে দেওয়া বৃথা।।

উদাহরণ ৪ : চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা?
তবে তো পিন্ডদান নেহাতই বৃথা।।

উদাহরণ ৫ : যদি, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে।

তবে, পিতাকে পাঠাতে স্বর্গে
ধরে-বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে॥

উদাহরণ ৬ : ভন্ডরা পশুর মাংস খেতে চান।
তাই তাঁরা দিয়েছেন বলির বিধান॥

বুদ্ধের যুগের পর চার্বাক দর্শনের বিকাশের কোনও খবর আমরা পাইনি। বরং আমরা দেখতে পেলাম, যে শোষিত সাধারণ মানুষদের উপকারের জন্য চার্বাক দর্শন আত্মাবাদ ও ঈশ্বরবাদকে শাণিত যুক্তিতে খণ্ডন করেছিল, সেই শোষিত সাধারণ মানুষই একসময় চার্বাক দর্শনকে এক নীতিহীন দর্শন বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এমনকি 'চার্বাক' শব্দটিকে লোকে গালাগাল বলেও ভাবতে শুরু করেছিল। অনুমান করতে একটুও অসুবিধে হয় না, চার্বাক বিরোধীদের সুচতুর মগজ ধোলাইয়ের ফলেই সাধারণ মানুষ ভুল করেছিল।

সময় এগিয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় জটিলতা বেড়েছে। কিন্তু আজও শোষিত মানুষদের শোষণ ব্যবস্থার পথ মসৃণ রাখতে মগজ ধোলাই একইভাবে চলছে। নানারূপে এবং ব্যাপকতরভাবেই চলছে। হাজির হচ্ছে শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরবাদী যুক্তিবাদী, আত্মাবাদী যুক্তিবাদী, ঈশ্বরবাদ ও আত্মাবাদে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী, ঈশ্বর ও আত্মার অনস্তিত্ব বিষয়ে মুখ না খোলা, মুখর না হওয়া যুক্তিবাদী। এইসব বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদীরা চান—ঈশ্বরবাদ থাক, অধ্যাত্মবাদ থাক এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির কথা-টথাও থাক। এমনতর বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদীদের দুটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এক: গদি দখলই একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা, রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা হিসেবে তৈরি বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থাগুলো। দুই : রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনের চারটি পায়ার একটি পায়া যে প্রচারমাধ্যম তার অকৃপণ সাহায্য বা স্পনসরশিপ পেতে উদগ্রীব প্রতিভা।

এইসব বুদ্ধিবাদীদের যুক্তিবাদ স্পষ্টতই ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদকে সুরক্ষিত করার এক 'বাদ' বা 'দর্শন'।

অধ্যায় : তিন

তবু জাতিস্মর ঘুরে ফিরে আসে

নেই। তবু আসে। পত্রিকা ব্যবসা করতে নিয়ে আসে। মানুষ অদ্ভুত কিছু ভালোবাসে বলেই ওরা নিয়ে আসে। মানুষ চিরকালের জন্য মরতে চায় না বলেই ওরা নিয়ে আসে। মানসিক রোগ ও অজ্ঞতার হাত ধরে ওরা আসে। লোভী মানুষ সম্পত্তির লোভে নিয়ে আসে। শোষক, শাসক ও তাদের সহায়ক বুদ্ধিজীবীরা জন্মান্তর ও কর্মফলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে নিয়ে আসে। যখন আসে, প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়েই আসে। সঙ্গে কখনও সখনও সম্পাদকীয়ও যুক্ত হয়— "জন্মান্তরকে যেমন বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া উচিত নয়, তেমনই কোনও গবেষণা না করেই তা উড়িয়ে দেওয়াটাও হবে অযৌক্তিক। জন্মান্তরবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি ও তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে গবেষণা শুরু করাই হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাজ।" এক ধাক্কায় তিরিশ হাজার সার্কুলেশন বাড়ে। আহাম্মক বা বদমাইস ছাড়া কোনও বিজ্ঞানীই এমন ওঁচা বিষয় নিয়ে গবেষণায় নামবে না, এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিশ্চিত সম্পাদক চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা ও দ্বিধার দোলায় দুলিয়ে দেয় জনগণকে। কিন্তু বিক্রি তো বাড়ে! সম্পাদকের কর্মদক্ষতায় তাঁর ওপর একই সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রশংসা ও ঈর্ষা।

জাতিস্মররা হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক

ছোটবেলা থেকেই আমরা পুরাণের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এক নাগাড়ে শুনতে শুনতে বিশ্বাস করতে শুরু করি—আত্মা অমর। মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না। আমরা আবার জন্মাই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধার করতে পারে। যারা পারে, তাদেরকেই বলে জাতিস্মর।

আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের মত দুই দক্ষ কথা-শিল্পীর লেখায় জাতিস্মরের বিস্ময়কর কাহিনি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। জাতিস্মররা গল্প-উপন্যাসের পাতা ছেড়ে উঠে এসেছে পরামনোবিজ্ঞানী (প্যারাসাইকোলজিস্ট) নামধারী একদল বিজ্ঞান-বিরোধী বোকা বা অসৎ মুখোশধারী বিজ্ঞানীদের তথাকথিত গবেষণায়। ধর্মগুরুদের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে—কর্মফল, জন্মান্তর ও জাতিস্মর সূর্যের মতই শাশ্বত। খবরের কাগজের খবরে বার বার স্থান করে নিয়েছে নানা জাতিস্মরের

আবির্ভাব কাহিনি। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই হতবাক (?) প্রতিবেদকের একই ধরনের জবানবন্দি, "তার কথার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাচ্ছে তার অতীত জীবন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য....আজগুবি খবর বলে প্রথমে যাকে উড়িয়েই দিতে চেয়েছিল আমার সন্দিগ্ধ মন, পরিপূর্ণ তদন্ত শেষে সেই আমাকে বাধ্য করছে জন্মান্তরবাদকে চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিতে...আধুনিক বিজ্ঞানও ওকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কিছুটা বিমূঢ় হবে" ইত্যাদি প্ররোচিত করার মত নানা বাক্যবিন্যাস।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী দাবি করেন, তাঁরা সম্মোহন করে কিছু কিছু সম্মোহিত ব্যক্তির স্মৃতিকে পিছোতে পিছোতে পূর্বজন্মের দিনগুলোতে নিয়ে যেতে পারেন।

মনোবিজ্ঞান মনে করে, কোনও একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মোহন করে তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে আবার উদ্ধার করা বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব। একটা কথা বললে হয়তো অদ্ভুত শোনাবে, স্বাভাবিক মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের অধিকারী মানুষদের ক্ষেত্রে 'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই। আমাদের স্মৃতি-শক্তির একটা পর্যায় হল সংরক্ষণ (Retention)। শেষ পর্যায়ে আছে স্মরণ (Recall)। যা দেখি, যা শুনি, সে-সব সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের কারুরই কোনও ঘাটতি নেই। যেটুকু ঘাটতি বা ত্রুটি দেখা যায়, তা শুধুই স্মরণের ক্ষেত্রে। মনোবিজ্ঞান সম্মোহনের সাহায্যে স্মরণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর তত্ত্বকে, বা চলতি কথায় বলতে পারি সম্মোহন করে অতীত স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে কখনই মেনে নেয়নি।

পরামনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব মতই আত্মার শরীর নেই, মস্তিষ্কও নেই। মস্তিষ্ক না থাকলে মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষও নেই। মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ না থাকলে স্মৃতি জমা থাকবে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পরামনোবিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, এবং তাঁরা দিতেও পারেননি। তাই মনোবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান পরামনোবিজ্ঞানের পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেনি।

তবে সম্মোহিত করে কাউকে তথাকথিত জাতিস্মর করা সম্ভব। বিষয়টা বুঝিয়ে বলছি। ধরা যাক রাম মণ্ডল নামের মৃত একটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে এই ধারণা সঞ্চারিত করা হল যে, সে গত জন্মে ছিল রাম মণ্ডল। আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল শ্যামাসুন্দরীকে। থাকত বারাসতে। দেওয়াল-ঘেরা বড় বাগানবাড়ি। পুকুর ছিল। পুকুরের সামনের তালগাছে একবার বাজ পড়েছিল। ছেলে ছিল দশটি, মেয়ে দুটি। পেশা ছিল ডাকাতি। বাগান বাড়িতেই ছিল এক কালী-মন্দির। লোকে বলত ডাকাতে-কালী। তবে কেউ পুজো দিতে এলে তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগত না। একবার পা ভেঙেছিল। তারপর সাতান্ন বছর বয়সে পুলিশের গুলিতে প্রাণ যায়।

এ'বার কিছু সাক্ষী-সাবুদের সামনে লোকটিকে আবার সম্মোহন করে তার গত

জন্মের বিষয় জানতে চাইলে সে মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে সঞ্চারিত ধারণার কথাই বলে যাবে।

তারপর ওকে নিয়ে বারাসতে ঘোরাঘুরি করলে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাবে পূর্বজন্মের বহু ঘটনা।

সম্মোহন জানেন এমন কেউ জাতিস্মরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই ধরনের প্রতারণা করলে করতেই পারেন।

মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে কেউ আমার এই জাতীয় বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হতে পারেন অনুমান করে বহু থেকে একটিমাত্র উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মহিলাদের জনপ্রিয় পাক্ষিক 'সানন্দা'র সহ-সম্পাদক সুদেষ্ণা রায় ও সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত নিবেদিতাকে সম্মোহিত করেছিলাম সানন্দার বহু সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহকের সামনে সম্পাদকের ঘরে। সঞ্চারিত ধারণা মত সুদেষ্ণা ভেবেছিলেন তাঁর ওপর সত্যজিৎ রায় ও রাজীব গান্ধীর আত্মার ভর করেছেন। এবং সেই বিশ্বাসে তিনি মিডিয়াম হিসেবে উত্তর দিয়েছেন, এমনকি রাইটিং প্যাডে লিখেও উত্তর দিয়েছেন। নিবেদিতা ভেবেছিলেন তাঁর উপর ভর করেছেন উত্তমকুমার। আর সেই বিশ্বাসে তিনি অন্যান্য সাংবাদিকদের হাজির করা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। (এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে আগেই বর্ণনা করেছি।) সম্মোহন করে আধা-ঘুম, আধা-জাগরণের অবস্থায় একজনকে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে বহু কথা জানা যায়, এমনকী বহু গোপন করে রাখা কথাও। যেমনটা নার্কো টেস্টে অ্যানেসথিশিয়ারা শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ প্রয়োগ করে আচ্ছন্ন অবস্থায় নিয়ে গিয়ে অনেক সত্যি বলিয়ে নেওয়া হয়। সম্মোহন করে সত্যি বলা যায় একটি ঘটনার উল্লেখ আছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। জল-ভূত নিয়ে সে এক বিচিত্র কাহিনি।

সম্মোহনকে কাজে লাগিয়ে একজনকে তথাকথিত জাতিস্মর করে তোলা ছাড়া আরও দু'ধরনের জাতিস্মর দেখা যায়। এক : মানসিক রোগী। দুই : প্রতারক বা প্রতারকদের দ্বারা পরিচালিত।

সম্মোহন করে একজনের মস্তিষ্কে কোনও মৃত মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার তথ্যাদি ঢুকিয়ে না দিলেও দেখা যায় কিছু কিছু মানুষ হঠাৎ দাবি করে, তার পূর্বজন্মের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা চালালে দেখা যাবে তথাকথিত পূর্বজন্মের জীবনের অনেক তথ্যই সত্যি। এর কারণ ভূতে পাওয়া বা ঈশ্বরের ভরের মতই জাতিস্মরও একটা মানসিক রোগমাত্র। সাধারণভাবে এইসব জাতিস্মরের দাবিদার মানসিক রোগীরা অল্পবয়স্ক, কল্পনাপ্রবণ এবং আবেগপ্রবণ। এদের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের স্থিতিস্থাপকতা, সহনশীলতা এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা কম। সামাজিক, পারিবারিক ও পরিবেশগতভাবে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। কোনও একজনের মৃত্যুঘটনা এদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ওই মৃত মানুষটির বাড়ি,

পরিবেশ, পরিবার, শৈশব, কর্মক্ষেত্র, পোশাক, মুদ্রাদোষ ইত্যাদির বিষয়ে একনাগাড়ে ভাবতে থাকলে, বিশেষ কিছু মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ বারবার উত্তেজিত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় সে বিশ্বাস করে ফেলে—আমি গতজন্মে ছিলাম ওই মৃত মানুষটি। অর্থাৎ এই সময়ে সে নিজের সত্তার মধ্যে অন্যের সত্তাকে অনুভব করে। এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত জাতিস্মরের মা-বাবা যদি ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হয়ে মনোরোগ চিকিৎসকদের সাহায্য নেন, তবে রোগী তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।

আবার এই পরিস্থিতিতে অনেক মা-বাবা সন্তানকে বিখ্যাত করার তাগিদে এবং নিজেরা বিখ্যাত হবার উৎসাহে অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছেয় কিছু কিছু অসত্য কথা যুক্ত করে প্রমাণ করতে চান, তাঁদের সন্তান বাস্তবিকই জাতিস্মর।

আবার অনেক সময়ই দেখা যায় বিখ্যাত হবার জন্য, অথবা পূর্বজন্মে ধনী পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ সন্তানকে হাজির করে ধনীর কিছুটা ধন টেনে নেবার পরিকল্পনা নিয়ে কেউ কেউ তাদের সন্তানদের মাথায় মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনের অনেক তথ্য ঢোকায়। তারপর শিশুকে সফল জাতিস্মর হিসেবে হাজির করতে পরিবারের অনেকেই অভিনয় করে, যার আর এক নাম প্রতারণা।

জানি, তাত্ত্বিকভাবেই জাতিস্মরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যেমনভাবে সম্ভব নয় ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্ব, তবু জাতিস্মরের খবর পেলেই বার বার ছুটে যেতে বাধ্য হই। "মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের দেওয়াল ভেঙে যুক্তির আলো আনবই"—এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে যায়। বারবার ওদের অজ্ঞতা ও মিথ্যাচারিতার মুখোশ খুলতে খুলতে মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে চাই প্রশ্ন। আর বিশ্বাস করি এই প্রশ্নই একদিন মানুষকে সত্যের সন্ধান দেবে।

অধ্যায় : চার

জাতিস্মর কাহিনির প্রথম পর্যায়

এ'বার আমরা 'আত্মা ও 'জাতিস্মর'-এর অনস্তিত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার খোলস ছেড়ে প্রয়োগের দিকে নজর দেব। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, 'আত্মা' ও 'জাতিস্মর' প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনও এক জাতিস্মর কাহিনিকে টেনে এনে প্রশ্নকর্তা এ'বিষয়ে সরাসরি আমাদের মতামত জানাতে বলেন।

জানতে চাওয়ার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সাধারণত জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতাও একান্তভাবেই খাঁটি। তাঁদের এই জানতে চাওয়া কাহিনিগুলো সাধারণভাবে মাত্র কয়েকটি কাহিনির মধ্যেই আবর্তিত হয়।

আলোচনার এই শেষ পর্যায়ে আমরা প্রচলিত সেই সব জনপ্রিয় ও সাড়া জাগানো জাতিস্মর কাহিনি নিয়েই আলোচনা করব। এই কাহিনিগুলোকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করব। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অতি বিখ্যাত, আমাদের দেশে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনাগুলো। এ'গুলো নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাব। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখব জনপ্রিয় কিন্তু আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার নিরিখে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত কিছু কাহিনিকে। তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করব অবতারদের পুনর্জন্ম নিয়ে গড়ে ওঠা রোমাঞ্চকর কিছু কাহিনি। এই পর্যায়ের অবতাররা অবশ্যই আন্তর্জাতিক পরিচিতির অধিকারী।

আসুন আমরা এ'বার প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় ঢুকি।

জাতিস্মর তদন্ত ১ : দোলনচাঁপা

দোলনের কথা

দোলনচাঁপা মিত্রের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার প্রথম অনুরোধ জানান আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ। সময়টা ১৯৮০-র জানুয়ারি কলকাতার আকাশবাণী ভবনে এক প্রযোজকের ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সম্ভবত আমার উপস্থিতির কারণেই আড্ডার আলোচনাটা এক সময় মোড় নিয়েছিল তথাকথিত নানা অলৌকিক ঘটনা নিয়ে। এরই মাঝে এক সময় এল দোলনচাঁপার কথা। পার্থ জানালেন, দোলনচাঁপা

তাঁর পরিচিতা। দীর্ঘ বছর ধরেই দোলনদের পুরো পরিবারকেই চেনেন পার্থ। দোলন নাকি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। ওর ওই জাতিস্মর-ক্ষমতা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বেশ কিছু বছর আগে একটা খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রবক্তা লোকেশ্বরানন্দ দোলনের জাতিস্মর ক্ষমতার দাবিকে 'যথার্থ' বলে সমর্থন করায় বিষয়টা খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।

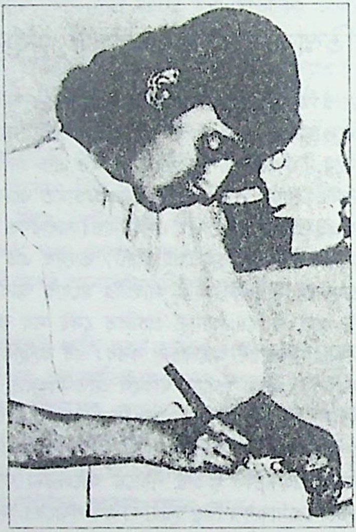

দোলনচাঁপা

পার্থ আরও জানালেন, "আপনি তো যুক্তিবাদী, সত্যানুসন্ধানী। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখুন না, বাস্তবিকই ঘটনাটা কী! এবং তারপর আপনার মতামত জনসাধারণকে জানান।"

দোলনের খবর আমার চোখে প্রথম পড়েছিল ১৯৮০ সাল নাগাদ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্যারাসাইকোলজিস্ট, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের প্রধান আয়েন স্টিভেনসন (Ian Stevenson)-এর লেখা 'কেসেস অফ দ্য রিইন্‌কারনেশন টাইপ' (Cases of The Reincarnation Type) বইয়ের প্রথম খণ্ডে প্রচণ্ড গুরুত্ব পেয়েছে দোলনের কেসটি।

১৯৮৮-র এপ্রিলের এক বিকেলে হাজির হলাম মানিক মিত্রের অফিসে। মানিকবাবু তখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টারের সিনিয়র

লেকচারার। ভাল নাম ঔদার্যময়, তবে মানিক নামেই বেশি পরিচিত। মানিকবাবু কাটিহারের ছেলে। চাকরি জীবন শুরু করেছিলেন পাটনাতে পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক হিসেবে। ১৯৫৮ সালে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যোগ দেন। '৬২তে বিয়ে করেন কণিকাকে। '৬৩ সালে জন্ম হয় ছেলে জয়ন্ত'র। ৮ আগস্ট '৬৭তে দোলনের জন্ম। সন্তান বলতে এই দুটিই।

ফর্সা টুকটুকে ছোট্ট দোলন এক বছর বয়সে কথা বলা শুরু করেছিল। দু'বছরের মধ্যেই স্পষ্ট কথা বলতে শিখে ফেলল। রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের মধ্যেই মানিকবাবুর কোয়ার্টার। হাজারো রকমের গাছ-গাছালিতে ঘেরা আশ্রমের পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে উঠতে লাগল দোলন। তিন বছর বয়স থেকে দোলনের পোশাক-পরিচ্ছদের ভাললাগার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেলেন মা কণিকা। দোলন ফ্রক পরতে চায় না। ছেলেদের মত প্যান্ট-শার্ট পরার প্রতিই ওর তীব্র আগ্রহ। সুন্দর ও দামি ফ্রকের চেয়ে দাদার বেঢপ মাপের প্যান্ট-শার্ট পরেই ওর আনন্দ।

১৯৭১-এর গরমকালের এক দুপুর। দোলনকে দাদার প্যান্ট পরে থাকতে দেখে মা একপ্রস্থ খুব বকা-ঝকা করলেন, "এ কি উদ্ভট্ স্বভাব! মেয়েদের পোশাক না পরে সব সময়ই ছেলেদের পোশাক পরা?"

লেখকের সঙ্গে বাবা ও মা

দুপুরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে মা ডাকলেন, "আয় দোলন আমার পাশে শুবি আয়।"

দোলন ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিল, "আমি তোমার পাশে শোব না। তুমি মোটেই

ভাল মা নও। আমাকে খুব বকো। আগের মা আমাকে খুব ভালবাসত।"

মেয়ের কথা শুনে হেসে ফেলেন কণিকাদেবী। "তোর আগের মা আবার কেউ ছিল নাকি?"

"ছিলই তো। সেই মা'কে দেখতে তোমার চেয়েও সুন্দর। কত গয়না পরত। আমাকে কত আদর করত। কখনও বকত না।"

"তোর সেই মা এখন গেল কোথায়?" হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন কণিকাদেবী।

"কোথায় আবার? নিজের বাড়িতেই আছে।"

"নিজের বাড়ি মানে? তোমার আগের মা'র নিজের বাড়ি কোথায়?"

"বর্ধমানে। ওখানে আমাদের মস্ত একটা লাল বাড়ি আছে।" ছোট্ট দোলন ঘাড় দোলাল।

"ওখানে আর কে কে থাকে রে?" কণিকা জিজ্ঞেস করলেন। "বাবা থাকেন। আমার আগের জন্মের বাবা, বাবাও আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি তো আগে ছেলে ছিলাম। আমার কত প্যান্ট-শার্ট ছিল। আমরা তো খুব বড়লোক ছিলাম।"

"ঠিক আছে, আগের জন্মে তুই ছেলে ছিলি। এ'বার তো মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, তাই মেয়েদের পোশাক পরতে হয়। আয় শুবি আয়।"

অভিমানী মেয়ের তাও অভিমান ভাঙে না। মায়ের কাছে এসেও দোলন গজ্-গজ্ করে। "জানো, আমাদের মোটর গাড়ি ছিল। আমি মোটরে করে স্কুলে যেতাম; কলেজে যেতাম। আমাদের বাড়ির কাছে একটা মন্দির ছিল। বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। আমার এক বন্ধু ছিল—রঞ্জিত।"

একরত্তি ছোট্ট মেয়ের মুখে ওইসব কথা শুনে মা কেমন যেন ঘাবড়ে যান। তারপর মনকে সায় দেন, ও'সবই বাচ্চাদের কল্পনা।

প্রথম সাক্ষাৎকারে কণিকাদেবীই আমাকে এ'সব কথা বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, "ওই দিনের পর থেকে দোলন যেন কেমন পাল্টে গেল। সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকত, চিন্তায় ডুবে থাকত। চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। প্রায়ই বর্ধমানের বাড়ির কথা বলত। সে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বায়না দরত। ওর আগের জীবনের অনেক কথাই বলত। বলত—আমার নাম ছিল বুল্টি। একবার আমার অসুখ করেছিল। মাথায় ব্যথা হত। হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতালের বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। পায়ে ব্যথা লেগেছিল।"

"কোন্ হাসপাতালে ছিলি? মায়ের প্রশ্নের উত্তরে দোলন জানিয়েছিল, "কোলকাতার হাসপাতালে।"

দোলন একটু একটু করে বুল্টির জীবনের অনেক কথাই জানিয়েছিল। ফুটবল খেলত, ক্রিকেট খেলত। বাড়ির কাছেই একটা মন্দির ছিল। বাড়িতে হরিণ ছিল, ময়ূর ছিল। নীল ডোরাকাটা একটা শার্ট ছিল। বাড়ি ছিল বর্ধমান শহরে।

দোলনের কথার মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় ছিল, যা মানিকবাবু ও কণিকাদেবীকে চিন্তিত করে তুলেছিল। দোলন কি তবে সত্যিই জাতিস্মর? এতদিন ধর্মগ্রন্থ ও অধ্যাত্মবাদের বইয়ের পাতাতেই শুধু পড়েছেন জন্মান্তরের কথা। সেই চরম বিশ্বাসকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে তাঁদের বাড়িতেই জাতিস্মরের জন্ম হয়েছে! ভগবানের কি অপার লীলা!

যত দিন যাচ্ছিল দোলনের মধ্যে বর্ধমানে যাওয়ার আকুতি ও যন্ত্রণা ততই তীব্রতর হচ্ছিল। এমন একটা পরিস্থিতিতে বাস্তব ঘটনাকে জানার আগ্রহে মানিকবাবু ঠিক করলেন, দোলনকে নিয়ে বর্ধমান যাবেন।

মানিকবাবু ও কণিকাদেবী দোলনকে নিয়ে প্রথম বর্ধমান গেলেন '৭১-এর অক্টোবরে। বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদের কাছে ওকে ছেড়েও দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও দোলন তার পূর্বজন্মের বাড়ি খুঁজে বের করতে পারল না। সে'দিনই দোলনকে নিয়ে ওর মা-বাবা নরেন্দ্রপুর ফিরে এলেন।

দোলনের খুব মন খারাপ। ভালোমত খায় না। মাঝে মাঝে নিজের মনে কাঁদে আর কান্না-ভেজা গলায় মা-বাবাকে অনুরোধ করে—আর একটি বার বর্ধমানে নিয়ে চলো। এই সময় থেকে দোলন তার মাথার পিছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে।

নীলাচল সামন্ত বর্ধমানের মানুষ। সম্পর্কে বম্বের সিনেমাওয়ালা শক্তি সামন্তের ভাই। চাকরি করেন নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে। মানিকবাবুর বন্ধু। দোলনের কথাগুলোকে পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকে উৎসারিতর কথা ভেবে তিনিও মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তিনি মানিকবাবুকে জানালেন—বর্ধমান মহারাজার বাড়ির কাছেই একটি ধনী পরিবার থাকেন। সেই পরিবারের চারু দে তাঁর পরিচিত। সেই সুবাদে পরিবারের অনেক কিছুই তাঁর জানা। ওই পরিবারের একটি ছেলের নাম ছিল বুল্টি। ভাল নাম নিশীথ দে। নিশীথ মাথার ব্যথায় ভুগছিল। সম্ভবত ব্রেন-টিউমার হয়েছিল। কলকাতায় এসেছিল চিকিৎসা করাতে। তারপর মারা যায়। বুল্টি মারা গেছে ১৯৬৪-তে, দোলনের জন্মের তিনবছর আগে। বুল্টির বাবা অনাথশরণ দে বর্তমানে পরিবারের কর্তা। বুল্টি ছিল অনাথবাবুর বড় ছেলে। মেজ শিশির। ডাক নাম ন্যাড়া। তিন মেয়ে। নাম যথাক্রমে শ্যামলী, জ্যোৎস্না ও রীতা।

নীলাচল সামন্তর স্ত্রী স্বপ্নাও বর্ধমানের মেয়ে। নিশীথ দে'র আত্মীয় পৃথ্বীশচন্দ্র দে'র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। সেই সুবাদে স্বপ্না বুল্টি ও তার পরিবারের অনেক হেঁসেলের কথাই জানতেন। স্বপ্নাও দোলনের 'আবোল-তাবোল' কথার মধ্যেই খুঁজে পেলেন এক ধর্মীয় সত্যকে—এক জাতিস্মর দোলনকে। স্বপ্নাদেবী ও নীলাচলবাবুর কথায় মানিকবাবু ও কণিকাদেবী যেন খুঁজে পেলেন দোলনের হেঁয়ালির কিছুটা হদিস।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বপ্নাদেবী ও নীলাচলবাবুর পরামর্শে, মানিকবাবু, তাঁর স্ত্রী

ও কন্যা দোলনকে নিয়ে আবার বর্ধমান গেলেন। সময়টা '৭২ সালের ৩০ মার্চ। বর্ধমানে ওঁরা উঠলেন স্বপ্না সামন্তর বোন প্রতিমা দাঁ'র বাড়িতে।

বর্ধমানে এসে দোলনের আনন্দ আর ধরে না। সেদিনই বিকেলে দোলনকে নিয়ে বেরুলেন কণিকাদেবী, প্রতিমা দাঁ ও পৃথ্বীশ দে'র স্ত্রী মীরা দে। ওঁরা দোলনকে নিয়ে হাজির হলেন বুল্টিদের বাড়ির কাছের অন্নপূর্ণার মন্দিরে। তারপর সেখান থেকে বুল্টিদের বাড়ির দিকে। লাল রঙের বিশাল প্রাসাদ। দোলনকে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন—এটা তোমার বাড়ি?

ছোট্ট দোলন, খুশিতে ডগমগ করতে করতে জানাল, হ্যাঁ, এটাই ওদের বাড়ি ছিল।

সদর দরজার 'নক' করতে দরজা খুলে দিয়েছিলেন অনাথবাবুর ছোট মেয়ে রীতা। অতিথিদের আগমনের অদ্ভুত কারণে হতবাক্ রীতা। ভিতরে নিয়ে এলেন ওঁদের। অনাথবাবু বাড়ি ছিলেন না। গিয়েছিলেন কলকাতায়। পুরুষ সদস্য হিসেবে সে সময় বাড়িতে ছিলেন শুধু অনাথবাবুর ছোট ছেলে শিশির। দোলনের কাহিনি শুনে বাড়ির সকলেই অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সত্যিই কি বুল্টি দোলন হয়ে এ'বাড়িতে এসেছে? উপস্থিত অনেকেই দোলনকে জেরা করে নিজেদের কৌতূহল মেটাতে চান। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে ছিলেন বুল্টির খুড়তুতো ছোটকাকিমা লক্ষ্মী দে। লক্ষ্মী দেবী দোলনকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো আমি কে?" দোলন লক্ষ্মীদেবীর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি ও'বাড়ির ছোট কাকিমা।" রীতা দোলনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার আগের জন্মের মা কে বল তো?" দোলন একজন ফর্সা, মোটাসোটা মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই তো আমার মা।"

দোলন বুল্টির মা'কেই নিজের মা বলে চিহ্নিত করেছিল। এমন একটা অদ্ভুত, অকল্পনীয় ব্যাপার চোখের সামনে ঘটতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বুল্টির মা। দু'চোখে তার বিস্ময়ের ঘোর। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোনও একটা মানসিক দ্বন্দ্বে পীড়িত হচ্ছিলেন। দোলন আদরের প্রত্যাশায় বুল্টির মায়ের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

কণিকাদেবী দোলনের মনোভাব বুঝে বললেন, "ওকে একটু কোলে নিন। ও আপনার আদর পেতে চায়।"

বুল্টির মা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলেন। দোলনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার মেয়েকে আপনি নিন। আমার কোনও দরকার নেই।"

অভিমানী দোলন দুঃখ পেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করেছে, "মা আমাকে আদর করেনি; আমাকে বকেছে।"

এরপরও দোলন বুল্টির জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক কিছুই বলতে পেরেছে,

অনেক কিছুই চিনতে পেরেছে। একটা গ্রুপ ফটো থেকে বুল্টির বাবা অনাথ দে'কে চিনিয়ে দিয়েছিল। শিশিরের ছবি দেখে চিনতে পেরেছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল বুল্টির শোবার ঘর, পড়ার ঘর, আলমারি, আলমারির চাবি। আলমারিতে একটা ডোরাকাটা নীল শার্টও পাওয়া গিয়েছিল।

এ'সব যা লিখলাম, সবই শুনেছি দোলন ও তার মা-বাবার কাছ থেকে।

বুল্টির পরিবারের তরফ থেকে দোলনকে আগের জন্মের বুল্টি বলে মেনে না নেওয়ায় দোলন হতাশ হয়েছিল। নরেন্দ্রপুরে ফিরে এসে আগের জীবনের কথা আর খুব একটা বলত না। এরই কিছু পরে স্বামী লোকশ্বরানন্দের ইচ্ছেয় এবং যোগাযোগে দোলনের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭২-এর ৭ মে। মানিকবাবুর কথায়—স্বামীজি চেয়েছিলেন, খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পর এই নিয়ে গবেষণার কাজে কোনও বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে, তবে তার মধ্য দিয়ে সত্য বেরিয়ে আসবে, প্রতিষ্ঠিত হবে বেদ, উপনিষদ, গীতার কথা—আত্মা জন্মহীন, নিত্য।

এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক প্যারাসাইকোলজিস্ট

দোলনের খবরটা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর মানিকবাবু কয়েকজন জ্যোতিষীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন বলে মানিকবাবু জানান। তাঁরা দোলনের জন্মসময় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৭২-এর জুলাইতে প্রণব পাল এগিয়ে এলেন দোলনকে নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে। তিনি পেশায় অধ্যাপক হলেও নেশায় প্যারাসাইকোলজিস্ট। প্রণববাবু প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে ঘটনাটি জানান ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যারাসাইকোলজিস্ট আয়েন স্টিভেনসনকে।

অক্টোবরে স্টিভেনসন উড়ে এলেন। অধ্যাপক পালের সঙ্গে নরেন্দ্রপুরে যান, যান বর্ধমানে। নভেম্বরে দেশে ফিরে যান।

আবার ফিরে আসেন '৭৩-এর মার্চে। আবার এক দফা অনুসন্ধান। ১৯৭৫-এ Ian Stevenson এর 'Cases of the Reincarnation Type, Volume I'-এ প্রকাশিত হয় দোলনচাঁপার কাহিনি। সেখানে স্টিভেনসন লিখেছেন, "Dolan made all except a few of the Statements about previous life..." অর্থাৎ, দোলন আগের জীবনের কয়েকটি ছাড়া সব তথ্যই মিলিয়ে দিয়েছিল।

কী কী তথ্য দোলন স্টিভেনসনের সামনে হাজির করেছিল, কী কী মেলাতে পারেনি—তার একটা লিস্ট তিনি লেখাটিতে তুলে ধরেছেন। দোলনের ব্যর্থতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অবশ্যই বিস্ময়কর দিক হলো—ও না বলতে পেরেছিল নিজের পূর্বজন্মের নাম, না বলতে পেরেছিল আগের জন্মের পরিবারের সদস্যদের

নাম। স্টিভেনসনের ভাষায়, "...she never mentioned his name or that of any other member of his family".

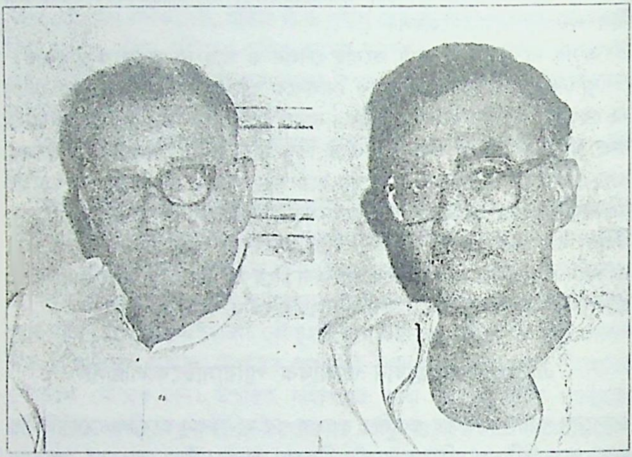

বুলটির বাবা অনাদি দে ও কাকা নিশীথ দে

দোলনের দেওয়া বহু তথ্যই যে মিলে গেছে বলে স্টিভেনসন দাবি করেছেন, সে সব তথ্যের অনেকগুলোই অতি হাস্যকর। যেমন, "She had a house in Burdwan". "She had a father in Burdwan". অর্থাৎ ওর বর্ধমানে বাড়ি ছিল। বর্ধমানে ওর বাবা ছিল। এমনি আরও আছে। যেমন—ওর মা ছিল। ওর কাকা, কাকী ছিল ইত্যাদি। দোলন ছেলেদের পোশাক পরত, ছেলেদের খেলা খেলত—এ'কথা উল্লেখ করার পর স্টিভেনসন স্বীকার করেছেন, "It happened that in The Ramakrishna Mission Ashrama, where her family lived, the close neighbours had mostly boys". অর্থাৎ, গোদা বাংলায়—দোলনের পরিবার যে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে থাকে, সেখানে ওর পড়শি ও সঙ্গীদের বেশিরভাগই ছিল ছেলে।

ওই আশ্রমটি যেহেতু ছেলেদের আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র, তাই দোলন আশ্রমে ঘেরা কমপাউন্ডে খেলার সঙ্গী-সাথী যাদের পেয়েছে, যাদের দেখেছে, যাদের সঙ্গে মিশেছে তাদের বেশির ভাগই ছেলে। ফলে ও ছেলেদের পোশাক ও ছেলেদের

খেলাধুলার দিকে আকর্ষণ অনুভব করতেই পারে। সাংস্কৃতিক পরিবেশগত এই প্রভাবের ফলকে জাতিস্মর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলে তা হবে এক বিশাল ভুল।

ভারতের সবচেয়ে নামী প্যারাসাইকোলজিস্ট অর্থাৎ ভূত-প্রেত-অলৌকিক-জাতিস্মর ইত্যাদির গবেষক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে তিনি নামলেন দোলনের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধানের কাজে। কথাটা একটু ভুল লিখে ফেললাম। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নামলেন দোলনকে জাতিস্মর বলে প্রমাণ করতে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দোলনকে জাতিস্মর প্রমাণ করতে যে সব যুক্তিকে গুরুত্বের সঙ্গে হাজির করেছেন, সেগুলো হল :

(১) "আমি এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমরা দুজনেই অনুসন্ধান করে দেখেছি মিত্র পরিবারে সঙ্গে দে পরিবারের কোনো যোগাযোগ আগে ছিল না এবং দোলনের পক্ষে অন্য কোন সূত্র থেকেও দে পরিবারে বা নিশীথ (বুল্টি) সম্পর্কে কোনো কিছু জানার সুযোগ ছিল না।"

(২) "দোলনই পূর্বজন্মে নিশীথ না হলে এই পড়ে যাবার ঘটনাটি (হাসপাতালের বেড থেকে) জানতে পারার আর কোনো উপায় তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

(৩) "দোলনের আর একটি কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দোলন আগেই বলেছিল যে সে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিল এবং ঐ হাসপাতালেই খাট থেকে পড়ে যাবার কিছুদিন বাদেই সে মারা যায়। হাসপাতালে থাকার সময় তার মাথায় খুবই যন্ত্রণা হত।"

দোলন হাসপাতালে ছিল, সেখানে থাকাকালীন বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল, এই দুটি তথ্যকে জাতিস্মরতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিষ্ঠিত করতেই হয়—এ জাতীয় কোনও তথ্যই দোলনের পক্ষে জানা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এক নম্বর যুক্তিটি, তিনি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখেছেন বুল্টির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কারও সঙ্গে দোলনের পরিবারের যোগাযোগ ছিল না। এই অনুসন্ধান যে আগাপাশতলাই ভুল অথবা ভুল পথে জনচিত্তকে চালিত করার অপচেষ্টা, তারই প্রমাণস্বরূপ দুই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন বহু পরিবারের নাম হাজির করেছিলাম 'আলোকপাত' মাসিক পত্রিকার জুলাই ১৯৮৮ সংখ্যায়। সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেছিলাম বুল্টির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানার সুযোগ দোলনের ছিল। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনায় যাব।

১৯৭৫ সালে মানিকবাবু, কণিকাদেবী ও দোলনকে নিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান গিয়েছিলেন। মানিকবাবুর কথামত বুল্টিদের পরিবারের কাছ থেকে অনুসন্ধান চালাতে কোনও সহযোগিতা পাননি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ এই অনুসন্ধান ছিল একতরফা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এক অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান।

বুল্টি বা নিশীথ দে'র জীবনী

নিশীথ দে অনাথশরণ দে'র বড় ছেলে। জন্ম ১৯৪০ সালে। নিশীথ পড়ত বর্ধমানের রাজ স্কুলে ও রাজ কলেজে। মৃত্যুর সময় ও ছিল বি. কম.-এর ছাত্র। খেলাধুলায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও ক্রিকেট। একটি মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

বুল্টিদের পরিবার ছিল শহরের অতি ধনী পরিবারের অন্যতম। বুল্টির পরিবার ধনাঢ্য পরিবার ছাড়া মিশত না। এমন কী ধনবান নয়, এমন আত্মীয়দের সঙ্গেও ওরা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। বুল্টির স্বভাব এ বিষয়ে ছিল ভিন্ন ধরনের। ও ধনী ও গরিব সব বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গেই মিশতে পছন্দ করত।

১৯৬৪'তে যখন বুল্টির বয়স ২৪ বছর, সে সময় বুল্টি ওর মাথার পিছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে। ব্যথার সঙ্গে মাঝে মাঝে বমি হত। স্থানীয় ডাক্তার ছ-আট মাস চিকিৎসা করেন। তারপর বুল্টিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ। সেখানে অনুমান করা হয় বুল্টির ব্রেন টিউমার হয়েছে। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই বুল্টির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পনেরো দিন 'কোমা'য় থেকে ২৫ জুলাই '৬৪ বুল্টি মারা যায়। বুল্টির দেহ পোড়ানো হয় কলকাতার নিমতলা শ্মশানঘাটে।

দোলন এখন

বর্ধমানের দে পরিবারের কাছে থেকে শীতল ব্যবহার পেয়ে শিশুমনে যে আঘাত পেয়েছিল তার ক্ষত একুশটি বসন্ত পার হয়ে আসা দোলন যে ভুলতে পারেনি, সে কথা ১৯৮৮তে নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে আমার মুখোমুখি বসে দোলন জানিয়ে ছিল। আরও জানিয়ে ছিল—আন্তরিকভাবেই ও দুঃখজনক স্মৃতিগুলো ভুলতে চায়। আর অনেকটা ভুলে থাকার তাগিদেই গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

ছেলেদের পোশাকের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, বর্ধমান থেকে ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যে সে আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে। জানি না, এই বিচ্ছিন্ন করার পিছনে কতখানি ছিল ব্যথা, কতখানি মনের জোর।

১৯৮৬-এর একদিন বুল্টির খুড়তুতো ছোট কাকীমা লক্ষ্মী দে ও খুড়তুতো

ছোটকাকা প্রণবকুমার দে এলেন মানিক মিত্রের কর্মস্থলে। দু'জনের পরিচয় পেয়ে মানিকবাবু খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। বললেন, "আপনারা এত বছর পর। এখানে কী মনে করে?"

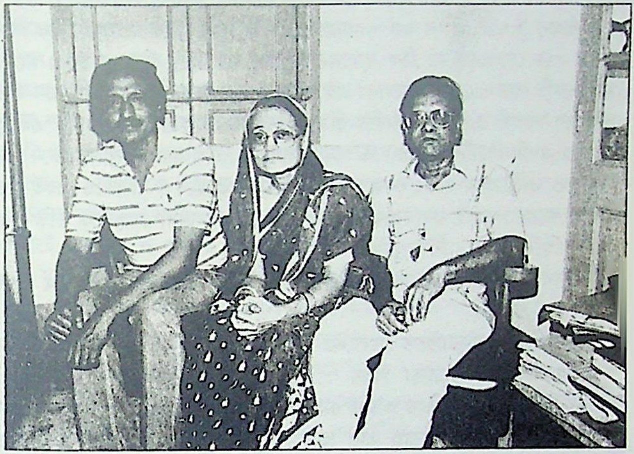

লেখকের সঙ্গে লক্ষ্মী দে ও প্রশান্ত দে

লক্ষ্মীদেবী বললেন, "আপনারা চলে আসার পর থেকেই আপনাদের খোঁজ করে চলেছি। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে নরেন্দ্রপুরেই। ওর কাছ থেকে আপনার খোঁজ পেয়ে আসা। কোনও কূট-তর্ক করতে আসিনি। আমরা এসেছি বুল্টিকে, অর্থাৎ দোলনকে একবার চোখের দেখা দেখব বলে।"

মানিকবাবু ওদের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী দোলনকে নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমাকে চিনতে পারছ?"

"হ্যাঁ, তুমি ছোট-কাকিমা।" বলেছিল দোলন।

প্রণব জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি কে বল তো?"

"তুমি ছোট-কাকা।"

লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর গুরুভাই বম্বের অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য। অভি ভট্টাচার্য লক্ষ্মীদেবীর কাছে দোলনের কাহিনি শোনার পর থেকে প্রায়ই জোর তাগাদা দিতেন—যেমন করেই হোক দোলনের ঠিকানা খুঁজে বের কর।

১৯৮৮-র জুনের এক দুপুরে লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর সঙ্গে তাঁদের গোয়াবাগানের

বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে আমি এ'সব জেনেছি। আরও জেনেছি বুল্টির পরিবারের সঙ্গে প্রণববাবুর পরিবারের সম্পর্ক আদৌ মধুর নয়, বরং কিছুটা তিক্ত। তবে বুল্টিকে ওঁরা দু'জনেই ভালোবাসতেন। লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর অকৃত্রিম ভালোবাসায় দোলন তার দমিত-দুঃখের অনেকটাই ভুলতে পেরেছিল।

দোলন '৮৭তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভি স্কুল থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর দোলনের মা ঠিক করলেন, এ'বার ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন। মনের মত একটি পাত্রও পেয়ে গেলেন। এই সময় লক্ষ্মীদেবী দোলনকে নিয়ে যান তাঁর গুরুদেব 'দাদাজী'র কাছে। দাদাজীর স্ত্রী দোলনের বিয়ের কথা শুনে বলেন, "এইটুকু মেয়ের এখনি বিয়ে দেবে কি? ও গান ভালবাসে, ওকে বরং শান্তিনিকেতনে গান শেখাতে ভর্তি করে দাও। দেখবে ওর ভাল বিয়েই হবে।" দাদাজীও একই মত প্রকাশ করেন। তারই ফলস্বরূপ বিয়ের সম্বন্ধ শিকেয় তুলে দোলনকে ভর্তি করা হল শান্তিনিকেতনে। বিষয় নিল—সংগীত।

এ'সব তথ্য জেনেছি দোলন, মানিকবাবু, কণিকাদেবী, লক্ষ্মী দে এবং প্রণব দে'র কাছ থেকে।

১৯৯০-এর জানুয়ারিতে দোলনের জীবনে আসেন সুব্রত রাহা। সুব্রত তখন শান্তিনিকেতনেই পড়তেন। বিষয় : ব্যাচিলার অফ সোসাল ওয়েলফেয়ার। ফেব্রুয়ারিতেই দোলন বিয়ে করতে চাইলেন সুব্রত'কে। সুব্রতর কথা মত—এমন বেকার অবস্থায় বিয়ে করায় তার প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধে ছিল। তবু এরপরও এপ্রিলেই বক্রেশ্বর মন্দিরে গিয়ে দু'জন বিয়ে করেন। কারণ হিসেবে সুব্রত জানিয়েছেন, "দোলন আমাকে হুমকি দেয় তাকে immediately বিয়ে না করলে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। ও অস্বাভাবিক সব ব্যবহার করত। যেমন কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বমি করা, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া, হঠাৎ কাউকে না চিনতে পারা, সারা শরীর কাঁপা ইত্যাদি। এসব দেখে আমিও একটু ভয় পেয়ে যাই এবং মনে মনে ভাবি একে বিয়ে না করলে বোধ হয় সে সত্যিকারের আত্মহত্যা করবে বা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।" এ'সবই শুনেছি সুব্রতর মুখে। ২৬ এপ্রিল '৯০ দু'জনের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়।

বিয়ের পর সুব্রত রাহা আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে আমার প্রতি তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেন। কারণ সে সময় দোলনের জাতিস্মরতা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম তার মোদ্দা কথা—দোলন হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক।

১৯৯৪-এ সুব্রত রাহা মানবতাবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে দোলন থেকে উদ্ভূত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাতে এ কথাও চিঠিতে লেখা রয়েছে, "শ্রীযুক্ত প্রবীর ঘোষ যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন, দোলনকে মানসিক রোগী বলে দাবী করতেন তখন আমার ওনার ওপর একটু রাগ হত। তবে আজ আমি বুঝতে পারছি, উনি ১০০% সঠিক।"

সুব্রত'র কেন এমন মনে হল? সে প্রসঙ্গে চিঠিটিতে সুব্রত লিখছেন, "দোলনের মিথ্যা কথা বলার অস্বাভাবিক প্রবণতা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে দিয়েছে ওর মিথ্যে কথাগুলো অত্যন্ত নিচু মনের পরিচায়ক। কিন্তু যে মুহূর্তে দোলন ধরা পড়ে যেত যে সে মিথ্যে বলছে বা বলেছে, সাথে সাথে হয় দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয় যেত"... "আজ পরিচয় হলে আগামী কালই তাকে মনে রাখতে পারত না। তার এই শরীর কাঁপুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগত কারণ কোনোদিন সে এর জন্য ওষুধ খেতে রাজি হত না".... "বেশ কয়েকবার তাকে মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাব বলি, এবং এটা শুনলেই সে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করে উঠত এবং জিনিষপত্তর ছুঁড়তে শুরু করত" ... "আমাকে উঠতে বসতে প্রায়ই বলত যে ও হয় আত্মহত্যা করবে বা পালিয়ে যাবে যদি আমি ওর কথায় না উঠি বা বসি। সাথে ভয় দেখাত যে সুইসাইড নোটে আমাকে ও আমার মা-ভাইকে ফাঁসিয়ে দেবে।"

সুব্রত রাহা তখন জলপাইগুড়ি জেলার বেইন্টগুড়ি টি এস্টেটে ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। দোলন ও সুব্রতর একটি কন্যা হয়েছে। কন্যার আগমনও পারেনি দু'জনের মনের ভাঙনকে জোড়া লাগাতে। '৯৪-এর সেপ্টেম্বরে দু'জনে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনেছেন কোর্টে। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

দাদাজী ও তাঁর পত্নীর ভবিষ্যৎবাণী "দেখবে ওর ভালই বিয়ে হবে" মিথ্যে হয়ে গেছে। মিথ্যে হয়ে গেছে দাদাজীর অলৌকিক ক্ষমতার দাবি। মা-বাবা সে সময় যদি দোলনকে মানসিক চিকিৎসা করাতে বলতেন, তাহলে এমনভাবে দু'টি জীবন ও দুটি পরিবারের শান্তি নষ্ট হত না।

আমি অনুসন্ধানে যা পেয়েছি

সেই প্রকৃত যুক্তিবাদী, যে খোলা মনের। এই খোলা মন নিয়েই দোলনের বিষয়ে অনুসন্ধানে নেমেছিলাম। উদ্দেশ্য—সত্য প্রকাশিত হোক। এই বিষয়ে যাঁদেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁদের কয়েকজনকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, "আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তথ্য গোপন না করে বা বিকৃত না করে আপনার মতামত লিখব।" সঙ্গে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, "সত্যানুসন্ধানের নামে পাঠক-পাঠিকাদের রোমাঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গল্প ফাঁদাটাকে আমি ঘৃণ্য অপরাধ বলেই মনে করি।" তবু একাধিক ক্ষেত্রে যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁরা আমাদের কথোপকথন টেপবন্দী করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য : সত্য যাতে বিকৃত না করতে পারি।

প্যারাসাইকোলজিস্ট অধ্যাপক প্রণব পাল, আয়েন স্টিভেনসন ,এবং ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের দে পরিবার, অর্থাৎ বুল্টিদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে সহযোগিতা পাননি বলে লেখায় পড়েছি এবং শুনেছি। আমার অনুসন্ধানপর্বে কিন্তু দে পরিবার পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১। দোলন বুল্টির বর্ধমানের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল।	মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন।	বুল্টিদের প্রাসাদতুল্য বাড়ির কাছে দোলনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাছাকাছি ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি।
২। বুল্টির জীবিতকালে ওদের বাড়ির রঙ ছিল টুকটুকে লাল।	মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথশরণ দে, শিশির দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	ভুল। দে পরিবারের বিভিন্ন জনের সাক্ষ্যে এবং স্থানীয় মানুষদের সাক্ষ্যে জানতে পারি বাড়ির রঙ চিরকালই হালকা গেরুয়া।
৩। দোলন গ্রুপ ছবি দেখে বুল্টির বাবাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।	কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথশরণ দে, শিশির, লক্ষ্মী।	লক্ষ্মী দে বলেন, ওঁর ঠিক স্মরণ নেই, অনাথশরণ ও শিশির জানান, দোলন বুল্টির বাবা বলে যার ছবি দেখিয়েছিল, সেটি ছিল বুল্টির কাকা অনিলকুমার দে'র ছবি।
৪। দোলন বুল্টির ভাই শিশিরকে চিনিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় বর্ধমান যাত্রায় ছবিতে এবং '৭৫-এর তৃতীয় যাত্রায় বাস্তবে শিশিরকে চিহ্নিত করেছিল।	দোলন, কণিকা, শিশির, অনাথশরণ।	অনাথশরণ এবং শিশির জানান, গ্রুপ ছবি থেকে শিশিরকে চিহ্নিত করার কাহিনি পুরোপুরি মিথ্যে। '৭৫-এর তৃতীয় যাত্রায় শিশির যে বুল্টির ভাই, এটা আদৌ গোপন ছিল না। তাই নতুন করে চিনিয়ে দেবার প্রশ্নও ছিল না।

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
৫। দোলন বুল্টির ছোটবোন রীতাকে চিনতে পেরেছিল।	কণিকা, শিশির, অনাথশরণ, লক্ষ্মী।	কণিকা ও লক্ষ্মীর কথায় দোলনের বক্তব্যের সমর্থন মেলে। অনাথশরণ ও শিশির জানান, রীতা তখন ঘরেই ছিল না। অতএব রীতাকে দেখা ও চিনে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না।
৬। দোলন লক্ষ্মীকে 'ও বাড়ির ছোট কাকিমা' বলে জানিয়েছিল।	লক্ষ্মী, দোলন, শিশির, অনাথশরণ, প্রণবকুমার দে।	লক্ষ্মী দেবী বলেছেন, দোলন ও কথা বলেছিল। শিশির বলেন, 'প্রকাশ্যে আর কারও সামনে দোলন ও কথা বলেনি সুতরা লক্ষ্মী কাকিমার কথা সত্যি কি মিথ্যে, বলতে পারব না।' "লক্ষ্মীদেবী ও শিশির স্বীকার করেন তাঁদের দুই পরিবারের সম্পর্ক বেশ কিছু বছর ধরে খুবই খারাপ। ১৯৭৫ সালে গোয়াবাগানের বাড়ির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে পার্টিশন স্যুট করেন প্রণব দে, ১৯৮১ তে বাড়ির দখল নিয়ে আরও একটি কেস শুরু হয়েছে বলে জানান লক্ষ্মী ও প্রণব। অনাথশরণ ও নিশীথ জানান—তাঁদের অপ্রস্তুত করার জন্য লক্ষ্মী দেবী এই বিষয়ে মিথ্যে কথা বললে তাঁরা অবাক হবেন না।

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
৭। দোলন বুল্টির শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা, শিশির, অনাথশরণ, অনিল দে।	অনাথশরণ ও শিশির জানান, বুল্টির নির্দিষ্ট কোনও শোবার ঘর ছিল না। বেশ কয়েকটা ঘরেই ও শুতো। যে ঘরটা দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল, সে ঘরেও বুল্টি শুতো।
৮। দোলন বুল্টির পড়ার ঘর চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকাদেবী, অনিল দে, লক্ষ্মী দে, শিশির দে।	দোলন একটা পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। সেখানে চেয়ার, টেবিলে বই-পত্র ছিল। দোলন একটু দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'এখানে আমি পড়তাম।' অনাথ দে'র ভাই অনিল দে এবং শিশির এ কথা জানান। বুল্টি সত্যিই ও ঘরে পড়ত। পড়ার ঘরের পরিবেশ দেখে 'এ ঘরে পড়তাম' বলার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই।
৯। দোলন বুল্টির পোশাকের আলমারি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, শিশির দে, অনাথ দে।	শিশির দে এবং অনাথ দে জানান, 'তেমন করে নির্দিষ্টভাবে কোনও বিশেষ আলমারি দোলন দেখিয়ে দেয়নি। একটা আলমারি দোলন খুলেছিল। সেটা বুল্টির নিজস্ব আলমারি নয়।' আরও অনেকেরই পোশাক ওতে থাকত। আর একটা কথা। বুল্টির পোশাক

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		শুধুমাত্র ওই আলমারিতে থাকত না। আরও অনেক আলমারিতেই থাকত। দোলনও বলেছে, ওই আলমারিতে আরও অনেকের জামা-কাপড় ছিল।
১০। দোলন ওই আলমারির চাবি চিনিয়ে দিয়েছিল।	দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, নিশীথ দে।	কণিকা মিত্র এবং লক্ষ্মী দে দোলনের কথা সমর্থন করলেও শিশির দে জানালেন, 'আলমারির চাবি চেনাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কোনো চাবিই দোলনকে দেওয়া হয়নি।'
১১। আলমারিতে নীল ডোরা-কাটা শার্ট ছিল।	শিশির দে।	ছিল। 'কিন্তু সেটা আমার শার্ট।' এই কথা জানিয়েছেন শিশির।
১২। বাড়িতে হরিণ ও ময়ূর ছিল।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে।	আংশিক সত্য। তিনজনেই জানালেন হরিণ কোনো দিনই ছিল না। ময়ূর ছিল।
১৩। বাড়িটা দোতলা।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	বাড়িটা তিন তলা, বুল্টির আমলেই।
১৪। স্কুল ছিল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মোটরে স্কুলে যেতাম।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	বুল্টি রাজ স্কুলে পড়ত। সেটা বাড়ির খুব কাছে। স্কুলে প্রথম দিকে হেঁটে এবং পরে সাইকেলে যেত।

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১৫। কলেজে মোটরে যেতাম।	অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে।	বুল্টি রাজ কলেজে পড়ত। সাইকেলে কলেজে যেত।
১৬। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতাম।	অনাথ দে, শিশির দে।	ফুটবল, ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। তাই সকলেই খেলে। বুল্টিও খেলত। শিশির জানালেন, 'আমিও খেলতাম, প্রতিটি পাড়ার আর দশটা সাধারণ ছেলেও খেলে।'
১৭। ছোট্ট বয়স থেকেই ছেলেদের পোশাকের প্রতি আকর্ষণ ছিল।	দোলন, মানিক দে, কণিকা দে।	ছেলেদের মিশনের কোয়ার্টারে থেকে দোলন সঙ্গী হিসেবে প্রধানত ছেলেদেরই পেয়েছে। তাদের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছে। এই পরিবেশে ছেলেদের পোশাকের প্রতি মেয়েদের পোশাকের চেয়ে বেশি আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। আমি এই প্রতিবেদক স্বয়ং চার বোনের মধ্যে মানুষ হচ্ছিলাম বলে ছেলেবেলায় একবার পুজোর পোশাক হিসেবে ফ্রকের বায়না ধরেছিলাম।
১৮। বাড়ি বর্ধমানে, ধনী পরিবারে জন্ম, কাছে মন্দির, পদবী দে। অসুস্থ হয়ে হাস-পাতালে যাই। ও মারা যাই।	দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, অনাথ দে, লক্ষ্মী দে, প্রণব দে।	প্রতিটি সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ বলছে এগুলো সত্যি। মানিক মিত্র এবং কণিকাদেবী বলেছেন তাঁরা কেউই কোনও দিনই

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		বর্ধমানে যাননি। এই যাত্রাই ওঁর মা-বাবারও প্রথম যাত্রা। অনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় ছিল না বলে মিত্র পরিবারও জানিয়েছেন। অতএব মা বাবার কাছ থেকে বুল্টির কথা দোলন শুনেছিল এবং অবচেতন মনে তা ছিল, একনাগাড়ে বুল্টির কথা ভাবতে ভাবতে দোলনের মস্তিষ্ক-কোষের কার্য-কলাপের বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে দোলন নিজের সত্তার মধ্যে বুল্টির সত্তাকে অনুভব করেছিল—এই মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দোলনের বেলায় খাটে না বলে মানিক মিত্রের বিশ্বাস। বুল্টি ও তার পরিবারের গল্প দোলনের শোনার সম্ভাবনা ছিল কি না এটা জাতিস্মরের এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোলনদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ ···মানুষজনের অনেকেই বর্ধমানের মানুষ এবং অনাথবাবুদের পরিবারের পরিচিত। উদাহরণ : ১. নীলাচল সামন্ত মানিক মিত্রের বন্ধু। বুল্টিদের পরিবারকে চিনতেন।

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		বুল্টির ঠাকুরদা চারুবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। ২. স্বপ্না সামন্ত, নীলাচল সামন্তের স্ত্রী। বুল্টিদের পরিবারের অনেক কিছুই জানতেন। ধনী পরিবারের বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। স্বপ্নদেবীর বোন প্রতিমা দাঁ বুল্টিদের আত্মীয় পৃথ্বীশ দে এবং তাঁর স্ত্রী মীরা দে'র পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। ৩. কানাইলাল ব্যানার্জি। মানিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বাড়িতে আসতেন। তিনি বর্ধমানের মানুষ। দে পরিবারের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-পরিচয় না থাকলেও দে পরিবারের বিষয়ে অনেক কিছুই জানতেন। ৪. শশাংক ঘোষ। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। মানিক-বাবুর বন্ধু। বাড়িতে আসতেন। দে পরিবারের বিষয়ে জানতেন। ৫. রাজেন্দ্র চক্রবর্তী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দে পরিবারকে জানতেন। মানিকবাবুর বন্ধু হিসেবে মাঝে মধ্যে নরেন্দ্রপুরে মানিকবাবুর বাড়ি যেতেন। ৬. ডাঃ হেমাঙ্গ চক্রবর্তী।

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		বর্ধমান থেকে এসে নরেন্দ্রপুরে বসবাস শুরু করেছিলেন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস। মানিকবাবুর পরিবারের সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুর পরিবারের সখ্যতা ছিল। হেমাঙ্গবাবু অনাথশরণ দে'র পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। হেমাঙ্গবাবুর ছেলেও ছিলেন নিশীথের বন্ধু। এদের কেউ কোনও দিন অনাথবাবু ও বুল্টির গল্প মানিকবাবুদের বাড়িতে বসে করেননি অথবা হেমাঙ্গবাবুর ছেলের কাছ থেকে বুল্টির গল্প কখনও শোনেননি এমন নিশ্চিত বিশ্বাস করার মত কোনও তথ্য আমার হাতে নেই।
১৯। দোলন তার মাথায় ব্যথা অনুভব করত।	দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র।	কিছু কিছু মানুষ মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা আবেগ-প্রবণ, মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম। বিশেষ সংবেদনশীলতার জন্য বহু সময় এরা নিজেদের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে 'সমব্যথী চিহ্ন' বা অন্যের ব্যথা নিজের শরীরে সৃষ্টি করেন, অনুভব করেন। এই ধরনের বহু ঘটনাই মানসিক চিকিৎ-সকদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে। দোলনও

দোলন যা বলেছে	যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		এর ব্যতিক্রম নয়। 'সমব্যথী' চিহ্ন বিষয়ে বিস্তৃত জানতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম খণ্ড পড়ুন।
২০। বর্তমানে দোলনের মাথায় কোনও ব্যথা নেই। বুল্টিকে নিয়ে চিন্তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও কমছিল।	দোলন।	মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবেগ-প্রবণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সত্তার মধ্যে বুল্টির সত্তাকে অনুভব করার প্রবণতা কমেছে, কমেছে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে অন্যের ব্যথা অনুভব করার প্রবণতা।
২১। অ, আ, ক, খ, A, B, C, D, ১, ২, ৩, ৪ থেকেই পড়াশুনো শুরু করতে হয়েছিল। বুল্টি বি. কম পর্যন্ত যা পড়েছে তার কিছুই দোলনের মনে ছিল না।	দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র।	জাতিস্মর হলে পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতির মতো পূর্বজন্মের লেখা-পড়ার স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মানসিকভাবে কারও সত্তাকে অনুভব করলে তার ব্যবহার অনুকরণ করতে পারে কিন্তু তার জ্ঞান প্রয়োগ সম্ভব নয়। দোলনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

জাতিস্মর তদন্ত ২ : চাকদার অগ্নিশিখা

সাম্প্রতিককালের মধ্যে যে জাতিস্মর কলকাতাসহ তামাম ভারতের প্রচারমাধ্যমগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সে হল পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ছোট শহর চাকদার ছোট্ট মেয়ে অগ্নিশিখা।

অগ্নিশিখা

খবরটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'বর্তমান'এ। ১০ জুন ১৯৯৪ প্রথম পাতায় বিশাল গুরুত্ব দিয়ে ছবিসহ ছাপা হয়েছিল জেনুইন-জাতিস্মর অগ্নিশিখার রোমহর্ষক কাহিনি। অগ্নির প্রবল আবির্ভাবে শহর কলকাতা যেন জাতিস্মরের জ্বরে কাঁপতে লাগল।

সেদিনই জরুরী তলব পেয়ে গেলাম 'সানন্দা'র দপ্তরে। 'সানন্দা' আনন্দবাজার গ্রুপের জনপ্রিয় পাক্ষিক। সানন্দার সহ-সম্পাদক সুদেষ্ণা রায়-সহ অনেকেই মনে হল যথেষ্ট টেনশনে রয়েছেন। সানন্দার আগামী সংখ্যা জাতিস্মর নিয়ে। আর তার কেন্দ্রবিন্দু চাকদার অগ্নিশিখা। অগ্নিশিখার খবরটা এনে দিয়েছিল আনন্দবাজার গ্রুপের সাংবাদিক বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়। বাল্মীকি দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে অগ্নিকে জাতিস্মর বলে নিশ্চিত হয়ে সে কথা জানিয়েছেন 'সানন্দা'কে। এমন এক উত্তেজক 'ক্যাচি ম্যাটার'কে আরও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে একগাদা মাথা খেটেছে। দ্রুত তৈরি হয়েছে পরিকল্পনা। বাল্মীকির অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে জাতিস্মর বিষয়ক নানা লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে আগামী সংখ্যাটি। কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। অগ্নির জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধান পর্বটি চালানো হয়েছিল অতি গোপনে, যাতে অন্য কোনও পত্রিকা যেন অগ্নির বিন্দু-বিসর্গ না জানতে পারে। আজ কোনও দৈনিক জানতে পারলে, কালই তা ছেপে বের করে দেবে। পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে আজ জানলে কাল ছাপার কোনও উপায় নেই। তাই পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে অতি আকর্ষণীয় খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অতি সতর্কতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। অগ্নির ক্ষেত্রে সে গোপনীয়তা পুরোপুরি রক্ষা করার চেষ্টা সত্ত্বেও গোটা পরিকল্পনা ও পরিশ্রমই বরবাদ হয়ে গেছে। 'বর্তমান' এর কাছ থেকে আসা আচমকা আঘাত ওঁদের টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী সংখ্যাটির কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু অগ্নি, তাই 'বর্তমান'এ খবরটা বড় করে বেরিয়ে যাওয়ায় সংখ্যাটি পাঠকদের কাছে ব্রাত্য হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিকে নিয়ে আমার অনুসন্ধানমূলক লেখা

পাঠকদের টানতে পারে মনে করে এই তলব। আমিও জাতিস্মরতার মুখোশ ছেঁড়ার এমন একটা সুযোগ গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা করিনি।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আগামীকালই নেমে পড়ব কাজে। আমার অনুসন্ধান পদ্ধতিতে না জানি কী আছে—ভেবেই বোধহয় সঙ্গী হওয়ার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন 'সানন্দা'র দুই সম্পাদক সহযোগী অনিরুদ্ধ ধর ও উজ্জ্বল চক্রবর্তী।

অগ্নিশিখার দাবি সে গত জন্মে জন্মেছিল বর্ধমানের কোটিপতি ব্যবসায়ী ধনপতি দত্তের প্রাসাদে। নাম ছিল দেবযানী। বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী চন্দন বণিকের সঙ্গে। চন্দন ও শ্বশুর চন্দ্রনাথ প্রায়ই শারীরিক অত্যাচার করত। শেষ পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুর ওকে হত্যা করে।

দেবযানী হত্যা মামলা

বর্ধমানের ধনী ব্যবসায়ী ধনপত্তি দত্ত'র মেয়ে দেবযানী। ১৯৭৫-এ বিয়ে। কলকাতার হিন্দুস্থান পার্ক নিবাসী ধনী ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথ বণিকের বড় ছেলে চন্দনের সঙ্গে। বিয়ের পর কোলে আসে তিনটি সন্তান। দুই ছেলে, এক মেয়ে।

১৯৮৩ সালের ২৮ জানুয়ারি বণিকদের প্রাসাদেই খুন করা হয় দেবযানীকে। দেবযানীর মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ২৯ জানুয়ারি। মৃতদেহে ততক্ষণে পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল। মৃতার গলায় ছিল ফাঁসের দাগ।

৩০ জানুয়ারি পুলিশ ওই প্রাসাদ থেকেই গ্রেপ্তার করে দেবযানীর তিন ননদ জয়ন্তী, সুমিত্রা ও চিত্রাকে।

২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাইরে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দেবযানীর পতি চন্দন, শ্বশুর চন্দ্রনাথ ও দেওর অসীমকে।

১৯৮৩-র ১৩ সেপ্টেম্বর আসামীদের বিরুদ্ধে দায়রা বিচার শুরু হয় আলিপুরে দশম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালতে।

সরকার পক্ষে সাক্ষী ছিলেন ৬৬ জন। আসামীর পক্ষে ২ জন।

বিচারক দিলীপনারায়ণ সেন '৮৫-র ১১ এপ্রিল তাঁর রায়ে চন্দন ও চন্দ্রনাথের ফাঁসির আদেশ দেন।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলেও রায় অপরিবর্তিতই থাকে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও চন্দন ও চন্দ্রনাথের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে। বহাল থাকে সুমিত্রার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ। সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের অপরাধে অসীম ও জয়ন্তীর ২ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন ডিভিশন বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন চন্দন ও চন্দ্রনাথ। ১৯৮৭-র ১১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে-দুই বিচারপতি-বিশিষ্ট বেঞ্চে শুনানি হয়। দুই বিচারক তাঁদের রায়ে বলেন,

ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসামী চন্দ্রনাথ উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ। অপর আসামী চন্দন অতি তরুণ ও তিনটি শিশুর পিতা। এই বিষয়গুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে চন্দন ও চন্দ্রনাথকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জানা গিয়েছিল দেবযানীর কোটিপতি পিতাকে বার বার দোহন করতেই দেবযানীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন চন্দন ও তাঁর পরিবার। ২৮ জানুয়ারি দেবযানীকে হত্যা করে মৃতদেহ ঘরের মধ্যে বিছানা জড়ানো অবস্থায় ফেলে রেখে চন্দনের পরিবারের লোকজন সিনেমা দেখেছেন। মৃতদেহ পাচারের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু পচা গন্ধই ওদের পরিকল্পনায় বাদ সেধেছিল।

দেবযানী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গোটা পশ্চিমবাংলায় আলোড়ন তুলেছিল।

১১ জুন, ১৯৯৪

চাকদার উত্তর ঘোষপাড়ায় আমরা যখন হাজির হলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। অমিত দে'র বাড়ির হদিস জানতে পথচারীদের সাহায্য চাইতে গিয়ে অদ্ভুত ধরনের নিস্পৃহ ব্যবহার পেলাম। যে মধ্য-বয়স্ক মানুষটির কাছে শেষ সাহায্য চেয়েছিলাম, তিনি অমিত দে'র বাড়ির দু-কদম দূরেই থাকেন। চোখ মটকে দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে থুতনি-নির্দেশে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, "দেখুন, বোধহয় ও'বাড়িটা।" বললাম, "আমরা যে অমিতবাবুকে খুঁজছি, তার মেয়ে জাতিস্মর।"

ভদ্রলোক আবার কাঁধ ঝাঁকালেন, "কে জানে মশাই। আমরা পাড়া-পড়শিরা তো এতদিন কিচ্ছুটি জানতে পারলাম না। জানলাম কালকের কাগজ পড়ে।"

ছোট দোতলা বাড়ি। একতলার সম্মুখের দুটি ঘরেই তালা ঝুলছে। আমাদের দিকে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন এক মলিনবসনা প্রৌঢ়া, তাঁর পিছু-সঙ্গী দু'টি গৃহবধূ, ছিটের সস্তা ফ্রক পরা তিনটি বালিকা ও লুঙ্গি পরা আদুড়-গায়ের দুটি কিশোর। তাঁরা শোরগোল তুলে আমাদের বোঝাতে লাগলেন, বাইরে তালা ঝোলানো থাকলেও ভিতরে লোক আছে। গলা তুলে ডাকুন।

আমরা সেই শুনে হাঁক-ডাক পাড়তেই দোতলার জানালা দিয়ে একটি-দুটি করে মোট একজোড়া পুরুষ ও একজোড়া নারীর মুখ উঁকি মেরেই সরে গেল। একটু পরেই সরু গলিপথ দিয়ে এলেন এক পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মহিলা। একটা ঘরের তালা খুলে দিয়ে চাপা গলায় প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "আপনারা কি কোনও পত্রিকা থেকে এসেছেন?"

সম্ভবত আমাদের গাড়ি দেখে অনুমান করে থাকবেন। বললাম, "হ্যাঁ।"

—"কোন পত্রিকা?"

—"আনন্দবাজার গ্রুপের 'সানন্দা'র তরফ থেকে আসছি।"

ঘরের ভিতরে পা দিয়েই বললেন, "তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন।"

ঘরে ঢুকলাম আমি, অনিরুদ্ধ, উজ্জ্বল ও চিত্র-সাংবাদিক সুদীপ আচার্য। তখনই প্রৌঢ়া চাপা গলায় ফিসফিস করলেন, "দরজাটা বন্ধ করে দিন, ছিটকিনি আর খিল দু'টোই বন্ধ করে দিন," তারপর বিড়বিড় করে আপনমনেই বললেন, "সব হিংসা...হিংসুকগুলো আড়িপাতার চেষ্টায় আছে...."

পড়শিদের হিংসে কেন? এবাড়ির শিশুকন্যাটি আগের জন্মে এক কোটিপতির আদরের তনয়া ছিল প্রমাণ হলে কোটিপতি পরিবারের দাক্ষিণ্যের কিছুটা এই পরিবারের উপর বর্ষাতে পারে অনুমান করেই কি? তারই সূত্র ধরে পড়শিদের ঈর্ষার কথা ভেবেই উষ্মা প্রকাশ করলেন কি অধৈর্য এই প্রৌঢ়া?

উজ্জ্বল দরজার খিল ও ছিটকিনি আটকালেন, প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার পরিচয়?"

—"জাতিস্মর অগ্নিশিখার ঠাকুমা। মানে ওর বাবার মা।" তারপরই দ্রুততার সঙ্গে বললেন, "বর্তমানের লোক বিষ্যুদ্‌বার এসেছিল। কাল শুক্রবারই ওরা বের করে দিয়েছে। আপনাদেরটাও বের করে দ্যান তাড়াতাড়ি করে।"

—"আর কোনও পত্রিকা ইতিমধ্যে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কি?"

—"আজকে দুটো ছেলে আসছিল, বুঝলেন। ওরা দুটো ফটো দেখাল আমাদের। একটা দেবযানী ও দেবযানীর বরের। আর একটা দেবযানীর বর একটা বাচ্চা নিয়ে। অগ্নিশিখার কাছে ওরা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল—এই ছবি দেখে ও ওর বর আর মেয়েকে চিনতে পারছে কি না! ওরা ফল্‌স্‌ দিচ্ছিল।"

—"ফল্‌স্‌ যে দিচ্ছিল, এটা কে ধরল, অগ্নিশিখা?"

—"না, আমার বউ ধরে ফেলছে। আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মা মা শোনেন, ওরা কিন্তু মিথ্যা। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের হাতে তো চুড়ি থাকবে না, ন্যাংটো থাকবে না। আমরা অমনি অগ্নিশিখাকে সরিয়ে নিয়ে গেছি।"

—"এঁরা কারা?"

—"দিল্লির হিন্দী পত্রিকার লোক, কাঁচড়াপাড়া বাড়ি। আপনাদের মত গাড়ি নিয়ে আসেনি।"

"আপনারা ছবিগুলো অগ্নিশিখাকে দেখতে যদি দিতেনও তাতেই বা কী হত?"

—"আমরা চাইনি এই জিনিসটা বাইর হোক। দেড় বছর ধরেই আমার নাতনি কথা-বার্তাগুলো বলছিল। আপনারা কী বললেন না, কী বইটা বের করবেন?"

—"সানন্দা।"

—"সানন্দায় তাড়াতাড়ি বের করে দ্যান, দেরি করতেছেন কেন?"

তারই মাঝে ঘরে ঢুকলেন অগ্নিশিখার বাবা অমিত দে। উচ্চতা পাঁচফুট চার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ইঞ্চি। স্বাস্থ্য ভালো। বয়স পঁয়তিরিশের মধ্যে। ওষুধের ব্যবসায়ী। এসে প্রথমেই জানালাটার ছিটকিনি লাগিয়ে সতর্কতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককেই

একবার ভালোমত 'মেপে' নিলেন, ঠাকুমা দরজার আড়ালে দাঁড়ানো বউমা সন্ধ্যাকে দেখে এগিয়ে গিয়ে অগ্নিশিখাকে নিয়ে এলেন। অগ্নিশিখা ঠাকুমাকে আঁকড়ে তখন পুতুল। শ্যামলা রঙ। মিষ্টি মুখ। কদমফুলের মতো চুল।

অমিতবাবু একটা চেয়ারে বসে, ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "সানন্দা তো সবই ইনভেসটিগেশন করেছে। সবকিছু টেপিংও করা আছে। ওখান থেকে তো সবই শুনতে পারবেন, জানতে পারবেন। আজ সকালে একজন আসছিল। তাকেও এ'কথা বলেছি।"

—"কিন্তু বর্তমান'কে তো বলেছেন।"

—"কথার ছলে একটু হয় তো বা হয়েছে।"

—"বর্তমানের ছবিটা দেখে মনে হল ওটা পুরনো ছবি। আপনারাই দিয়েছেন।"

—"হ্যাঁ, আমাদের অ্যালবাম থেকেই কথায় কথায় দিয়ে দিয়েছি।"

অগ্নিশিখার ঠাকুরদা অজিতবাবুর বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্য দেখে বোঝার উপায় নেই। উনি সরাসরি জানতে চাইলেন আমরা যে 'সানন্দা'রই লোক, অন্য কোনও পত্রিকার প্রতিনিধি নই, তার কোনও প্রমাণপত্র সঙ্গে আছে কি?

সুদীপ পকেট থেকে 'প্রেস-কার্ড' বের করে হাতে ধরিয়ে দিতে অজিতবাবু শুধু কার্ডটাই পড়লেন না, ছবির সঙ্গে সুদীপকে মিলিয়ে নিলেন, মাঝবয়সী এক প্রতিবেশী ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাঠে। আমাকে দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু ওঁকে আগে যেন কোথাও দেখেছি!"

অনিরুদ্ধই জিজ্ঞাসায় লাগাম পরালেন। "সাংবাদিক তো, কত জায়গায় ঘোরাফেরা করেন, দেখতেই পারেন।"

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। অগ্নিকে দেবযানী বলে প্রচার করার জন্য পত্র-পত্রিকাগুলোকে ব্যবহার করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অগ্নির পরিবারের মানুষজনের আছে—এ যেমন সত্যি; তেমনই সত্যি—ওরা প্রচার-মাধ্যমগুলোর মধ্যে কার কাছে মুখ খুলবে, কার কাছে খুলবে না, এ বিষয়ে অতি মাত্রায় সতর্ক। একটি বিশেষ ব্যক্তি (অনুমান করতে পারি—প্রবীর ঘোষ) ও একটি বিশেষ পত্রিকার (অনুমান করতে পারি, সাধারণত আমাদের সমিতির ও আমার সত্যানুসন্ধান যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেই 'আজকাল') আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনায় সদা শঙ্কিত ও সতর্ক।

এমন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই আমি নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। পরীক্ষান্তে সন্দেহের মেঘ কাটাতে পরিবারের সকলের মাথা থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নামল। অগ্নির মা সন্ধ্যা দে গুটোন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মুখ খুলছেন। "বছর দেড়েক ধরেই অগ্নি বলেছে, ওর কলকাতায় বিশাল বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। ছ'মাস আগে জানিয়েছে, ওর আগের জন্মের বাবার নাম ছিল ধনপতি দত্ত। তারপর তো সবই বলেছে—বিয়ের পর স্বামী চন্দন, শ্বশুর চন্দ্রনাথ বণিক আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুব মারত। চাইত, দেবযানী যাতে বাপের বাড়ি থেকে

মাঝে-মাঝেই টাকা এনে দেয়। শেষ পর্যন্ত চন্দন, চন্দ্রনাথ ওরা তো মেরেই ফেলল দেবযানীকে।"

অগ্নির বন্ধু হয়ে উঠতে একটুও দেরি হল না আমার। খাটের উপরে মাদুর বিছানো। তার উপরে আমি আর অগ্নি দুই বন্ধুতে তুমুল হুটোপুটি, খেলাধুলো শুরু করে দিলাম। অগ্নি আদৌ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। খেলতে খেলতে তারই মাঝে এটা-ওটা কথার মাঝে আমার প্রশ্নগুলো গুঁজে দিচ্ছিলাম। উত্তরও পাচ্ছিলাম।

—"আগের জন্মে তুমি স্কুলে পড়েছ?"

—"বলো কোন স্কুলে পড়েছ।" ঠাকুরমা বললেন।

—"নার্সারি।"

উত্তরটা ভুল। তবু সে কথা না বলে হৈ-চৈ করা খেলার মাঝখানে পরের প্রশ্নটা করলাম।

—"তুমি যে স্কুলে পড়েছ, সেটা ছোট না বড়?"

—"বড়।"

—"স্কুলটার কী রঙ ছিল?"

—"লাল রঙ।"

—"দিদিমণিদের নাম মনে আছে?"

—"দিদিমণি, দিদিমণি।"

—"স্কুলের বন্ধুদের নাম মনে আছে?"

—"বন্ধু, বন্ধু।"

—"বন্ধু, তার নাম।"

—"বন্ধুই বন্ধু।"

—"তার নাম শুধু বন্ধুই বন্ধু। বাঃ খুব ভাল বলেছ।"

—"তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"তোমার সুজাতা নামে এক বন্ধুর কথা মনে আছে?" (সুজাতা নামের বন্ধুটি আমারই কল্পনায় সৃষ্টি।)

অগ্নিকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম,

"তোমার বিয়েতে এসেছিল, অনেক গয়না দিয়েছিল। একটা জড়োয়ার সেট দিয়েছিল। মনে আছে?"

—"আমার আছে সেট। বাড়িতে আছে।"

—"সুজাতা নামে কোনও বন্ধুর কথা মনে পড়ে?"

ঠাকুমা অগ্নিকে বললেন, "লজ্জা কোরো না, বলো। ওই দেখুন ও হ্যাঁ বলছে, মুখ দিয়ে বলো।"

—"হ্যাঁ।"

—"তোমার মনে আছে রীতা দিদির কথা, তোমাকে পড়াত?"

—"হ্যাঁ....হ্যাঁ।"

—"বাঃ।"

ঠাকুমা পুতুলরানী নাতনীর এমন উত্তরে খুশি গদগদ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক বলেছে। ও বলেছিল ওর মাকে।"

শুনে হাসব, কি কাঁদব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। রীতা দিদি এক কাল্পনিক চরিত্র। আর তাকে নিয়েই কি না....। শিশুর খামখেয়ালিপনাকেও কাজে লাগিয়ে যেভাবে পুতুলরানী অগ্নিকে দেবযানী প্রমাণ করতে তৎপরতা দেখালেন, তাতে বিষয়টাকে নতুন করে ভাবতে বসাটাই অতিমাত্রায় যুক্তিসঙ্গত মনে হল।

—"আমার বই দেখবে?"

—"নিশ্চয়ই দেখব, দেখাও, দেখাও।"

অগ্নি কাচ-আলমারি থেকে একটা ছড়া-ছবিতে এ-বি-সি-ডি'র বই বের করতে গিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল আর একটি চটি বই। বইটি পর্নো-পুস্তক। পুতুলরানী দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে পর্নো-পুস্তক বা 'নীল-বই'টি তুলে রাখলেন তাকে। যে বইটির উপর রাখলেন, সেটিও একটি 'নীল-বই'। ওই আলমারিতে কেন, গোটা ঘরেই আর কোনও বইয়ের দেখা পেলাম না। দেখা পেলাম না গত কালকের 'বর্তমান' ছাড়া আর কোনও পত্রিকার। পড়াশুনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন একটি পরিবারের পক্ষে আমার সম্বন্ধে জানা ও তার দরুন শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক নয়, কখনই স্বাভাবিক নয়। কেউ তবে আমার আগমনের সম্ভাবনা বিষয়ে অগ্নির পরিবারকে অবহিত করেছেন, সতর্ক করেছেন? কে?? সেই কি তবে অগ্নিদের চালিত করছে আড়ালে থেকে??

অগ্নি বইয়ের ছবিগুলো দেখাচ্ছিল। আমি একটা করে ছবি দেখিয়ে বলে চলেছিলাম, "এটা জবা, এটা গ্যাঁদা, এটা গোলাপ।" অগ্নিও ছবিগুলোতে আঙুল ঠেকিয়ে বলে চলেছিল, "জবা, গ্যাঁদা, গোলাপ।" পদ্মফুলের ছবি দেখিয়ে বললাম, "এটা পদ্ম। মনে আছে পদ্ম তোমাদের বাড়িতে কাজ করত?"

পুতুলরানী বললেন, "ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে চাইছে," এখানেও গোলমাল। 'পদ্ম', আমারই সৃষ্ট একটি চরিত্র।

—"আমাদের বাড়িতে একটা ব্যাঙ আছে।"

—"সেটা কী করে? টাকা দেয়? না লাফায়?"

—বাইরের উঠোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে অগ্নি বলল, "ওই জায়গায় ব্যাঙ থাকত। ধুপ্ ধুপ্ করে লাফাত। ব্যাঙ আবার টাকা দেয় না কি! কি বোকা!"

বুঝতে আমাদের কারুরই অসুবিধে হলো না, 'ব্যাঙ' বলতে অগ্নি 'ব্যাঙ'ই বুঝিয়েছিল 'ব্যাঙ্ক' নয়।

—"তোমাদের কটা গাড়ি ছিল মনে আছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কটা।" .

—"একটা।"

—"কী রঙের গাড়ি গো?"

—"সাদা রঙের।"

—"কোন বাড়িতে, বিয়ের আগে?"

—"না।"

অগ্নির বাবা একটুক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একটা ছোট্ট ঠোঙায় চানাচুর নিয়ে। অগ্নির হাতে ঠোঙাটা দিতেই ও মহা-আনন্দে শোরগোল তুলে ঢেলে দিল বইয়ের উপর। তারপর খুঁটে খুঁটে দুটো-চারটি দানা মুখে ফেলতে লাগল। আমার মুখেও ফেলল কয়েকবার।

—"তুমি ক্যাডবেরি খেতে ভালবাস?"

—"অগ্নির বাবাই উত্তর দিলেন, "না না, ক্যাডবেরি দেবেন না। খাবে না, .ফলে দেবে। সানন্দার বাল্মীকিবাবু ক্যাডবেরি দিয়েছিলেন। ও ফেলে দিয়েছে।"

ধাক্কা খেলাম, বড় একটি ধাক্কা। বাল্মীকি কেন মিথ্যে তথ্য হাজির করলেন তাঁর লেখায়? কেন জানালেন, অগ্নি ক্যাডবেরি ভালবাসে, ক্যাডবেরি ভালবাসত দেবযানী। দেবযানীর ক্যাডবেরি প্রেমের খবর দিয়েছিল দেবযানীরই মেজভাই গোরা। দেবযানী ও অগ্নির খাবারের পছন্দেও মিল ছিল—এমন মিথ্যে তথ্য হাজির করার মধ্যে আর যাই থাকে, সত্যানুসন্ধান ছিল না। তবে কী ছিল?

দ্বিধা ও সংশয়ে দীর্ণ হতে হতেও আবার মন দিলাম বন্ধু অগ্নির দিকে।

—"আগের জন্মে তোমার বাবার নাম কী ছিল গো?" অগ্নিকে জিজ্ঞেস করলাম।

—"ধনপতি দত্ত।"

—"কী করে জানতে পারলে তোমার বাবার নাম ধনপতি দত্ত? কে বলেছে তোমাকে?"

উত্তর দিল না অগ্নি। "এখনকার বাবার নাম কী? মনে আছে" প্রশ্ন করলাম।

—"অমিত দে।"

—"কে তোমাকে শেখালো বাবার নাম অমিত দে?"

উত্তর পেলাম না, আমি নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললাম, "এই জেঠুটার নাম কী বলোতো?"

অগ্নি চুপ। বললাম, "এই জেঠুর নাম সঞ্জয়। মনে থাকবে? কী বলোতো আমার নাম?'

—"ছঞ্জয়।"

—"তাহলে এই জেঠুটার নাম?"

—"ছঞ্জয়।"

—"আমার নাম যে ছঞ্জয়, কে শেখাল গো?"

—"তুমি।"

—"কে বলল গো, তোমার বাবার নাম ধনপতি দত্ত?"

—"মা।"

—"তোমার বিয়ে হয়েছিল ওগুলো কে বলল গো?"

—"মা।"

শরবত খেতে খেতে আমরা অগ্নির বাবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, "দেবযানীর মেজ'দা কি আজ-কালের মধ্যে আসবেন?"

উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন খচ্-খচ্ করছে, দত্ত পরিবারের সব্বাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু মেজদার কথাই তুললেন কেন অমিতবাবু? উনি কি তবে খবর পেয়েছেন, দেবযানীর মেজদা দেবযানীর ফিরে আসার খবরে আপ্লুত? কী করে এই খবর অমিতবাবু পেলেন? এটাও একটা কোটি টাকার প্রশ্ন।

অগ্নি আমাদের কাছে দেবযানীর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা ও কিছু কিছু ব্যক্তির উল্লেখ করেছিল। তার কিছু ঠিক; কিছু ভুল। দেবযানী সংক্রান্ত সেই সেই তথ্যই ঠিক-ঠাক দিতে পেরেছিল, যে'সব তথ্য ১৯৮৩-র পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; অথবা একটু চেষ্টা করলেই সংগ্রহ করা সম্ভব। ১২ জুন '৯৪ সকালে আমাদের সমিতির সদস্য সুদীপ দে সরকার এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। বরাহনগরে ছোটখাট একটি কারখানার অংশিদার। কাজের সুবাদে বর্ধমানেও যান-টান। তিনি ধনপতি দত্ত পরিবারের নানা ধরনের ব্যবসার খোঁজ-খবর রাখেন, দেখলাম। দত্ত-পরিবারের নানা ব্যবসা, যথা, কোল্ডস্টোরেজ, পেট্রলপাম্প, বাজার, সিনেমা হল, পুকুর, স্টিলের নৌকো তৈরি ইত্যাদি অনেক কিছুর হদিসই দিলেন। চন্দ্রনাথ বণিক পরিবারের অনেক কথাই সুদীপের জানা, যে-সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এমন জানা মানুষ নিশ্চয়ই সুদীপ একা নন। এমন দুই বিখ্যাত ধনী পরিবার দেবযানী হত্যার পর আরও বেশি প্রচারের আলোয় এসেছেন। ফলে, ওই দুই পরিবারের বিভিন্ন হাঁড়ির-খবর জানা মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে।

অগ্নি সেই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন; অথবা শুধুমাত্র দেবযানী এবং তার ঘনিষ্ঠদের পক্ষেই জানা সম্ভব।

অগ্নির কিছু সাফল্য ও কিছু ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করলে এমনটা সন্দেহ করার অবকাশ থেকেই যায়, একটি সরল শিশুকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করতেই শিশু মনে বারংবার ঢোকানো হয়েছে—তোর আগের জন্মের বাবার নাম ধনপতি দত্ত; তোর বিয়ে হয়েছিল বণিক পরিবারে....ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এমন একটা সিদ্ধান্তে কেন এলাম? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে, অনেক

মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ-চিকিৎসক নিশ্চয় বলতে পারেন—এমনও তো হতে পারে, অগ্নি কারও কাছ থেকে দেবযানীর কথা শুনেছিল এবং দেবযানী-কাহিনি ওর শিশু মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, আকৃষ্ট করেছিল। ফলে অগ্নি প্রায়ই দেবযানীর কথা ভাবতে শুরু করে এবং ভাবতে ভাবতে এক সময় মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার জন্য অগ্নি নিজেকে দেবযানী বলে ভাবতে শুরু করেছে এবং দেবযানী সংক্রান্ত শোনা তথ্যগুলো উগরে দিচ্ছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের এই যুক্তি অগ্নির বেলায় খাটে না। কারণ অগ্নির মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার জবানবন্দী অনুসারে তাঁরা কেউই অগ্নির দেওয়া দেবযানীর তথ্যগুলো আগে জানতেনই না। অগ্নির কাছে দেবযানীর জীবনের কথা তাঁরা নাকি আগে কোনও দিনই বলেননি। অন্য কোনও আপনজনের পক্ষেও নাকি অগ্নিকে দেবযানীর গল্প শোনানো সম্ভব নয়। কারণ অগ্নির অভিভাবকদের অগোচরে অগ্নি তেমন কোথাও যায় না। তিন বছরের শিশু বলেই যায় না, সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে বিচার করলে এককথাই বলতে হয়—অগ্নি কোনও মানসিক রোগী নয়, যেমনটা অনেক সময় মানসিক রোগীরা ভাবতে থাকে সে আগের জন্মে অমুক ছিল, বা তাকে ভূতে ধরেছে, অথবা তার উপর ঈশ্বরের ভর হয়েছে। অগ্নিকে কেউ দেবযানীর জীবনের বেশ কিছু কথা বার-বার শুনিয়েছে এবং বুঝিয়েছে—সে ছিল দেবযানী।

কেন এমনটা বোঝাবে? দেবযানী দত্ত পরিবারের 'চোখের মণি', 'আদরের ধন' ছিল—এ'কথা অনেকেরই অজানা নয়। ওই আদরের ধন আবার ফিরে এসেছে প্রমাণিত হলে কোটিপতি দত্ত পরিবারের ভালোবাসার কিছুটা চুঁইয়ে নামলেও বিশাল লাভ—এই হিসেব কষেই কি অগ্নিকে দেবযানী দত্ত (বণিক) বানাবার এক চক্রান্ত দানা বাঁধতে শুরু করেছে?

এই জিজ্ঞাসাটা বিশাল হয়ে ওঠে, যখন দেখি, পাড়া-প্রতিবেশী কেউই অগ্নির জাতিস্মর হওয়ার খবর জানতে পারলেন না গত দেড় বছরে। তাঁরা জানলেন একটি পত্রিকা পড়ে। অথচ মেয়ে 'জাতিস্মর'—এমন আবিষ্কারের কথা অগ্নির পরিবারের মানুষদের সবচেয়ে আগে বলার কথা প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠদেরই। এটাই ছিল মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ। কেন এই স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাশ দে-পরিবারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত?

পাড়া-পড়শিরা কেউ জানতে পারলেন না, অথচ কলকাতার বড়-বড় পত্রিকাগুলোকে এই জাতিস্মরের খবর খাওয়ানো হয়েছে। কারা খাওয়ালেন? কারা ছিলেন এই প্রচার-মাধ্যমগুলোর যোগাযোগ মাধ্যম?

দে পরিবার কেন চাইছেন না, অগ্নি তার পূর্বজন্মের স্মৃতি ভুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক? কেন তাঁরা হাঁক-পাঁক করছেন—অগ্নি যে দেবযানী এটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খুব দ্রুত প্রচারিত হোক?

এটা আমাদের চারজনের (আমি, অনিরুদ্ধ, উজ্জ্বল ও সুদীপ) কাছেই পরিষ্কার

ছিল, দে পরিবার অগ্নির বিষয়টা প্রচারে আনতে আগ্রহী হলেও কোনও এক পত্রিকা-লেখকের আগমন আশংকায় অতিমাত্রায় সতর্ক। আমরা অনুমান করতে পারি, পত্রিকা লেখকটি আর কেউ নন, স্বয়ং আমি। সত্যানুসন্ধানে কেন ভয় থাকবে? ঘটনা সত্যি হলে, এমন ভয় থাকতেই পারে না। তবে কি দে পরিবার তাঁদের মিথ্যে ধরা পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন?

পত্র-পত্রিকা ও লেখা-পড়ার জগৎ থেকে শত কিলোমিটার দূরে থাকা দে-পরিবারের পক্ষে ভয়ের কারণ হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করা স্বাভাবিক নয়। পরিবারের বাইরের অন্য কোনও পরিপক্ক মাথা কি তবে গোটা ব্যাপারটা ঘটিয়ে চলেছেন, এবং তিনি আমার সম্পর্কে ভালমতই খোঁজ-খবর রাখেন?

এরপরও কেউ যদি প্রশ্ন করেন, তিন বছরের একটা বাচ্চার পক্ষে কি এত কিছু মনে রাখা সম্ভব? তাহলে বলব, সাধারণ ও স্বাভাবিক বুদ্ধির একটি তিন বছরের বাচ্চার উপর পরীক্ষা চালালেই প্রশ্নকর্তা দেখতে পাবেন, এই ধরনের গপ্পো ওরা কী দারুণ রকম মনে ধরে রাখে।

পরিশেষে সম্ভাব্য পরিপক্ক মাথা ও দে পরিবারের প্রতি আন্তরিক অনুরোধ—একটি মেয়ের সুস্থ জীবনকে অসুস্থ করে তোলার অমানবিক খেলা থেকে বিরত হোন। অর্থ-লোভে পরমাত্মীয়ের বুকে ছুরি মারার ইতিহাস যেমন নতুন নয়, বরং বহমান, তেমনই বহমান সমাজে মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষদের উপস্থিতি। তাই তো আজও দেখা মেলে রেল ক্রসিং-এর গেটকিপার শুকদেবের, যে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচায় পরের জীবন; ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বপন সাহা এক সাপে-কাটা অপরিচিতকে নিয়ে হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে নিজের শেষ সম্বলটুকুও উজাড় করে দেয়। সমাজের এমন সচেতন মানুষরাই পারেন, এমন ঘটতে যাওয়া অমানবিক ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে।

২৪ জুন ১৯৯৪ সংখ্যায় 'সানন্দা'য় আমার প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল কিঞ্চিৎ বাড়তি গুরুত্ব সহকারে (সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছিল আমাকে অকুস্থলে তদন্তে পাঠাবার কথা, ছবি-সহ ছাপা হয়েছিল আমার একটি সাক্ষাৎকার। আর প্রতিবেদন— সে তো ছিলই)। প্রতিবেদনটির শেষে লিখেছিলাম, "আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতো সুন্দর এক শিশুর জীবনে নেমে আসতে পারে কয়েক জোড়া কঠিন হাতের শাসন। যেমনটা অনেক সময়েই ফেল করা শিশুদের উপর নেমে আসে। সেখানে অগ্নির প্রতিবেশীদের প্রতি অনুরোধ—অগ্নির খারাপ দিন এলে, তার পাশে দাঁড়ান। 'মানুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করুন।"

যে আবেদন অগ্নির প্রতিবেশীদের কাছে রেখেছি, সেই আবেদনই রাখছি আগামী কোনও অগ্নির প্রতিবেশীদের উদ্দেশেও। আপনারাই পারেন বুজরুকি বন্ধ করতে, আপনারাই পারেন লোভীর অত্যাচার থেকে তথাকথিত জাতিস্মরকে বাঁচাতে, মানুষ করে গড়ে তুলতে।

অগ্নিশিখা সম্বন্ধে বাল্মীকি যা বলেছেন	বাস্তবে যা দেখেছি
১. অগ্নি আধো-আধো ভাষায় কিন্তু বড়দের মতো গুছিয়ে কথা বলে। যেমন, "আমি দুম করে পড়ে গেলাম। মাতিতে। মাথায় খুব লাগল। এখানতায়, দেখো দেখো, তখন আমাকে পেতাল। পেতে লাথি মারল। দমাদ্দম, দমাদ্দম লাথি মারল। বলল, তোকে মারব...." ইত্যাদি।	১. অগ্নি আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের তিন বছরের শিশুর মতই এলোমেলো ভাষায় কথা বলে। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ওর সঙ্গে কাটিয়েছি খেলে, গল্প করে। দেখেছি অগ্নি আদৌ গুছিয়ে কথা বলে না।
২. "অগ্নিশিখার চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা শোনার পরই লাইব্রেরিতে গিয়ে বণিক হত্যার যাবতীয় ফাইলপত্র আবার ঘেঁটে ফেলা হয়। কীভাবে মারা গিয়েছিল দেবযানী? কে কে মেরেছিল? বাপের বাড়ি কোথায়? কিন্তু এত তথ্য কোনও কাজেই লাগল না। কারণ, ওই ছোট মেয়েটি নিজে থেকে তার আগের জন্ম নিয়ে যতটুকু বলেছে তার বেশি কিছু পাইনি ফাইল ঘেঁটে।"	২. অগ্নি ততটুকুই ঠিক বলেছে, যতটুকু ফাইলে আছে, কাগজে প্রকাশিত হয়েছে অথবা যতটুকু একটু কষ্ট করলেই জানা সম্ভব। অগ্নি সে'সব তথ্য ভুল দিয়েছে, যে'সব ফাইলে নেই, সামান্য আয়াসে জানা সম্ভব নয়। অথচ অগ্নি আগের জন্মে দেবযানী হলে ওইসব তথ্য অবশ্যই জানা উচিতই।
৩. অগ্নি জানিয়েছিল—বাড়ির নীচে 'উবি ব্যাঙ' আছে। বাস্তবিকই কলকাতায় ধনপতি বণিকের (দেবযানীর শ্বশুর) বাড়ির নীচে রয়েছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে ইউ.বি.আই.। অগ্নিশিখা আধো-আধো কথায় 'উবি ব্যাঙ' বলে 'ইউ.বি.আই.-কেই বোঝাতে চেয়েছিল।	৩. অগ্নি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিল ওর বাড়ির ব্যাঙটা টাকা দেয় না, লাফায়। অর্থাৎ ওর 'ব্যাঙ' ব্যাঙই ছিল, 'ব্যাঙ্ক' নয়।
৪. অগ্নিশিখা ক্যাডবেরি ভালবাসে, যেমনি ভালবাসত দেবযানী।	৪. অগ্নির বাবা জানিয়েছিলেন, অগ্নি ক্যাডবেরি এতটাই অপছন্দ করে যে, ফেলে দেয়।

মন্তব্য : গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।

জাতিস্মর তদন্ত ৩ : সুনীল সাক্সেনা

'সুনীল সাক্সেনা' বিশ্বের তাবৎ প্যারাসাইকোলজিস্টদের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম—এক অতিবিতর্কিত নাম! সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার কথা প্রথম প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ৩ জানুয়ারি। সুনীলের জন্ম ও নিবাস উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট শহর আওনলায় ১৯৫১-এর ৭ অক্টোবর। ছ' ভাই-বোনের মধ্যে সুনীল তৃতীয়।

সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল সাক্সেনা চালাক-চতুর ও কর্মঠ মানুষ। সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার সময় চাদাম্মিলাল একটা কোল্ড-স্টোরেজে কাজ করতেন। সঙ্গে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য বুটিক প্রিন্টের কাজ করতেন। প্রিন্টের কাজটা করাতেন একজন কর্মচারীকে রেখে, অর্ডারটা নিতেন নিজের নামে। মা রামেশ্বরী ছোট্ট একটা স্কুলে পড়াতেন। মোটামুটি আয়, পেট অনেক। টেনে-টুনে দিন চলত।

একবার সুনীল মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনার বাড়ি। কাকা থাকেন নিউ দিল্লি। সময়টা ১৯৬৩ সাল। কাকার অবস্থা ভাল। বাড়িতে রেডিও, ফ্রিজ, ফোন সবই আছে। রেডিওর গান শুনে, ফ্রিজের ঠান্ডা জল আর আইসক্রিম খেয়ে, ফোনের মধ্যে দিয়ে দূরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে দেখে চার বছরের চালাক-চতুর সুনীল দারুণ উত্তেজিত, বেজায় খুশি।

কাকার বাড়ি থেকে ফিরে এলেও রেডিওর গান, আইসক্রিমের স্বাদ, ঠাণ্ডা জল খাওয়ার মজা ও ফোনে কথা বলার আকর্ষণকে এড়াতে পারল না। এই সময় প্রথম মা'কে জানায়—ও আগে খুব বড়লোক, 'শেঠ আদমী' ছিল। ওর বাড়িতেও রেডিও, ফ্রিজ, ফোন, সবই ছিল।

মা প্রথম প্রথম সুনীলের ও'সব কথাকে একটুও গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এরপর থেকে নাকি সুনীল পূর্বজন্মের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে এমন সব বর্ণনা দিতে থাকে, যাকে আর 'ছেলেমানুষি' বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। সুনীল নাকি এই সময় জানিয়েছিল ও ছিল 'বুধায়ুন' শহরের এক 'শেঠ' বা ধনী ব্যবসায়ী। নিজের বিশাল বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, টাঙা ছিল। কারখানা ছিল। বুধায়ুনে কলেজ তৈরি করে দিয়েছিল ও। চার বিয়ে। দুটি ছেলে, একটি নিজের। আর একটিকে দত্তক নিয়েছিল। চতুর্থ স্ত্রী জলে বিষ মিশিয়ে পান করিয়েছিলেন। তাতেই মৃত্যু। বুধায়ুন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বন্ধু পাঠকজী। টাউন স্কুলে পড়েছিল। সেই স্কুলের এক মাস্টারের কথা খুব মনে পড়ে, যাকে ডাকত 'মাস্টার সাহেব' বলে।

সুনীলের কাছে এ'সব কথা শুনেছিলেন ওদের বাড়িওয়ালা গোবিন্দ মুরারীলাল। গোবিন্দ সব শুনে সুনীলের কথাগুলো যাচাই করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন। সুনীলের বাবা চাদাম্মিলালকে চাপ দিতে থাকেন, বোঝাতে থাকেন—সুনীল বাস্তবিকই জাতিস্মর না এ'সবই ওর পাগলামি, এটা জানার জন্যই সুনীলকে একবার

বুধায়ুনে নিয়ে যাওয়াটা জরুরি। গোবিন্দ আরও বলেন, তাঁর আপাতভাবে মনে হচ্ছে সুনীল বোধহয় শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়ালের কথা বলছে। শেঠ শ্রীকৃষ্ণ বুধায়ুনের বিশাল নামী-দামী মানুষ ছিলেন। মারা গেছেন সুনীলের জন্মের বছর কয়েক আগে।

আওনলা থেকে বুধায়ুন মাত্র ৩৫ কিলোমিটারের পথ। তবু যাচ্ছি-যাব করে আরও দু-একটা মাস গড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সুনীলকে নিয়ে ওর বাবা-মা গেলেন বুধায়ুন। নির্দিষ্ট লক্ষ্য—সুনীল সত্যিই জাতিস্মর কী না, এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধান, সঙ্গী হিসেবে গেলেন চাদাম্মিলালের এক বন্ধু। তারিখটা ২৯ ডিসেম্বর। সাল : ১৯৬৩।

সুনীল ও ওর মা-বাবার বক্তব্য অনুসারে—সুনীল ওখানে গিয়ে সত্যিই আমাদের সব্বাইকে অবাক করে দিল। শুধু আমাদেরই বা বলি কী করে! শেঠ শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় এবং পরিচিতেরাও দারুণ রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ও চিনতে পেরেছিল শেঠজীর চতুর্থ পত্নী শকুন্তলাদেবীকে, দত্তক পুত্র শ্যামপ্রকাশ ও শেঠজীর ঘনিষ্ঠজনদের। শেঠজী-প্রতিষ্ঠিত কলেজ দেখে সুনীল জানিয়ে ছিল—এই কলেজই আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম। শেঠজীর প্রাসাদতুল্য বাড়িটি দেখেই নিজের বাড়ি বলে চিনতে পেরেছিল।

সুনীলের বুধায়ুনে আগমন ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রচারমাধ্যমগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুনীলের উপর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে ছুটে এসেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির (নাকি অখ্যাতি?) অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা। '৬৪-র ডিসেম্বরই সুনীলকে নিয়ে অনুসন্ধানে নামলেন প্রণব পাল। তারপর '৭১-এ এলেন আয়েন স্টিভেনসন। '৭৪-এ ময়দানে নামলেন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ এল.পি. মেহেরোত্রা। অনুসন্ধান শেষে তিনজনই দাবি জানালেন—সুনীল জাতিস্মর। কারণ হিসেবে তিনজনই জানালেন—সুনীলের দেওয়া বেশিরভাগ তথ্যই আশ্চর্য রকম ঠিক এবং শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠদের সকলকেই ও চিনতে পেরেছিল। আয়েন স্টিভেনসন তো সুনীলকে নিয়ে বই-ই লিখে ফেললেন, তারপর পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে গেল। 'অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারত'ও চুপ করে রইল না। নানা ভাষাভাষি পত্র-পত্রিকাও গা ভাসাল সুনীলের স্রোতে।

শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল-এর শেষ জীবন এবং

শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল ছিলেন সম্ভবত শহরের সবচেয়ে বড় ধনী। শেঠজী'র ঘনিষ্ঠমহল থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাঁর শেষ বয়সের উপর কিছু আলোকপাত করছি।

শেঠজীর দুটি বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। এক : ধর্ম-কর্ম; দুই :

যৌন-আকাঙ্ক্ষা। শেঠজী প্রতিদিন পুজো করতেন। বহু দেব-দেবতাতেই ভক্তি থাকলেও রামের প্রতি ছিল একটু বাড়তি ভক্তি। শহরের গান্ধী পার্কে প্রতিবছর রামলীলা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসাতেন শেঠজী। অনেক দূর দূর থেকেও লোক আসত মেলায়। উত্তরপ্রদেশের অনেক জায়গাতেই ধর্মশালা করে দিয়েছিলেন। শহরে নিজের প্রাসাদ ছাড়াও ছিল আরও কয়েকটি বাড়ি। তৈরি করে দিয়েছিলেন কলেজ। তেলের বিরাট মিল ছাড়াও ছিল আরও ব্যবসা।

চারটি বিয়ে করেছিলেন শেঠজী। চতুর্থ বিয়ের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এক উত্তরপ্রদেশের আদিবাসীর স্ত্রীর রূপ-যৌবনে মোহিত হয়ে শেঠজী আদিবাসী পুরুষটিকে মোটা টাকা দেন। সেই সঙ্গে বাঁধা মাসোহারার ব্যবস্থা। তারপর ষোড়শী সুন্দরীটিকে বিয়ে করে প্রাসাদে তুললেন। নাম দিলেন শকুন্তলা। শকুন্তলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। অন্য জায়গা থেকে শকুন্তলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসায় বিয়ের পিছনের ঘটনা হাতে গোনা দু-চারজন ছাড়া প্রায় সকলেরই ছিল অজানা। কিন্তু শকুন্তলার স্বামী এক সময় বুধায়ুনে এসে 'ব্ল্যাকমেল' করতে থাকে শেঠজীকে। শহরে এই নিয়ে দ্রুত কানাকানি শুরু হয়। এই কেলেংকারি শেঠজীর বিপুল জনপ্রিয়তায় কিছুটা ফাটল ধরিয়েছিল।

শেঠ শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ এস.ডি. পাঠক ছিলেন শেঠজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঘনিষ্ঠতা এতই গভীর ছিল যে পাঠকজী থাকতেন শেঠজীর প্রাসাদেই। শেঠজী শেষ বয়সে এই পাঠকজীর কাছ থেকেও গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। শেঠজী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন পাঠকজীর সঙ্গে শকুন্তলার একটি অবৈধ সম্পর্ক আছে। শেঠজী নিজে যৌন অক্ষম ছিলেন না। যৌন ক্ষমতাকে ধরে রাখতে শরীরচর্চার পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ওষুধও সেবন করতেন। শেঠজী বাস্তবিকই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ভালোবাসার (?) বিনিময়ে শকুন্তলার এমন বিশ্বাসঘাতকতা শেঠজীর মন ভেঙে দিয়েছিল। ভাঙা মন আরও খান্-খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে, যখন শেঠজী আবিষ্কার করলেন তাঁরই দত্তক পুত্র শ্যামপ্রকাশের সঙ্গেও শকুন্তলা একই সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলেছে।

১৯৫১ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে শেঠজী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। বিকেলে মৃত্যু। শহরে গুজব ছড়ায় শেঠজীকে বিষ পান করিয়ে মারা হয়েছে। মেরেছেন শকুন্তলা। ষড়যন্ত্রের আড়ালে শ্যামপ্রকাশ ও পাঠকজীই আছেন বলে রটে যায়। পরবর্তীকালে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে আমার মনে হয় হত্যার কাহিনি স্রেফ গুজবই।

শেঠজীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয় ও ব্যবসার অংশীদারদের মধ্যে নানা ধরনের ঝগড়া-বিবাদ-ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মাথা চাড়া দেয়। এরই মধ্যে শকুন্তলাদেবী কলেজের প্রেসিডেন্ট হলেন, যদিও তিনি লেখাপড়া জানতেন না। সম্ভবত একই সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ও শেঠজীর দত্তক পুত্রকে নাচাতে পারারই পুরস্কার এটা।

শেঠজীর নিজের ছেলে রামপ্রকাশ তখনও নাবালক এবং শকুন্তলাই তার অভিভাবক।

শকুন্তলা এক সময় খোলামেলাভাবেই শ্যামপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর প্রেম-প্রেম খেলা চালাতে লাগলেন। শেঠজীর স্ত্রী শেঠজীরই ছেলের সঙ্গে প্রেম করছেন—এটা মেনে নিতে পারেনি শহরের তামাম মানুষ। সম্পর্কে মা-ছেলের এই জৈবিক প্রেম শেঠজীর কলেজের ছাত্র ও অভিভাবকদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে শকুন্তলাদেবী কলেজের প্রেসিডেন্টের পদ হারান; হারান রামপ্রকাশের অভিভাবকত্বও। এতে শকুন্তলাকে বাগে আনা গিয়েছিল, বা তাঁর স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনা গিয়েছিল, এমন ভাবার মত কোনও দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। শকুন্তলা শ্যামপ্রকাশকে বিয়েই করে ফেললেন। এ'ভাবে শকুন্তলা 'অফিসিয়াল' তৃতীয় বিবাহ সেরে ফেললেন ছেলের সঙ্গে।

ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ পাঠকজীর যৌন-কেলেংকারি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি জন-রোষে কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। অধ্যক্ষ পদে আনা হয় নরেন্দ্র মোহন পান্ডাকে। নরেন্দ্র মোহনও শেঠজীর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি।

অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি

১৯৭১-এর শেষে সুনীলের আওনলায় যাই। আওনলা বেরিলি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। সুনীল তখন সিক্সের ছাত্র। সুনীলের মা-বাবা জানালেন ও ছাত্র ভাল। সেকেন্ড স্ট্যান্ড করে ক্লাসে উঠেছে। সুনীল পোশাক-আশাকে যে টিপ্‌টপ্‌ থাকে, সেটা দেখেছিলাম। বিভিন্ন সাক্ষীরা জানিয়েছিলেন 'টিপ্‌টপ্‌ থাকাটাই সুনীলের অভ্যেস। সুনীল আমার সঙ্গে চা খেয়েছিল। খাদ্যাভাসের পরিচয় নিতে গিয়ে জেনেছি—আমিষাশী।

এই অনুসন্ধান পর্বে আমি বুধায়ুনেও গিয়েছিলাম। শেঠজীর ঘনিষ্ঠ মানুষজনদের সাক্ষ্য থেকে জেনেছি শেঠজী পোশাক-আশাকের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সাজগোজে কোনও বিলাসিতা ছিল না। চা কখনই খেতেন না। নিরামিষাশী ছিলেন।

তিন প্যারাসাইকোলজিস্ট অন্তত একবার করে ঘোষণা রেখেছিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন শেঠজী'র পরিবারের সঙ্গে সুনীলের পরিবারের কোনও যোগসূত্র ছিল না। সুতরাং শেঠজী সম্পর্কে খুঁটিনাটি বহু কিছু জানা সুনীলের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। তিন প্যারাসাইকোলজিস্টের মধ্যে যিনি সবচেয়ে নামী-দামি সেই আয়েন স্টিভেনসন 'India Cases of the Reincarnation Type' গ্রন্থে সুনীল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১১০ পৃষ্ঠায় লিখছেন, "So far as I could ascertain, the two families had no prior acquaintance before the development of the case. Sakuntala Devi, widow of Seth Sri Krishna,

on the one side, and Chadammi Lal Saxena, Sunil's father, on the other side, both denied any previous knowledge of the other's family. Chadammi Lal Saxena said he had never heard of the Seth or his college in Budaun until Sunil began talking about him." অর্থাৎ—আমি নিশ্চিত, দুটি পরিবার এই ঘটনার আগে উভয়ের বিষয়ে কিছুই জানত না। শকুন্তলাদেবী এবং সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল দু'জনেই জানিয়েছিলেন, দুই পরিবারই এই ঘটনার আগে দুই পরিবারের পরিচিত ছিল না।

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
১. আমি বুধায়ুনে ছিলাম। নাম ছিল কিষেণ।	১. রামেশ্বরী সাক্সেনা ২. চাদাম্মিলাল সাক্সেনা ৩. গোবিন্দ মুরালীলাল (সুনীলদের বাড়িওয়ালা)	বুধায়ুনের ধনী শেঠ হিসেবে সুনীল যাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁর নাম কিন্তু কিষেণ ছিল না। ছিল শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল। তথ্য ভুল।
২. বাড়িতে রেফ্রিজারেটর ছিল।	১. জয়নারায়ণ সাক্সেনা (সুনীলের নয়াদিল্লির কাকা) ২. সুনীলের বাবা ৩. সুনীলের মা ৪. শকুন্তলাদেবী	সুনীল রেফ্রিজারেটর কথাটি না বলে ফ্রিজ দেখিয়ে বলেছিল—আমার বাড়িতেও এটা ছিল, জানিয়েছিলেন জয়নারায়ণ সাক্সেনা। শকুন্তলাদেবীর সাক্ষ্যে জানতে পারি, শেঠজীর মৃত্যু পর্যন্ত বাড়িতে কোনও ফ্রিজ ছিল না। তথ্য ভুল।
৩.মোটর ছিল কালো রঙের।	১. সুনীলের বাবা ২. সুনীলের মা ৩. শকুন্তলাদেবী ৪. রামপ্রকাশ (শেঠজীর পুত্র)	সুনীল জানিয়েছিল ওর মোটর ছিল। রামপ্রকাশ জিজ্ঞেস করে, "মোটরের রঙ কী ছিল?" উত্তরে সুনীল জানিয়েছিল কালো। শকুন্তলা ও রামপ্রসাদের সাক্ষ্য অনুসারে গাড়ির রঙ ছিল 'চকোলেট'। তথ্য ভুল।

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
৪. কলেজ 'পাড়া মহল্লা'য় অবস্থিত।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. নরেন্দ্রমোহন পাণ্ডা (শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ) ৪. স্থানীয় মানুষজন	'পাড়া মহল্লা' বলে বুধায়ুনে কোনও অঞ্চল বা পাড়াই নেই। কলেজ যে অঞ্চলে, তার কাছে রয়েছে 'বড়া বাজার'। তথ্য ভুল।
৫. টাঙা ছিল। টাঙার ঘোড়ার রঙ ছিল কালো।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. এস. ডি. পাঠক (কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ৪. সাফাৎ উল্লা (শেঠজীর 'মুনশি')	ঘোড়ার রঙ ছিল লালচে বাদামী। কালো নয়। তথ্য ভুল।
৬. চার বিয়ে, এক স্ত্রীর গায়ের রঙ কালো। তিনজন ফর্সা।	১. সুনীলের মা ২. স্থানীয় মানুষ ৩. পাঠকজী	চার বিয়ে। এবং তৃতীয় স্ত্রীর গায়ের রঙ কালো ছিল। তথ্য ঠিক।
৭. বড় মেলা বসাত বুধায়ুনে।	১. রামেশ্বরী (সুনীলের মা) ২. স্থানীয় মানুষ	মেলা বসত রামনবমী উপলক্ষে। মেলা বসাতেন শেঠজীই। তথ্য ঠিক।
৮. একটা সিনেমা হল ছিল।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. পাঠকজী ৪. রামেশ্বরী ৫. স্থানীয় মানুষ	না। কোনও সিনেমাহল ছিল না। একটা হল তৈরি করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই হলটা ছিল 'স্টোর হাউজ'। সিনেমা হল নয়। তথ্য ঠিক নয়।
৯. 'মুনশি' সাফাৎ উল্লাকে চিনতে পেরেছিল।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. 'মুনশি'জী	সুনীলের মা ও বাবা যদিও বলেছিলেন সুনীল শেঠজীর মুনশিকে চিনিয়ে দিয়েছিল,

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		কিন্তু মুনশিজী দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন সুনীলের মা-বাবার এই দাবি 'বিলকুল ঝুট'। তথ্য ঠিক নয়।
১০. একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল।	১. সুনীলের মা ২. শকুন্তলাদেবী ৩. পাঠকজী ৪. গোপাল বৈদ্যজী (শেঠজীর পারিবারিক চিকিৎসক)	ঘোড়া থেকে কোনওদিনই পড়ে যাননি। পা'ও মচকায়নি। একবার এক দুর্ঘটনায় পা ভাঙে। তবে তা ঘোড়া থেকে পড়ে নয়। তথ্য ভুল।
১১. শেঠজীর বোন, বোনের জামাই সুন্দরলাল ও বোনের মেয়ে আনন্দীকে চিনতে পেরেছিল।	১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. রামপ্রকাশ ৪. শকুন্তলাদেবী ৫. পাঠকজী	সুনীলের মা-বাবার সাক্ষ্যকে সমর্থন করেননি কেউই। বাকি তিনজন জানিয়ে-ছিলেন, তাঁদের সামনে এই ঘটনা ঘটেনি। পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ কারও সামনে সুনীল এঁদের চিহ্নিত করেছিল, এমন ঘটনাও ওঁরা শোনেননি।
১২. শেঠজীর প্রাসাদে তিনজনের একসঙ্গে তোলা একটা ছবি দেখে বলে দিয়েছিল, একজন—নিজে, বাকি দু'জন—স্ত্রী ও পুত্র।	১. শকুন্তলাদেবী ২. শ্যামপ্রকাশ	সুনীল শেঠজীকে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু বাকি দু'জনকেই চিনতে ভুল করে ছিলেন। ঘরে শেঠজীর এতই ছবি ছিল, যে সে'সব দেখে শেঠজীকে যে কোনও শিশুর পক্ষেই চিনে ফেলা সহজ।
১৩. গোপাল বৈদ্যজীকে চিনতে পেরেছিল।	১. সুনীলের বাবা ২. গোপাল বৈদ্যজী	গোপাল বৈদ্যজী'র কথামত তিনি যখন রোগী দেখছিলেন, সেই সময়

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		সুনীলরা এসেছিল। বৈদ্যজী প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি আমাকে চিনতে পারছ? উত্তরে সুনীল বলেছিল—হ্যাঁ, আপনি রোগীদের ওষুধ দেন। সুনীলের এই উত্তর থেকে কখনই স্পষ্টতর হয়নি সুনীল গোপালজীকে গোপালজী হিসেবে চিনতে পেরেছিল।
১৪. শেঠজীর বন্ধু রামগোপাল ব্যাস'কে চিনতে পেরেছিল। আরও জানিয়েছিল---শেঠজীর আর এক বন্ধু শিবনারায়ণ দাসের গয়নার দোকান ছিল।	১. রামগোপাল ব্যাস ২. শিবনারায়ণ দাস	রামগোপাল ব্যাস ছিলেন শেঠজীর বন্ধু। সুনীল রামগোপালকে চিনতে পেরেছিল। রামগোপালকে শুধু সুনীলই নয়, সুনীলের মা-বাবাও চিনতেন। রামগোপাল সুনীলদের বাড়ি যেতেন, কারণ, সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল রামগোপালের কোল্ড স্টোরেজেই কাজ করতেন। শুধু রামগোপালই শেঠজী ও সুনীলদের পরিবারের। চাদাম্মিলাল আরও জানিয়েছিলেন, তিনি শেঠজী বা শেঠজীর কলেজের নামও সুনীলের কাছ থেকে শোনার আগে কখনও শোনেননি। এই প্যারাসাই-

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		কোলজিস্টদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অথবা অন্য কোনও প্রভাবশালী মহলের দ্বারা চালিত হয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো এ'ভাবে শোরগোল তুলেছিল যে, স্থানীয় জনগণ সুনীলকে বাস্তবিকই শেঠজী বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি, তা এ'বার আপনাদের সামনে হাজির করছি। সঙ্গে পরিচিত একমাত্র ব্যক্তি নন। স্বল্প আয়াসেই আর কয়েকজনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি যাঁরা একই সঙ্গে দুটি পরিবারকেই জানতেন। দু'নম্বর ব্যক্তির নাম সেবতি প্রসাদ। সেবতি সম্পর্কে সুনীলের বাবার কাকা। বুধায়ুনের বাসিন্দা সেবতি মাঝে-মাঝেই আসতেন সুনীলদের বাড়ি। সেবতি প্রসাদের কথা—শেঠ শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালমতই চিনতাম। তিন : সুনীলের এক কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনা সেই সময় ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব বা

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		Personal Assistant। বুদ্ধিমান, রাজনীতিবিদ, বৈষয়িক জয়নারায়ণ শেঠ শ্রীকৃষ্ণের পরিচিত ছিলেন। চার : শেঠ শিবনারায়ণ দাস। শিবনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বুধায়ুনে শিবনারায়ণের একটি অলঙ্কারের দোকান আছে। আওনলায় শিবনারায়ণ রামগোপাল ব্যাসের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসা হিসেবে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবসা করতেন। সুনীলের বাবা ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ওখানে কাজ করতেন এবং শিবনারায়ণের পরিচিত ছিলেন। সুতরাং শিবনারায়ণের বুধায়ুনে অলঙ্কারের দোকানের খবর সুনীলের জানতে পারার মধ্যে অবাক হবার মত কিছুই দেখতে পাই না। মাত্র এইটুকু তথ্য পাওয়ার পরই আমরা বলতে পারি, যে সব প্যারাসাইকোলজিস্টরা জানিয়েছিলেন— "আমি নিশ্চিত, দুটি পরিবার এই ঘটনার আগে উভয়ের বিষয়ে কিছুই জানত না"—তাঁরা নিশ্চিতভাবেই ভুল করেছিলেন। অবশ্য

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		এই ভুল ইচ্ছাকৃত, কি অনিচ্ছাকৃত সে আর এক গবেষণার বিষয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতেই পারি এ'ক্ষেত্রে সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে দু'টির যে কোনও একটি কারণ ক্রিয়াশীল। এক : সুনীল উভয় পরিবারের পরিচিত কারও কাছ থেকে শেঠজীর বিষয়ে কিছু কিছু কথা শুনেছিল শেঠজীর বিচিত্র জীবন সুনীলের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সুনীল গভীরভাবে শেঠজীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের মধ্যে অন্যের সত্তাকে খুঁজে পেতে থাকে। অর্থাৎ নিজেকে শেঠজী বলে ভাবতে শুরু করে। এটা সুনীলের মস্তিস্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা থেকে সৃষ্ট অবস্থা। দুই : শেঠজীর বিশাল সম্পত্তির ভাগ বসাবার লোভেই সুনীলকে পূর্বজন্মের শেঠজী বলে হাজির করা হয়েছিল। শেঠজী সম্পর্কে সংগৃহীত

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		তথ্য সুনীলের মাথায় ঢোকানো হয়েছিল। সুনীল বাস্তবিকই জাতিস্মর হলে ওর দেওয়া তথ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকত না। ওর প্রচুর ভুলই প্রমাণ করে ও জাতিস্মর নয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে অন্যান্য প্যারাসাইকোলজিস্টরা সুনীলের তথ্যে প্রচুর মিল খুঁজে পেলেন কী করে? উদাহরণ হিসেবে সবচেয়ে নামী-দামী প্যারাসাই-কোলজিস্ট আয়েন স্টিভেনসনের লেখা থেকে অংশ তুলে দিচ্ছি। এ থেকেই আসল রহস্যের হদিস আপনারা পেয়ে যাবেন : আমি বুধায়ুনে থাকতাম। আমার বাবা ছিল। আমার মা ছিল। আমার বউ ছিল। আমার সন্তান ছিল। আমার ফ্যান ছিল। আমার চাকর ছিল। আমার জামাকাপড় ছিল। আমি বউয়ের জন্য গয়না কিনেছিলাম। আমার বাড়ি ছিল—ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর সব কথা-বার্তা। এইসব তথ্য মেলাতে জাতিস্মর হতে হয় না। একটি সাধারণ মানুষছানা হলেই চলে।

সুনীলের দাবি	যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি	আমার মন্তব্য
		কিন্তু এমন ধরনের গোটা চল্লিশের মিলের পর (যে সব মিলের মধ্যে ধরে নিতেই পারেন রয়েছে, চুল কাটাতাম নাপিতের কাছে, মন্দিরে যেতাম, বাড়িতে পুজো করতাম, দুধ ভালবাসতাম, প্যাঁড়া ভালবাসতাম, লাড্ডু ভালবাসতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি) গোটা দশ-পনের অমিল পাত্তাই পায় না প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে, তা সে'সব অমিল যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন! সাংবাদিকদের মাইনে দেয় 'সাংবাদিকতা' নয়, 'সংবাদপত্র'। সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করতে হলে সংবাদপত্রের পলিসির সঙ্গে মানিয়েই কলম চালাতে হবে। নইলে 'আউট'। তাই একজন সাংবাদিক ব্যক্তিগত-ভাবে চান বা না চান পত্রিকা চাইলে তাঁকে দিনকে রাত করতে হয়, রাতকে দিন করতে হয়। তাই তো পত্রিকার লাগাতার প্রচারে 'জোনাকি' 'নক্ষত্র' হয়, আর সত্যের সূর্যকে ঢাকতে নেমে আসে 'ব্ল্যাক আউট'-এর কালোমেঘ বা 'ইয়েলো জার্নালিজম্'-এর নোংরা ধোঁয়া।

জাতিস্মর তদন্ত ৪ : যমজ জাতিস্মর রামু ও রাজু

উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট গ্রাম শ্যামনগর হঠাৎই পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে উঠল। পৃথিবীর তাবড় প্যারাসাইকোলজিস্টরা উড়ে আসতে লাগলেন কানপুর। তারপর সেখান থেকে ফারাক্কাবাদ জেলার অনামী স্টেশন যশোদা'তে। যশোদায় নেমে দু'কিলোমিটার উত্তরে গেলেই শ্যামনগর। শ্যামনগরের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা কবিরাজমশাই পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্মার যমজ পুত্র রামু ও রাজু সত্তরের দশকের শুরুতে বিশাল হইচই ফেলে দিয়েছিল তামাম দুনিয়ায়। ওরা গত জন্মেও ছিল যমজ ভাই ভীমসেন ও ভীষ্ম ত্রিপাঠী।

ওরা গতজন্মে যে বাস্তবিকই ভীমসেন ও ভীষ্মই ছিল, তার স্বপক্ষে এত সব জোরালো যুক্তি, কাঁপন ধরাবার মত সব তথ্য প্যারাসাইকোলজিস্টরা হাজির করেছিলেন যে প্রচারমাধ্যমগুলোর নাড়া না খেয়ে উপায় ছিল না।

কে এই রামু ও রাজু

রামু ও রাজুর জন্ম ১৯৬৪-এর আগস্টে। জন্মতারিখ ঠিক মত বলতে পারেননি ওদের বাবা পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্মা ও মা কাপুরীদেবী। অতটা স্মরণে না রাখার কারণ সম্ভবত ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তান হিসেবে ওদের আগমন। ছা'পোষা পরিবারে এত সন্তান—কিছুটা অবহেলা, কিছুটা বিতৃষ্ণা হয় তো বা মনের কোণে জমে উঠেছিল। অবশ্য এর পরও একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন কাপুরীদেবী।

কাপুরীদেবী নাকি রামু ও রাজুর জন্মের আগে স্বপ্ন দেখেছিলেন। অদ্ভুত স্বপ্ন। দুটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তাঁর গর্ভ থেকে। স্বপ্ন সত্য হওয়ায় কাপুরীদেবী বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে উল্লেখ করার মত আর কিছু স্বপ্নে দেখেননি।

গাঁয়ের আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সন্তানের মতই মাঠে-ময়দানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সময় কাটছিল রামু-রাজুর। পড়াশুনোর চেয়ে মাঠ-ময়দানই ওদের মন টানত বেশি করে। রামুর একটা ভালনাম হয়েছে—রামনারায়ণ; রাজুর—শেষনারায়ণ। সম্ভবত নারায়ণরূপী সন্তানদের আগমন ঠেকাতেই এমন বিচিত্র নামকরণ। এক সময় এদেশের অনেকেই ভাবতেন এই ধরনের বিচিত্র নামকরণ করে পরবর্তী সন্তানদের জন্ম ঠেকানো যাবে! জৈবিক কারণে যে জন্ম, তাকে 'ক্ষমা', 'রেহাই', 'মরণ' ইত্যাদি জাতীয় হেলাফেলার নাম রেখে নাকি ঠেকানো যাবে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের সন্তান লেখা-পড়া শিখবে না, এমনটি কি হয়। আর সব ভাই-বোনদের সঙ্গে দু'বছর পার না হতেই স্লেট-পেন্সিল নিয়ে বসতে হত রামু ও রাজুকে। পড়াতেন পাশের গাঁয়ের পণ্ডিত মান্নালাল।

একদিনের ঘটনা, পণ্ডিত মান্নালালের বাড়ি যাচ্ছিলেন তাঁরই এক আত্মীয় চন্দ্রসেন ত্রিপাঠী। চন্দ্রসেন থাকেন উঁচা লারপুর'এ। উঁচা লারপুরও একটি গাঁ।

শ্যামনগর থেকে ১২-১৪ কিলোমিটারের পথ, মান্নালালের বাড়ি যেতে শ্যামনগর গাঁ পার হয়েই যেতে হয়। যাচ্ছিলেন, কিন্তু যাওয়া আর হল কই! তার আগেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

বছর তিন-চারেকের দুটি যমজ শিশু পথে খেলছিল। চন্দ্রসেনকে দেখে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে একেবারে প্রণাম। চন্দ্রসেন ভাবলেন, বাচ্চা তো, বুঝি বা অন্য কারও সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলেই এমন প্রণাম। তবু রহস্য করে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চেনো?

—কেন চিনব না, আপনি তো আমাদের দাদা।

—দাদা মানে? কেমন দাদা আমি তোমাদের?

—দাদা, আমরা হলাম ভীম ও ভীষ্ম।

—ভীম, ভীষ্ম মানে? তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল? চন্দ্রসেন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

—থাকতাম উঁচা লারপুরে। এখন আমরা এই গাঁয়ে জন্মেছি। আমাদের নাম রামু ও রাজু।

বিভ্রান্ত চন্দ্রসেন মান্নালালের বাড়ির পথ ধরে এগোন। কিন্তু বাস্তবিকই ব্যাপারটা কী ঘটল? সত্যিই কি ওরা গতজন্মের ভীম ও ভীষ্ম? নাকি গোটা ব্যাপারটাই নেহাতই নিষ্ঠুর রসিকতা? নেপথ্যে থেকে কোনও মানুষ ওদের দিয়ে এমন কিছু কথা বলিয়ে ওকে নিয়ে কি রসিকতা করল!

মান্নালালের বাড়িতে পৌঁছে চন্দ্রসেন নাকি এই ধরনের নানা অনুমানের কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

মান্নালালের কাছ থেকেই রামু ও রাজুর বাবা-মা পণ্ডিত রামস্বরূপ ও কাপুরীদেবী এই ঘটনার কথা নাকি জানতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এ'টুকুতেই থেমে থাকেনি রামু ও রাজু। একটু একটু করে আরও অনেক কথাই জানিয়েছে সবচেয়ে আপনজন জেঠামশাই গয়াপ্রসাদ শর্মা এবং বাবা-মা'কে। জানিয়েছে—রামুর নাম ছিল ভীম, রাজুর ভীষ্ম। প্রধান জীবিকা ছিল, ক্ষেতি-জমি। ষাট বিঘার মত জমি ছিল। মোটামুটি সাচ্ছল্যের অভাব ছিল না। ভীমের প্রথম বিয়ে হয়েছিল। পাত্রী আতরাউলি গ্রামের। তারপর ভীষ্মের বিয়ে হয়। পাত্রী ভাওয়ালপুরের। ভীমের একটিই সন্তান। পুত্র। নাম—দ্রোণ। ভীষ্মের তিন পুত্র। রামকিশোর, রাজকিশোর ও নেত্রকিশোর। দু'ভাইয়ের যেমন ছিল স্বাস্থ্য, তেমনই ছিল সাহস। হয় তো কিছুটা উগ্রও। অবশ্য উগ্রতা ও অঞ্চলের পরিবেশেই রয়েছে। ওখানে খুন-খারাবি, বদলা, রক্তের হোলিখেলা নতুন কিছু নয়। বাবা মারা গিয়েছিলেন। ক্ষেতি-জমির দেখভাল করতেন ভীম ও ভীষ্ম। সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব সামলাতেন বড় ভাই চন্দ্রসেন।

জমি নিয়েই শত্রুতার শুরু জগন্নাথের সঙ্গে। জগন্নাথ থাকতেন পাশের গাঁ

কুন্দরিপুরায়। বয়স ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। গাঁয়ের 'দাদা'। অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি। জমিতে দেওয়াল তুলেছিলেন জগন্নাথ। ভীম ও ভীষ্ম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন এ দেওয়াল বেআইনিভাবে ভীমদের জমিতে তোলা হয়েছে। জগন্নাথের দাদাগিরি টেকেনি ভীম ও ভীষ্মের দুই বন্দুকের নলের মুখে। জগন্নাথ দু'ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নেন। একদিন নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন দু'ভাইকে। খাটিয়ায় বসে লাড্ডু, প্যাঁড়া সহযোগে ঘটি ঘটি দুধ পান করতে করতে হঠাৎই দু'ভাই লক্ষ্য করেন তাঁদের ঘিরে ফেলেছে জগন্নাথের লোকজন। ওঠার চেষ্টা করতেই শুরু হল প্রহার। ততক্ষণে জগন্নাথের আহ্বানে একজন অ্যাসিড এনে ঢেলে দিয়েছে ভীমের চোখে। ভীমের বীভৎস চিৎকারের মাঝেই ভীষ্ম নিজেকে মুক্ত করে ছুটতে থাকে। তারপর এক সময় নিজেই ঘুরে দাঁড়ায়। আবার ফিরে যায় জগন্নাথের কুঠিতে। বদলার রক্ত তখন টগবগ্ করে ফুটছে। অত সশস্ত্র রক্তপিপাসু মানুষের সঙ্গে নিরস্ত্র ভীষ্ম পেরে ওঠেনি। ওর চোখে মুখেও ঢালা হয়েছে অ্যাসিড। তারপর দু'জনকে হত্যা করে বস্তায় পুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে কুয়োয়। মৃতদেহকে বস্তাবন্দি করার কথা এবং কুয়োতে ফেলে দেওয়ার কথাও রামু-রাজু বলেছে। রামু, রাজুর কথা থেকে আমরা বরং জানতে পারলাম, আত্মা চিন্তাই হোক, বা চিন্তার কারণ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষই হোক—আত্মার দেখার মত চোখ আছে। মানতে পারলাম কি না, সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আপাতত এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি, আমরা নতুন কিছু জানতে পারলাম।

ভীম ও ভীষ্ম নিখোঁজ হওয়ার চারদিন পর ওদের দু'ভাইয়ের পচা-গলা দেহ পুলিশ উদ্ধার করে কুয়ো থেকে। গ্রেপ্তার করা হয় জগন্নাথ ও তার কিছু সাথীকে।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা কী পেলেন

যমজ জাতিস্মরের ঘটনা নিয়ে বারবার করে অনুসন্ধানের (নাকি জাতিস্মর প্রমাণের) কাজে এই অঞ্চলে এসেছিলেন বিশ্বের তিন নামী-দামি প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ আরলেন্ডার হারাল্ডসন্ (Dr. Erlendur Haraldson), আয়েন স্টিভেনসন (Ian Stevenson) ও ডঃ মেহ্‌রোত্রা। এঁরা প্রত্যেকেই একাধিকবার এখানে এসে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। ওঁদের অনুসন্ধানের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনি সেই সময় এদেশের ও বিদেশের বহু ভাষাভাষি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস রামু-রাজুর অসাধারণ জাতিস্মর কাহিনি দু'মলাটে বন্দি করে বাজারে ছাড়েন। এবং দারুণ বাজারও পায়।

এঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানতে পারি, রামু ও রাজু শুধুমাত্র ভীম ও ভীষ্মের জীবনের নানা জানা ও অজানা কাহিনিই শোনায়নি, পূর্বজীবনের অনেককেই চিনিয়ে দিয়েছিল। রামু ও রাজুর কাহিনি দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে। রামু-রাজুকে দেখতে প্রতিদিন ছুটে আসছিল

প্রচুর মানুষ। ছুটে এসেছিলেন ভীম ও ভীষ্মের মা রামদেবী ত্রিপাঠী। সঙ্গে এনেছিলেন ভীম ও ভীষ্মের পুত্রদের ও বোনকে। রামু ও রাজু ওদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিল এবং প্রকাশ্যেই চিনিয়ে দিয়েছিল। প্রমাণ করেছিল, ওদের দাবির মধ্যে কোনও অসারতা ছিল না। এই ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে প্যারাসাইকোলজিস্টরা রামু ও রাজুর শিক্ষক পণ্ডিত মান্নালাল, মা কাপুরীদেবী, বাবা রামস্বরূপ শর্মা ও জেঠা গয়াপ্রসাদ শর্মার কথা উল্লেখ করেছেন। রিপোর্টগুলো থেকে আরও জানতে পারি, উঁচা লারপুরের অনেককেই ওরা দু'ভাই চিনতে পেরেছিল। ভীম ও ভীষ্ম খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ন'জনের মধ্যে যারা জামিন পেয়েছিল, তারাও ছুটে এসেছিল রামু ও রাজুকে দেখার চুম্বকীয় আকর্ষণে। রামু ও রাজু তাদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিল। যমজ জাতিস্মর এও জানিয়েছিল, তাদের খুন করার ব্যাপারে জগন্নাথের প্রধান সঙ্গী ছিল রাজারাম, বংশীগোপাল ও হরি। পুলিশের রেকর্ড ওদের এই বক্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে এই বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে—রামু-রাজুদের পরিবার ও ভীম-ভীষ্মদের পরিবার প্রথম উভয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় রামু-রাজু জাতিস্মর হয়ে ওঠার পর। রামু ও রাজুর বাবা ও জেঠা এই ঘটনার আগে ভীম-ভীষ্মের ঘটনা জানতেন না। এমত অবস্থায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, রামু ও রাজু বাস্তবিকই পৃথিবীর ইতিহাসে জাতিস্মরের এক অনন্য উদাহরণ। যমজ ভাই মৃত্যুর পরও যমজ ভাই হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন—এ'এক অনন্য নজির।

পত্র-পত্রিকায় এইসব প্যারাসাইকোলজিস্টদের অনুসন্ধান পর্বের কথা ও তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা প্রচারিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ সন্ধান পেয়েছেন অসাধারণ যমজ জাতিস্মরের।

অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি

১৯৭৩'এর মার্চে আমি যখন রামু ও রাজুর রহস্য নিয়ে সত্যানুসন্ধানে নামি, তখন ওরা দু'জনেই ক্লাস থ্রি'তে পড়ে। বয়স দশ ছুঁই ছুঁই।

জাতিস্মর রহস্যের জট ছাড়াবার আগে আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১. শ্যামনগর ও উঁচা লারপুর গ্রাম দুটি একই পুলিশ স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ স্টেশনের নাম—গুরসাহিগঞ্জ।

২. দুই গ্রামের বাজার বলতে গুরসাহিগঞ্জ।

৩. দুই গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন যশোদা।

৪. ভীম ও ভীষ্মের হত্যা এতই ভয়ংকর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল যে এই হত্যা কাহিনি শুধুমাত্র গুরসাহিগঞ্জ থানা এলাকার চৌহদ্দিতে আলোড়ন তুলে থেমে থাকেনি; ফারাক্কাবাদ জেলা, তথা উত্তরপ্রদেশ জুড়েই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

১৯৬৪ সালের ৫ মে, স্থানীয় পত্রিকাগুলোয় গুরুত্বের সঙ্গেই খবরটি পরিবেশিত হয়।

৫. শ্যামনগর গ্রামের বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই রামু-রাজুর জাতিস্মর হয়ে ওঠার কাহিনি শোনার আগেই ভীম-ভীষ্মের হত্যা কাহিনি শুনেছিলেন।

৬. রামু ও রাজুর জেঠামশায় গয়াপ্রসাদ শর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন—রামু-রাজুর মুখ থেকে শোনার আগে তিনি ভীম-ভীষ্মের কথা জানতেন না।

গয়াপ্রসাদের এই ধরনের বক্তব্য মেনে নেওয়া একান্তই কঠিন। গাঁ-গঞ্জে যাঁরা থাকেন, তাঁরা জানেন, আশে-পাশের কোনও গাঁয়ে এমন এক ধনী পরিবারের ডাকাবুকো, টগ্‌বগে দুটি মানুষকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা। লাশ পাচারের চেষ্টা। লাশ আবিষ্কার। পাশের পাড়ার আর এক জবরদস্ত শক্তিমান মানুষের সদলে পুলিশের হাতে ধরা পড়া। এমন রোমাঞ্চকাহিনি একইভাবে আশে-পাশের গাঁয়ের মানুষদের নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু একজন সুস্থ-সবল, সামাজিক মানুষ গয়াপ্রসাদ ওই ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ কিচ্ছু জানতে পারলেন না—বিশ্বাস করা খুবই কষ্টসাধ্য।

৭. রাজু ও রামুর মা তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এই যমজ সন্তান জন্মাবার আগেই তিনি ভীম-ভীষ্মের হত্যা ও সেই সূত্রে ভীমদের ও তাদের পরিবারের বিষয়ে অনেক কথাই শুনেছিলেন।

৮. ভীম ও ভীষ্মের মা রামদেবী তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি রামু ও রাজুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কি তোমাদের মা?" ওরা উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"। রামদেবী ভীম ও ভীষ্মের ছেলেদের হাজির করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওরা কি তোমাদের ছেলে?" রামু রাজু উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"। ভীমের বোনকে দেখিয়ে রামদেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ কি তোমাদের বোন?" ওরা উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"।

এগুলো কোনওভাবেই রাজু ও রামুর আগের জন্মের মা, সন্তান ও বোনকে চিহ্নিত করার সঠিক পদ্ধতি নয়। একই বয়সের একাধিকের সঙ্গে মিশিয়ে হাজির করার পর ওরা যদি আগের জন্মের ওইসব আপনজনদের চিহ্নিত করত, সেইক্ষেত্রে 'সঠিক চিহ্নিতকরণ' বলে মেনে নেওয়াটা হতো যুক্তিসঙ্গত।

যে-ভাবে রামদেবী প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে উত্তর "হ্যাঁ" হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

৯. চন্দ্রসেন তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, "আমরা যে রামু ও রাজুকে দেখতে হাজির হয়েছি, তা রামু-রাজুর অজানা ছিল না। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসা কথা শুনতে পাচ্ছিলাম—ভীম-ভীষ্মের মা, বোন, ছেলেরা ও দাদা এসেছেন। তারপর যে ভাবে মা ওদের দু'জনকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে ওরা 'হ্যাঁ' বলবে এটাই স্বাভাবিক। এটা কোনওভাবেই সঠিক পরীক্ষা ছিল বলে মনে করি না।"

১০. রামুর সাক্ষাৎকার নেবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার সম্পর্কে

এক ভাই রামকিশোর উঁচা লারপুরেই থাকে। তাকে তোমার মনে আছে?” জবাবে রামু বলেছিল, “হ্যাঁ”।

—“রামকিশোর তোমার খুড়তুতো ভাই, তাই না?”

এবারও রামু জবাব দিয়েছিল, “হ্যাঁ”।

আমি ভীমদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ‘রামকিশোর’ নামে কোনও তুতো ভাইই ভীমদের ছিল না। ভীমদের পরিবারে এক এবং অদ্বিতীয় ‘রামকিশোর’ হল ভীমেরই পুত্র।

১১. পুলিশ রেকর্ড থেকে জানতে পারি, দু’ভাইয়ের লাশ বস্তাবন্দি অবস্থায় ছিল না। কুয়ো থেকে মৃতদেহ তুললে দেখা যায় ওদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল।

১২. এবার যে তথ্যটা পেশ করতে চলেছি, সেটাই রামু-রাজুর জাতিস্মর হয়ে ওঠার দাবিকে বাতিল করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো তথ্য।

পুলিশ রেকর্ড বলছে ভীম ও ভীষ্মকে সর্বশেষ দেখা যায় ২৮ এপ্রিল ১৯৬৪। মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় চারদিন পর। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লেখা হয় ৪মে ১৯৬৪।

অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কোর্ট রেকর্ড বলছে ২৮ এপ্রিল’ ৬৪ দু’ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল।

রামু ও রাজুর জন্ম আগস্ট ১৯৬৪। অর্থাৎ ভীম-ভীষ্মের মৃত্যুর সাড়ে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে রাজু-রামুর জন্ম। অথচ রাজু-রামুর বাবা ও মায়ের সাক্ষ্য অনুসারে কাপুরীদেবীর স্বাভাবিকভাবেই দশমাস গর্ভ ধারণের পরই যমজ সন্তানের জন্ম হয়েছিল।

রাজু ও রামুর যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল ভীম-ভীষ্মের মৃত্যুর প্রায় মাস ছয়েক আগে, সেখানে ভীম-ভীষ্মের আত্মার কাপুরীদেবীর গর্ভে আসার প্রসঙ্গ আসে কী করে?

জাতিস্মর তদন্ত ৫ : পুঁটি পাত্র

পুঁটি পাত্র ওরফে কাজল পাত্র’র জাতিস্মর হয়ে ওঠার খবরটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। দিনটা ৩১ মে। সালটা ১৯৬৮।

পুঁটি তখন সাড়ে তিন বছরের মেয়ে। নিবাস—মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শহর তমলুক’এর লাগোয়া গ্রাম কাপাশবেড়িয়া। কাপাশবেড়িয়া তমলুক থেকে পাঁচ কিলোমিটার পথ।

পুঁটি পাকা মেয়ের মত পটাপট বলে যেত অনেক কথাই। বিয়ে করেছিল ‘কচির’ বাবাকে। স্বামীর নাম কি মুখে আনতে পারে হিন্দু ঘরের কোনও সতী? পুঁটিও পারেনি। হোক না আগের জন্মের স্বামী। স্বামী তো! ‘পদবিটা অবশ্য বলেছিল—‘বেরা’।

আগের জন্মের সন্তানদের কথাও মনে পড়ে বইকি। এক মেয়ে আর এক

ছেলে ছিল। ছেলের নাম ছিল খোকা। আর সেই সুবাদে ছেলের বাবাকে খোকার বাবাও ডাকত পুঁটি। আর মেয়ের নাম কচি।

নিজের নাম? তাও মনে আছে বই কি? ললিতা। রাধার সখী। রাধা মানে—কৃষ্ণ-প্রিয়া।

নিজেদের বাড়ি ছিল কাঠের পুলের কাছে। অবস্থা ভাল ছিল না। বিয়ের পর সচ্ছলতার মুখ দেখেছিল। বাজারের সামনে বাড়ি। পুকুর ভরা মাছ, কলমি, হিঞ্চে, শুশনি শাকের দল। গোয়ালে গরু। জোয়ান স্বামী। কোলও ভরিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে এল মেয়েটা। তারপর খোকা।

না, না; খোকার বাবা খারাপ মানুষ ছিল না। মাঝে-মধ্যে আমাকে মারত, মদ খেত। পুরুষ মানুষ মদ খাবে, নিজের বউকে মারবে, এতে খারাপ কী আছে? কিন্তু শাশুড়িটা বড় ট্যাক্-ট্যাক্ করত আমার পিছনে।

আমিও মাথা গরম করতাম। ধাঁ করে আগুন জ্বলে যেত মাথায়। ওইটাই আমার দোষ ছিল। শ্বশুর-বাড়ি ছিলাম ভালই, খাওয়ার কষ্ট ছিল না, পরার কষ্ট ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাল থাকলাম কই! খোকার বাবাই আমাকে মেরে ফেলল। সেদিনকার সব কথা মনে পড়লে এখনও আমার সারা শরীরে আগুন ধরে যায়।

সারাটা দিন সংসারে গতর খাটিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছি। খোকার বাবা এল টলতে টলতে। দুপুরবেলাতেই অনেক মদ গিলেছে। আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল—খেতে দে।

দুপুরে ফিরে এসে ভাত খেতে চাইবে, জানতাম না। দুপুরে ফিরবে, তাই বলে যায়নি। ভেবেছিলাম রাতে ফিরবে। বললাম—মুড়ি দিই। খোকার বাবা বলল—ভাত খাব।

ভাত কোথায় যে দেব। দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খাবে বলে গিয়েছিলে? বাইরে মদ গিলতে পারলে, ভাত খেয়ে আসতে পারলে না?

দু'জনেই ঝগড়া করছিলাম। হঠাৎ খোকার বাবা গালে একটা বিশাল চড় মারল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। আমাকে নড়তে-চড়তে না দেখে খোকার বাবা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। ঘটি করে জল এনে চোখে-মুখে জল দিল। তাও জ্ঞান ফিরছে না দেখে ভাবল—আমাকে মেরেই ফেলেছে। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলো গোয়াল ঘরে। তারপর একটা গরু-বাঁধা-দড়ি আমার গলায় বেঁধে গোয়ালঘরে ঝুলিয়ে দিল।

এ'সব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছে পুঁটি, বলেছেন পুঁটির বাবা বলাই পাত্র, মা বীণাপাণি পাত্র ও পুঁটির দাদা লক্ষ্মীকান্ত।

এ'সব কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন ও লিখেছেন পুঁটির কাছে ছুটে আসা প্যারাসাইকোলজিস্টরা। এ'দের মধ্যে আছেন ডঃ যমুনাপ্রসাদ, ডঃ এল. পি. মেহরোত্রা, অধ্যাপক প্রণব পাল, আয়েন স্টিভেনসন।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা অনুসন্ধানে কী পেয়েছিলেন

১. পুঁটি বলেছিল ও ছিল বংশী বেরার স্ত্রী। প্রথমে স্বামীর নাম 'কচির বাবা' বা 'খোকার বাবা' বললেও পরে জানিয়েছিল বরের নাম ছিল বংশী।

শালগাছিয়া গাঁ পুঁটিদের গাঁ ঘেঁষেই। সেখানে অনেক বেরা পরিবারের বাস। তাদেরই একটি পরিবারে 'বংশী' নামের এক মাঝ-বয়সী পুরুষের হদিস মেলে, যার স্ত্রী মারা গেছেন।

২. পুঁটি বলেছিল ওর পূর্বজন্মের নাম ছিল ললিতা। বংশী বেরার মৃত বউটির নামও ছিল ললিতা।

৩. পুঁটিও কথা মত গতজন্মে ওকে গলায় ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছিল।

বংশীর কথা মত—ললিতা গলায় ফাঁসি দিয়েই মারা গিয়েছিল।

৪. ফাঁসি দিয়েছিল গরুর দড়ি দিয়ে। গামছা বা কাপড় দিয়ে নয়।

বংশী তাঁর সাক্ষ্যে জানিয়েছিলেন—পুঁটির কথাই ঠিক। ললিতা ফাঁসি দিতে গরুর দড়িই বেছে নিয়েছিল।

৫. পুঁটি জানিয়েছিল—বংশী ঘটনার দিন মদ খেয়ে বাড়ি এসেছিল এবং খাবার না পেয়ে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।

বংশী এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

৬. পুঁটির কথামত বংশীদের বাড়ি ছিল শালগাছিয়া বাজারের কাছে। বাস্তবেও তাই।

৭. পুঁটি জানিয়েছিল—বংশীদের পুকুর ছিল। সত্যিই ওদের পুকুর ছিল।

৮. পুঁটি বলেছিল—ওর শ্বশুরবাড়িতে গোয়াল ছিল। বাস্তবেও তাই ছিল।

৯. পুঁটির কথামত—ললিতার দুই সন্তান ছিল। এক মেয়ে, এক ছেলে। তাই ছিল। ললিতার মৃত্যুর সময় ছেলের বয়স ছিল এক বছর, মেয়ের বয়স তখন তিন বছর।

১০. ললিতার বাড়ি ছিল ওই গ্রামেরই প্রান্তে এক কাঠের পুলের কাছে। বাস্তবেও তাই ছিল। পুঁটির কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল।

১১. শ্বশুরবাড়ির কাছে ছিল নারকেল গাছ। এ'ক্ষেত্রেও পুঁটি ঠিকই বলেছিল। বংশী বেরার বাড়ির কাছেই ছিল নারকেল গাছ।

১২. বংশী বেরার বাড়ি পুঁটি চিনিয়ে দিয়েছিল।

সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্যারাসাইকোলজিস্টরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, ঘটনাটা সত্যি।

প্যারাসাইকোলজিস্টরা বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধানের কাজে এলেও তাঁরা পুঁটিকে নিয়ে শালগাছিয়ায় বংশীর বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন। পুঁটি বংশীর বাড়ি ঠিক-ঠিক

দেখিয়ে দিয়েছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল পুকুর, গোয়ালঘর।

এ'সব প্রমাণ হাতের কাছে পাওয়ার পর তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—পুঁটি বাস্তবিকই জাতিস্মর। এ'ছাড়া আর কী সিদ্ধান্তেই বা পৌঁছোতে পারতেন বলুন!!!

পুঁটি : কিছু তথ্য

পুঁটির জন্ম নভেম্বর ১৯৬৪। বাবা বলাই পাত্র বা মা বীণাপাণি পাত্র জন্ম তারিখ জানাতে পারেননি।

ললিতার মৃত্যু পুঁটির জন্মের ৮ বছর আগে, ১৯৫৬ সালে।

পুঁটির বাবা ছিলেন দিনমজুর। পুঁটির ঠাকুমা গঙ্গামণি আনাজপাতি নিয়ে বসতেন বাজারে।

পুঁটিদের বাড়ি যদিও কাপাশবেড়িয়ায়, তবু ঠাকমা আনাজ নিয়ে বসতেন শালগাছিয়ার বাজারেই। কারণ কাপাশবেড়িয়ার লোকদেরও দোকান-বাজার করতে আসতে হতো শালগাছিয়াতেই। দু'টি গাঁয়ের দূরত্ব বেশি হলে দু'কিলোমিটার।

পুঁটির মার কথামত পুঁটি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটু বেশি মেজাজি এবং একটু গিন্নি স্বভাবের।

পুঁটির ওপরে ছিল এক দাদা ও তিন দিদি, কিন্তু পুঁটি নাকি দিদিদের ওপরও 'দিদি-গিরি' করত।

দেড় বছর বয়স থেকেই পুঁটি নাকি ওর পূর্বজন্মের কথা বলতে শুরু করে।

পুঁটির জাতিস্মর হয়ে ওঠার ঘটনা খুব দ্রুতই জেনেছিল আশে-পাশের দশ-বিশটা গাঁ। তমলুক শহরেও লোকের মুখে নাকি ফিরত পুঁটির কাহিনি। মুখে-মুখে ফেরার আরও একটা কারণ সম্ভবত—বংশী বেরার বউয়ের মৃত্যুর পিছনে একটা রসালো কাহিনির সম্ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া। বংশীর বউ আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করেছে বংশী স্বয়ং। এমন একটা খবর সাধারণ মানুষ খাবে ভাল, এটাই স্বাভাবিক।

প্রশংসার খবর ছড়ায় গরুর গতিতে। নিন্দা ছড়ায় রকেট গতিতে, মহামারীর মত ব্যাপকতা নিয়ে।

তারপর পুঁটির খবর গ্রাম, জেলা, দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা পৃথিবীতেই প্রচারিত হয়েছে বিশ্বের নামী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্টদের কল্যাণে। পুঁটি আজও গ্রামের মানুষদের কাছে বিস্ময়।

অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি

১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম পুঁটির গাঁয়ে। মধ্যরাতে খড়্গপুরে পৌঁছে যখন বাসে উঠলাম, তখন গোটা বাসে আমার সহযাত্রী মাত্র দু'জন। যার একজন

কন্ডাকটর ও একজন পুলিশ। নকশাল আন্দোলন ডেবরা, গোপীবল্লবপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে যে মেদিনীপুর জেলার অনেকাংশতেই ছড়িয়ে পড়েছে, শ্বেত-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে পাল্টা লাল-সন্ত্রাস, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি রাতের বাসে এমন যাত্রীর আকাল দেখে।

মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুনো শীতের ভোরে পৌঁছেছিলাম পুঁটির বাড়ি। 'ভোর' বেছে নেবার কারণ—বলাইবাবুর জীবিকা।

অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য জানতে পেরেছি, তার থেকেই কিছু তথ্য এখানে আপনাদের জন্য হাজির করছি, যেগুলো 'পুঁটি-রহস্য' উন্মোচনে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

১. বলাই পাত্র তার পরিবার নিয়ে কাপাশবেড়িয়ায় আসার আগে থাকতেন শালগাছিয়ায়। এ'কথা জানিয়েছিলেন বলাইবাবু স্বয়ং ও তাঁর স্ত্রী বীণাপাণি।

২. শালগাছিয়ায় বংশী বেরার বাড়িতেই তাঁরা ভাড়াটে হিসেবে বাস করতেন। এ'কথাও জানিয়েছিলেন বলাইবাবু, বীণাপাণিদেবী, বংশী বেরা ও শালগাছিয়ার কিছু অধিবাসী।

৩. ললিতার গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুর খবর বলাইবাবুদের পরিবারের কারোরই অজানা ছিল না।

৪. গলায় যে গরুর দড়ি দেওয়া হয়েছিল, তাও বলাইবাবু, বীণাপাণিদেবীদের অজানা ছিল না।

৫. মৃত্যু যে গোয়ালঘরেই ঘটেছিল তাও পুঁটির মা-বাবা জানতেন। জানত পুঁটির ভাই-বোনেরা।

এই তথ্যগুলোর সাহায্য নিয়ে আমাদের পক্ষে এই সন্দেহ প্রকাশ করাটাই স্বাভাবিক—এই খুঁটি-নাটি তথ্য পুঁটিরও অজানা ছিল না।

অনুসন্ধানে আরও জেনেছিলাম :

৬. ললিতার বাড়ি যে কাঠ-পুলের কাছে তা পুঁটির বাবা-মা জানতেন।

৭. পুঁটির বাবা-মা জানতেন, ললিতার এক মেয়ে ও এক ছেলে।

৮. ওঁরা এও জানতেন ললিতা বংশী বেরাকে 'খোকার বাবা' বা 'কচির বাবা' বলে ডাকতেন।

৯. যে-হেতু বংশীদের বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন বলাইবাবুরা তাই জানতেন বংশীদের পুকুরের কথা, গোয়ালের কথা, নারকেলগাছের কথা।

১০. বংশীবাবুর বাড়ি বাজারের কাছে—এটা পুঁটিদের পরিবারের অজানা ছিল না।

১১. ললিতার মৃত্যুর দিন বংশী মদ খেয়ে এসেছিলেন, ভাত না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তার থেকে দু'জনে ঝগড়া এবং ললিতার আত্মহত্যা—এ'সব তথ্য বংশীবাবুই গাঁয়ের মানুষদের জানিয়েছিলেন।

বংশীবাবু তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, ললিতা গলায় দড়ি দিয়েছিল বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটে নাগাদ।

বংশীবাবুকে হত্যাকারী বলে গাঁয়ের কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তাই পুলিশকে খবর দিয়ে বংশীকে অস্বস্তিকর অবস্থায় সেদিন ফেলতে চাননি। কারণ তাঁরাও অনেকেই মনে করতেন—ললিতার একটু মাথায় গোলমাল ছিল। যখন তখন দুম্-দাম্ খেপে যেতেন। এমনই এক রাগের মুহূর্তে ললিতা গলায় দড়ি দিয়েছিলেন বলে পাড়া-পড়শিরা বিশ্বাস করেছিলেন।

১২. পুঁটির জাতিস্মর হয়ে ওঠার কথা গোটা তল্লাটে চাউর হওয়ায় অনেক গাঁ-গঞ্জের মানুষ ভিড় করে এলেও যাননি বংশীবাবু।

"কেন যাননি?" আমার কথা উত্তরে বংশীবাবু জানিয়েছিলেন, "ও ললিতা নয়। তাই ফালতু সময় নষ্ট করতে যাইনি।"

"কী করে নিশ্চিত হলেন ও ললিতা নয়?"

"পুঁটি যদি সত্যিই ললিতা হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বলত ললিতা আত্মহত্যা করেছিল।"

১৩. বংশী তাঁর বউ ললিতাকে যে ভাবে হত্যা করেছিলেন বলে পুঁটি বর্ণনা করেছিল, সেই বর্ণনার দিকে পাঠক-পাঠিকাদের মনোযোগ আর একটি বারের জন্য ফেরাতে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখছি—ললিতার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তগুলোর এই বর্ণনাই অন্যান্য প্যারাসাইকোলজিস্টদের লেখাতেও পাবেন।

পুঁটির কথামত ললিতা বংশীর চড় খেয়ে মারা যাননি, জ্ঞান হারিয়েছিলেন মাত্র। যদিও জ্ঞান হারিয়েছিলেন, তবুও বুঝতে পারছিলেন ওঁর চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন বংশী। জলের ঝাপটায় কাজ হয়নি। জ্ঞান ফেরেনি। এত চেষ্টাতেও ললিতার জ্ঞান না ফেরায় ও মারা গেছে মনে করে ভীত বংশী ওকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে গেছেন গোয়ালঘরে। ঘর থেকে গোয়ালঘরের দূরত্ব আনুমানিক ১২৫ ফুট। এতটা পথ দোল খেতে খেতে যেতে যেতেও ললিতার জ্ঞান ফেরেনি। অজ্ঞান হলেও ললিতা জ্ঞান হারাননি (একেই বলে সোনার পাথরবাটি)। বুঝতে পারছিলেন ওঁকে বংশী গোয়ালঘরে নিয়ে চলেছেন। ললিতাকে গোয়ালঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখেছেন বংশী। ললিতা বুঝতে পেরেছেন। ললিতার গলায় গরুর দড়ির ফাঁস পরিয়েছেন বংশী। ললিতা তাও বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ বোঝার মত টনটনে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানতার জন্য টুঁ শব্দটি করতে পারেননি। তারপর ললিতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সব বুঝে-সমঝেও ললিতা ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছেন। রা'টি কাটেননি কোনও অভিমান থেকে নয়, অজ্ঞান থাকার জন্য। ললিতা এত কিছু বুঝলেও, কিচ্ছুটি বুঝতে পারেননি বংশী। বুঝতে পারেননি, চড় খাওয়ার পর ললিতার মৃত্যু হওয়া তো দূরের কথা, জ্ঞানটি পর্যন্ত টনটনে রয়েছে। আহাম্মক আর কাকে বলে! বোধহয় এরপরও যাঁরা অজ্ঞান ললিতার স্বজ্ঞানে ফাঁসিতে চড়ার গল্প সরল বিশ্বাসে মেনে নেন, তাঁদেরই বলে।

জাতিস্মর তদন্ত ৬ : গুজরাটের রাজুল

যেখানে জাতিস্মর, সেখানেই দৌড়োও। 'চরৈবতি'র সেই কথাগুলো আমাকে সেই থেকে আজও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—চলাটাই হল অমৃতলাভ। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। এমনি চলতে চলতে, জাতিস্মর তদন্তের পুঁটলি আজ দস্তুর মতো এক ভারী বোঝা। সেই বোঝা ঘেঁটে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাপ-জোক করে, ঝাড়াই-বাছাই করে সেইসব জাতিস্মর রহস্যকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইছি যেগুলো বিস্ফোরক। যেগুলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতির বা কুখ্যাতির অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা 'উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এইসব 'উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি' নিয়ে বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে দারুণ দামের গাবদা-মোটা ঝাঁ-চক্চকে বই। ভারত থেকে 'জন্মান্তরবাদ' নিয়ে যে'সব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতেও এইসব 'কেসহিস্ট্রি' জায়গা করে নিয়েছে। এ'বার যে ঘটনা নিয়ে আলোচনায় যাব, সেটাও বিশ্ব-বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর কেসহিস্ট্রির অন্যতম।

"এই ঘটনার মুখ্য চরিত্রদের আমি ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে গীতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার বিদেহী আত্মা অন্য এক মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের প্রাণ সঞ্চার করে—ন'মাস পরে যে শিশুটি রাজুল নামে জন্মগ্রহণ করেছিল।"

কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন? কে স্থির ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন— রাজুল পূর্বজন্মে ছিল গীতা? ভারতের সবচেয়ে নামী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন্মান্তর ঃ রহস্য ও রোমাঞ্চ' গ্রন্থে ('রহস্য ও রোমাঞ্চ' সিরিজের জন্মান্তর নিয়ে গল্প-কাহিনি বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না) এই রাজুল কাহিনি স্থান পেয়েছে। স্থান দিয়েছেন কতটা গুরুত্বের সঙ্গে? ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "রাজুল শাহ-র পুনর্জন্মের ঘটনাটিকে আমি আমার দশটি উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করি।"

এ'পর্যন্ত নানা ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর-কাহিনি আপনাদের সামনে হাজির করেছি। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে ছিল সত্য-গোপন, তথ্যের বিকৃতি ঘটানো, সত্যানুসন্ধানে আন্তরিকতার অভাব— ইত্যাদি জাতীয় বেশ কিছু ফাঁক-ফোকর। এ'বার আমরা দৃষ্টিকোণ পাল্টাব। এই রাজুল-কাহিনির সূত্র ধরে আমরা একটু একটু করে বে-আব্রু করব 'প্যারাসাইকোলজিস্ট' নামধারীদের গবেষণার নামে প্রতারণার বীভৎস দগ্‌দগে রূপের একটি নমুনা।

...

স্রষ্টা সৃষ্টির চেয়ে মহান। জাতিস্মর-স্রষ্টা প্যারাসাইকোলজিস্টরাও তাঁদের সৃষ্টির চেয়ে মহান। এই মহান মানুষদের মুখোশহীন করা একান্তই জরুরি, সাংস্কৃতিক-দূষণ রোধের জন্যই জরুরি। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আসুন, এই জরুরি কাজের জন্য আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ পাল্টাই।

রাজুল

গুজরাটের রাজকোট জেলা হঠাৎই গোটা ভারতের পত্র-পত্রিকায় অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল ১৯৬৫-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে। রাজকোটের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে রাজুল শাহ জাতিস্মর।

রাজুলের জন্ম ১৯৬০ সালের ১৪ আগস্ট। বাবা প্রবীনচন্দ্র শাহ। মা প্রভাবেন।. রাজুল প্রবীন-প্রভাবেন-এর পঞ্চম সন্তান। মেয়ে। রাজুল জন্মেছিল ছোট্ট শহরে ভিনচিয়াতে। প্রবীন ব্যাঙ্কে কাজ করেন। বদলির চাকরি। রাজুলের জন্মের পর প্রবীন বদলি হলেন রাজকোট থেকে কেশর শহরে। রাজকোট গুজরাটের জেলা শহর। কেশর ওই জেলারই ছোট্ট একটি শহর।

রাজুলের ঠাকুরদা ভি. জে. শাহ (ডাক নাম ভজু) পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কাজ থেকে অবসর নেবার পর ১৯৬০ সাল থেকে সস্ত্রীক থাকতে শুরু করেন ওয়াঙ্কানের-এর গ্রামের বাড়িতে। এ'বাড়িতে থাকতেন ভজু শাহ'র আর এক ভাই হিম্মৎলাল ও হিম্মৎলালের স্ত্রী সুশীলবেন।

বুড়ো-বুড়িদের সংসার। কিছুটা নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ভজু শাহ তাঁর নাতনি রাজুলকে মাঝে-মধ্যে নিজের কাছে এনে রাখতেন। শিশুবয়সের একটা দীর্ঘ সময় রাজুলের কেটেছে দুই ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার সঙ্গে।

১৯৬৩ সালে রাজুল প্রথম এমন কিছু কথা বলল, যার মধ্যে লুকোন ছিল ওর পূর্বজন্মের স্মৃতিমন্থন ক্ষমতার পূর্বাভাস। রাজুল এই সময় জানিয়েছিল, ও থাকত জুনাগড়-এ। জুনাগড়? এমন শহরের নাম তো তিন বছরের ছোট্ট রাজুলের জানার কথা নয়। বিস্ময় আকাশ ছুঁয়েছিল যখন রাজুল জানাল, ওর নাম ছিল গীতা। গীতা? এমন নামে তো ভুলেও কেউ কোনও দিন ডাকেনি রাজুলকে? আর তা ছাড়া এমন হিন্দু নাম তো এই জৈন পরিবারের নিকট কী দূর, কোনও আত্মীয়েরই নেই! গীতার প্রিয় বান্ধবীটির নাম জ্যোৎস্না। এতদিন রাজুলের সব বন্ধু আর বান্ধবীদের নামই মা-বাবার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু, জ্যোৎস্না নাম তো

এই প্রথম শোনা গেল রাজুলের মুখে। প্রথম শুনলে কি হবে, জ্যোৎস্নাই নাকি সেরা বন্ধু! গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময়! কিন্তু কৌতূহলী ও কিছুটা বিস্মিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমা রাজুলকে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি। কারণ পরদিনই রাজুল্লকে বাবা প্রভীন নিজের বাসা-বাড়ি কেশর-এ নিয়ে যান। প্রভীনকে অবশ্য তাঁর বাবা রাজুলের এইসব অদ্ভুত কথাবার্তার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভীন সে'সব কথায় বিশেষ কান দেননি। এইটুকু বাচ্চা মেয়ের ও'সব আজগুবি কথায় গুরুত্ব দেওয়া নেহাতই পাগলামি।

কেটে গেছে আরও দুটি বছর। '৬৫-র মে'তে রাজুল এলো ঠাকুরদাদের বাড়িতে। রাজুলের বয়স এখন পাঁচ। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে রাজুল এ'বার এসেই শুরু করল, ও যখন গীতা ছিল তখনকার নানা কথা। এ'বার আর বুঝতে অসুবিধা হল না রাজুল ওর গতজন্মের কথা বলছে। এতদিন যে সব কথা বাবা-মা ও ভাই-বোনদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি ওদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার প্রবণতায়। সে-সব না বলা কথাই বেরিয়ে আসতে লাগল এ'বাড়িতে উৎসাহী শ্রোতাদের পেয়ে।

একদিনের ঘটনা। রাজুল আপন মনে গোল হয়ে ঘুরছিল, আর মুখে কি যেন বলছিল। ঠাকুরদা ভজু শাহ রাজুলের কাছে জানতে চাইলেন, এটা কি খেলা? রাজুল জানাল, "আমি 'জুনাগড় গিরভি' খেলছি। আগের জন্মে যখন গীতা ছিলাম, তখন তো জুনাগড়ে থাকতাম, তখন এই খেলা খেলতাম।"

তারপর একটু একটু করে গীতার জীবনের অনেক কথাই বলেছে। কী কী বলছে, তা ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি থেকেই তুলে দিচ্ছি :

এক : "আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে 'বেবী' বলে ডাকত। তারপরে যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই 'গীতা' নামে ডাকত।"

দুই : "খুব ছোট বেলাতেই আমার একবার ভীষণ বেশি জ্বর হয় আর তাতেই আমি মারা যাই।"

তিন : "আমার আগের বাবার লোহালক্কড়ের দোকান ছিল।"

চার : "আমার এখনকার বাবা তো ফুলপ্যান্ট পরে, কিন্তু আগের বাবা বেশির ভাগ সময়েই ধুতি পরত।"

পাঁচ : "আমরা সবাই পিতলের বাসনে খেতাম। কেবল বাবা স্টিলের থালা ছাড়া খেত না।"

ছয় : "তখন আমরা বেশ রাত্রি হলে খাবার খেতাম ঘুমোতে যাবার আগে। এখন তো সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিতে হয়।" (জৈনরা সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খান।)

সাত : "আমাদের পুরনো বাড়ির ঠাকুরেরা সব জামা কাপড় পরা চেহারার

কিন্তু এখনকার ঠাকুরের গায়ে কোন কাপড় নেই।" (রাজুলরা ছিল জৈন ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায়ের। দিগম্বর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা নগ্ন।)

আট : "আগের মা খুব লম্বা ও রোগা দেখতে ছিল।"

নয় : "যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।"

দশ : "সে বাড়িতে বারান্দা ছিল।"

এগারো : "দীপাবলীর সময়ে তার আগের জন্মের বাবা বাড়িটাতে লাল রঙে চুনকাম করেছিল।"

বারো : "থ্যাকাররা প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।"

রাজুলের ঠাকুরদা ভজু শাহ এ'সব দেখে-শুনে সত্য জানতে দারুণ-রকম উৎসাহী হয়ে পড়েন—সত্যিই কি রাজুল জাতিস্মর? নাকি, গোটাই ওর কল্পনা-বিলাস? ভজু শহর এক জামাতা থাকেন সুরেন্দ্রনগর। নাম—প্রেমচাঁদ শাহ। প্রেমচাঁদের ব্যবসা আছে। ব্যবসার কাজে মাঝে-মধ্যে জুনাগড় যেতে হয় তাঁকে। শ্বশুর ভজু জামাই প্রেমকে অনুরোধ করলেন এ'বার জুনাগড়ে গেলে ও যেন গীতাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।

১৯৬৫-র জুনেই কাজে জুনাগড়ে এলেন প্রেমচাঁদ। কাজের ফাঁকে এক সময় গেলেন মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার'স অফিসে। রাজুলের জন্মের বছরখানেকের মধ্যে 'গীতা' নামের কেউ মারা গিয়েছিল কি না, এটা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। একজন ক্লার্ক বাবুলাল এ'বিষয়ে প্রেমচাঁদকে সাহায্য করেন। (১৯৬৯-এ আমি যখন জুনাগড় মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার'স অফিসে গিয়েছিলাম, তখন এই বাবুলালই মৃত্যু নথিভুক্তির রেজিস্টার খুলে আমাকে দেখিয়েছিলেন গীতার নাম, গীতা থ্যাকার। মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৯৫৯। বাবার নাম গোকুলদাস থ্যাকার।)

রাজুলের কথা এ'ভাবে সত্যি হয়ে ওঠায় শিহরিত হলেন ভজু শাহ। তিনি ঠিক করলেন রাজুলকে নিয়ে গোকুলদাসের বাড়ি যাবেন। যাওয়ার আগে রাজুলের বক্তব্যগুলো মিলিয়ে দেখার জন্য একটা 'লিস্ট' তৈরি করে ফেললেন। রাজুলের পূর্বজীবনের বাইশটা বক্তব্যের তালিকা। (ভজু শাহই আমাকে এই বাইশটা বক্তব্যের তালিকা তৈরির কথা জানিয়েছিলেন। এই তালিকার বারোটি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিকায় উল্লেখ করেছি। বাকি এখানে তুলে দিচ্ছি।)

এক : গীতার বাবা দেওয়ালী উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রঙ করার আগে বাড়ির রঙ ছিল সবুজ।

দুই : ওরা থাকত একতলায়।

তিন : উনুনে রান্না হত। দুধ গরম হত।

চার : মায়ের নাম শান্তা, অথবা কান্তা।

পাঁচ : রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।

ছয় : বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। (ওদের যে লোহার ব্যবসা ছিল, এ'কথাও বলেছিল রাজুল।)

সাত : গীতার একটি ছোট ভাই ছিল।

আট : প্রিয় বন্ধু জ্যোৎস্নারা থাকত বাড়ির কাছেই।

নয় : মা প্যাঁড়া বানাত।

দশ : বাড়ির পুজোয় ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হত প্যাঁড়া।

(১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে শ্রীশাহ আমাকে জানিয়েছিলেন, আমার আসার প্রায় আগে আগেই ডঃ আয়েন স্টিভেনসন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন রাজুল রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে। তাঁদের দু'জনকেই শ্রীশাহ রাজুলের বাইশটি বক্তব্যের তালিকা দেখিয়েছিলেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জন্মান্তরবাদ রহস্য ও রোমাঞ্চ" গ্রন্থে দেখেছি তিনি তালিকার এগারোটি বক্তব্য আলোচনায় এনেছেন। এগারোটি বিষয়ে অদ্ভুত নীরবতা পালন করেছেন। এটি অবশ্যই এক তথ্য গোপনের দৃষ্টান্ত। কেন তথ্য গোপন? এই তথ্য গোপন কি সত্যকে বিকৃত করেছে? নাকি এই তথ্য ছিল অতি অপ্রয়োজনীয়?

না, এ'বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য হাজির করব, যার সাহায্যে প্রিয় পাঠক-পাঠিকারাই উত্তর খুঁজে নিতে পারবেন।

আয়েন স্টিভেনসন তাঁর লেখা "The Case of Rajul Shah"-তে এই ধরনের সরাসরি তথ্য গোপনের কোনও স্থূল চেষ্টা করেননি। তিনি শ্রীশাহের তৈরি বাইশ-দফা তালিকা হিসেবে আইটেমগুলোর উল্লেখ না করলেও রাজুল যে এ'সব কথা বলেছিল, গ্রন্থটিতে তা জানিয়েছেন।)

•

১৯৬৫-র নভেম্বরে ভজু শাহ রাজুল রহস্য সন্ধানে জুনাগড়ে এলেন। সঙ্গে স্ত্রী, ভাই হিম্মৎলাল্, জামাই প্রেমচাঁদ ও রাজুল। গোকুলদাস থ্যাকারের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু গোকুলদাসকে পাওয়া গেল না। কারণ, গীতার মৃত্যুর পর গোকুলদাস বাড়ি পাল্টেছেন। সেদিন না পাওয়া গেলেও পাওয়া গেল। দু'লাখ লোকের ছোট শহর জুনাগড়ে ব্যবসায়ী গোকুলদাসের ঠিকানার হদিস পাওয়ার অসম্ভব ছিল না বলেই পাওয়া গেল।

তারপর যা যা ঘটল তা সবই নানাভাবে নানা রঙে নানা ঢঙে প্রকাশিত হল নভেম্বর, ডিসেম্বর ধরে ভারতের নানা পত্রিকায়। সবারই মোদ্দা কথা—রাজুল এক নির্ভেজাল জাতিস্মর!!

সে খবর পড়ে অনেক প্যারাসাইকোলজিস্টই এলেন। এলেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আয়েন স্টিভেনসন, ডঃ এল. পি. মেহরোত্রা, ডঃ যমুনা প্রসাদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ; যাকে বলে একেবারে স্টার-মেগাস্টার-সম্মেলন। একটা কাকতালীয় ব্যাপার

হল, এঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন ঝড় তোলা খবরটি প্রকাশের চার বছর বাদে ১৯৬৯-এ। এবং এঁরা প্রত্যেকেই এলেন নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এই সময়ই এইসব বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্টদের দারুণ উজ্জ্বলতার পাশে একটি নিরুজ্জ্বল অতি সাধারণ মানুষও সত্যানুসন্ধানে এসেছিলেন। সেই অকিঞ্চিৎকর মানুষটি এই লেখক।

'৬৫ ও তার পরবর্তী রাজুল রহস্যের অনুসন্ধান পর্বে কী কী ঘটেছিল? সেটা জানতে আসুন আমরা উঁকি মারি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন্মান্তরবাদ : ...' এর পাতায়। পাশাপাশি আমরা ফিরে তাকাব এই একই প্রসঙ্গে সম্পর্কিত সাক্ষীরা কী বলেছেন, তার দিকে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

১. ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ভজু শাহ'র বক্তব্য হিসেবে যা লিখেছেন : "থ্যাকারদের বাড়ির কাছে পৌঁছনোর আগেই এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা রাস্তার ধারে এক দোকান থেকে দুধ কিনছিলেন। তাঁকে দেখেই রাজুলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। রাজুল ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে জানায় : "আমার আগের জন্মের মা।"

শ্রীভজুভাই শাহ তারপর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন, "আমরা ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি কিছুটা সন্দিহানভাবে আমাদের লক্ষ্য করতে করতে জানালেন, তাঁর নাম কাম্বাবেন—তিনি গোকুলদাস থ্যাকারের স্ত্রী।"

"আমাদের তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে আমি ভদ্রমহিলাকে আমার নাতনির কথা বললাম, জানালাম সে তাঁর মৃত কন্যা 'গীতা' বলে নিজেকে মনে করে।

"কাম্বাবেন বিমূঢ়ভাবে রাজুলকে লক্ষ্য করতে থাকেন। দ্বিধা এবং অবিশ্বাসের দোলায় তিনি বিচলিত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু ক্রমশ রাজুলের উৎসাহী এবং উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখে জল ভরে আসে। সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত না হতে পারলেও তিনি গভীর স্নেহে কোলে তুলে নেন। তিনি আমাদের সকলকে তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন...."

আমি কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. শ্রীভজু শাহ (রাজুলের ঠাকুরদা), ২. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহ'র ভাই), ৩. কাম্বাবেন থ্যাকার (গীতার মা)।

আমি কী পেয়েছি এবং মন্তব্য

ক. ভজু শাহ'র কথামত, "সকালে আমরা থ্যাকারদের বাড়ি একটা প্রাথমিক ভ্রমণ সেরে এসে দ্বিতীয় দফায় যখন ও বাড়ি যাচ্ছি, তখন গীতার মা কাম্বাবেন থ্যাকারের সঙ্গে আবার দেখা। কাম্বাবেনকে দেখিয়ে রাজুলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ভদ্রমহিলাকে চেনো?' রাজুল একটু ভেবে উত্তর দিল, 'আমার ও'জন্মের মা'।"

খ. হিম্মৎলাল ভজু শাহের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

গ. কাম্থাবেন একটু অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, "আমাকে দেখিয়ে শ্রীভজু শাহ রাজুলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইনি কি গীতা'র মা?' উত্তরে রাজুল জানিয়েছিল, 'হ্যাঁ, গীতার মা'।"

কাম্থাবেনও জানিয়েছিলেন, "শ্রীশাহদের পরিবারের লোকেরা জানতেন আমি কে। কারণ এই ঘটনার দিন সকালেই শাহ পরিবারের লোকেরা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

আয়েন স্টিভেনসন "The Case of Rajul Shah"-তে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "V. J. Shah himself had met Kantaban Thacker that morning (in a preliminary visit to the Thacker family), and s he knew who she was when Rajul recognized her."

স্টিভেনসনের এই বক্তব্য আমার কথাকেই সমর্থন করছে, যদিও স্টিভেনস রাজুলকে শেষ পর্যন্ত জাতিস্মর বলে চালাতে চেয়েছেন।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

২. ভজু শাহ'রা থ্যাকারদের বাড়িতে পৌঁছনোর পর কাম্থাবেন "তাঁর স্বামী গোকুলদাস থ্যাকারকে খবর পাঠালেন তখনি বাড়িতে আসবার জন্যে।"

"গোকুলদাস ঘরেতে এসে কিছু বলবার আগেই বা তার সঙ্গে অন্য কেউ কথা বলার আগেই রাজুল সকলকে বিস্মিত করে হাসিমুখে বলে ওঠে, আমার আগের বাবা এসে গেছে।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহ'র ভাই), ৩. গোকুলদাস থ্যাকার (গীতার বাবা), ৪. কাম্থাবেন থ্যাকার।

আমি কী পেয়েছি এবং মন্তব্য

ক. ভজু শাহ'র বক্তব্য : "আমরা গোকুলদাসের ঘরে বসে। এমন সময় গোকুলদাস এলেন। কেউ একজন রাজুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কে বলো তো?' রাজুল উত্তরে বলেছিল, 'গোকুলদাস'।"

খ. আমার এক প্রশ্নের উত্তরে হিম্মৎলাল শাহ জানিয়েছিলেন, "সেই সময় অবশ্য আমরা গোকুলদাসের আসা নিয়ে কথা বলছিলাম। ওদের পরিবারের কেউ একজন বলছিলেন, 'খবর পাঠানো হয়েছে। এখুনি গোকুলদাস এসে পড়বেন।' হতে পারে রাজুল এ'কথা শুনেছিল।"

গ. গোকুলদাস অবশ্য অন্য কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা মত, "আমি ঘরে ঢুকতেই ভজু শাহ রাজুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গোকুলদাস কে বলো তো?' রাজুল তখন আমাকে দেখিয়ে বলে, 'এ, এ আমার বাবা'।"

ঘ. কাম্থাবেনের কথা মত, "গীতার বাবা আসার আগে ওকে নিয়ে কথা হচ্ছিল।

আমি ও আমাদের পরিবারের আর একজন কেউ কোনও একটা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলাম, 'গীতার বাবা এখুনি এসে পড়বেন'।"

ঙ. কাম্বাবেন এও জানিয়েছিলেন, তাঁর মনে আছে, 'গীতার বাবা এখুনি এসে পড়বে' বলার পর প্রথম যিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি গীতার বাবা।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে এরপর বলতেই পারি—উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করেছেন। ১৯৬৯-এ আমি যখন সত্যানুসন্ধানে নামি তখনও পর্যন্ত রাজুল একবারের জন্যেও গীতার বাবার নাম জানাতে পারেনি। পূর্বজন্মের এত স্মৃতি মনে রেখে বাবার নামটাই ভুলে যাওয়া খুবই অস্বাভাবিক।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৩. "রাজুল জানায় যে তার আগের বাবার লোহালক্কড়ের দোকান ছিল। এটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়..."

কাদের মন্তব্য গ্রহণ করেছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. ভজু শাহ।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. গীতার বাবা গোকুলদাসের ব্যবসা ছিল চাল, গম, ডাল ইত্যাদি বিক্রির।

খ. 'সাইড-বিজনেস' হিসেবেও লোহালক্কড়ের ব্যবসা ছিল না।

গ. রাজুল এও বলত—গীতার বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। এটিও ছিল ভুল তথ্য।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৪. "বাড়ি ঘর দোরের বর্ণনা বাইরের রঙ ইত্যাদি নিয়ে তার সব কথাই মিলে যায়।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. আমি নিজে দেখে এসেছি, ৩. ভজু শাহ।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. রাজুল বলেছিল, ওদের ঘরের রঙ ছিল সবুজ।

খ (১). গোকুলদাস জানিয়েছিলেন, গীতার জীবনে বাড়ির রং কোনও সময়ের জন্যেই সবুজ ছিল না।

খ (২). বাড়ির রং ছিল হলদে। আমিও হলদেই দেখেছি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৫. "গোকুলদাস থ্যাকার দেওয়ালির সময়ে বাড়িতে লাল চুনকাম করিয়েছিলেন।" রাজুলের দেওয়া এই তথ্য মিলে গিয়েছিল।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার (গীতার বাবা)।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও দেওয়ালিতেই বাড়িতে লাল রঙ লাগাননি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৬. গোকুলদাসের বাড়িতে বারান্দা ছিল।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. আমি নিজে দেখে এসেছি।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

ও বাড়িতে কোনও বারান্দা ছিল না।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৭. "প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. কান্থাবেন থ্যাকার।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

খুব সামান্য পরিমাণ দুধই কেনা হত। পরিমাণটা আধ সের থেকে বেশি হলে কখনও-সখনও এক সেরের মত।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৮. "রাজুল জানায় : 'আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে 'বেবী' বলে ডাকত। তারপর যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই 'গীতা' বলে ডাকত।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. কান্থাবেন থ্যাকার।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার বাবা ও মা দু'জনেই জানিয়েছিলেন, গীতা নামকরণের আগে তাঁরা মেয়েকে ডাকতেন 'টিকুডি' বলে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

৯. "যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস থ্যাকার, ৩. প্রভীনচন্দ্র শাহ (রাজুলের বাবা)।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতারা যে বাড়িতে থাকত, তাতে ছিল দুটি শোয়ার ঘর ও একটি রান্নাঘর। রাজুলের বাবা থাকতেন যে বাড়িতে, তাতেও ছিল দুটি ঘর ও একটি রান্নাঘর।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

১০. "সঠিক সনাক্তকরণ থেকে রাজুলকে জাতিস্মর অর্থাৎ গীতার পুনর্জন্ম ছাড়া অন্য কোন সংজ্ঞায় বিচার করা যায় না।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. নির্মলা (গীতার দিদি), ৩. কান্থাবেন, ৪. গোকুলদাস।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. গীতার মা কান্থাবেন থ্যাকারের শনাক্তকরণ কখনই ত্রুটিমুক্ত শনাক্তকরণ নয়।

খ. গীতার বাবা গোকুলদাস থ্যাকারের শনাক্তকরণও কখনই ত্রুটিমুক্ত সঠিক শনাক্তকরণ ছিল না।

দুটি শনাক্তকরণই যে ত্রুটিযুক্ত, সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এ'বার বাকি শনাক্তকরণের দিকে চোখ ফেরাই :

গ. গীতার দিদি নির্মলাকে শনাক্ত করতে রাজুল ব্যর্থ হয়েছিল। ভজু শাহ যখন রাজুল-সহ গোকুলদাসের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন নির্মলা কৌতূহলী চোখে রাজুলকে দেখছিল। গোকুলদাস পরিবারের একজন রাজুলকে জিজ্ঞেস করেন, "এই মহিলাকে চিনতে পার?" উত্তরে রাজুল জানিয়েছিল, "ও ছিল আমার পিসি।" নির্মলা ছিল গীতার দু'বছরের এবং রাজুলের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়।

ঘ. কাকিমা সেই সময় ঘরে উপস্থিত ছিলেন। কাকিমা'কে দেখিয়ে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "একে চিনতে পারছ?" রাজুল চিনতে পারেনি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কী বলা হয়েছে

১১. "বাড়িতে পৌঁছে রাজুল গোকুলদাস আসার আগে অন্য সব বৃদ্ধাদের মধ্যে থেকে গীতার ঠাকুমা শ্রীমতী জাদোবেনকে শনাক্ত করে।"

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. কান্থাবেন, ৪. নির্মলা, ৫. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহর ভাই)।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

পাঁচ সাক্ষ্যের বক্তব্য থেকে একই কথা জানতে পারি, সেই সময় গোকুলদাসের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন একজনমাত্র বৃদ্ধা, এবং তিনি হলেন গীতার ঠাকুমা। রাজুল তার দুই ঠাকুমাকে দেখছে। দু'জনেই বৃদ্ধা। ফলে ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে "এঁদের মধ্যে কে গীতার ঠাকুমা, বলতে পার?" রাজুল উপস্থিত একমাত্র বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলেছে, "এই গীতার ঠাকুমা"। কারণ রাজুলের চোখে—ঠাকুমা ও বৃদ্ধা সমার্থক শব্দের মত হয়ে গেছে। ফলে বৃদ্ধাকে ঠাকুমা বলে চিহ্নিত করবে, এটাই স্বাভাবিক।

এটা কোনওভাবেই সঠিক শনাক্তকরণের দৃষ্টান্ত নয়। সঠিক শনাক্তকরণ বলা

যেতে পারত তখন, যখন সমবয়স্ক বৃদ্ধাদের সঙ্গে ঠাকুমা হাজির, এবং রাজুল তাকে ঠাকুমা বলেই চিনিয়ে দিচ্ছে। সঠিক শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার ধরন অবশ্যই খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। কারণ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েও যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তাকে চালিত করা যায়, তাকে সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করা যায়। প্রশ্নের মধ্যে এমন কোনও ইঙ্গিত থাকলে শনাক্তকরণ আর নিরপেক্ষ থাকে না। মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

রাজুল যে পরিস্থিতিতে গীতার ঠাকুমাকে শনাক্ত করেছিল, তা কোনওভাবেই সঠিক শনাক্তকরণ ছিল না।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে এরপরও ছাপার অক্ষরে লেখা আছে "পুনর্জন্মের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজুল গীতার জীবনের যা কিছু উল্লেখ করেছে তার সবকটিই অভ্রান্ত সত্য এবং বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে তার একশভাগ মিল ছিল।"

প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতে এমন নিটোল একশভাগ মিথ্যাচারিতার দৃষ্টান্ত খুব বেশি একটা দেখেছেন কি?

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজুলের কথার সঙ্গে রাজুলের পূর্বজীবনের যে সব আশ্চর্য (!) মিল খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থটিতে যেসব কথা মুদ্রিত হয়নি, অথচ সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যার উল্লেখ থাকা একান্তই জরুরি ছিল, সেগুলোর দিকে আমরা এ'বার নজর দেব।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

১. গীতার বাবা দেওয়ালি উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রং করেছিল।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার জীবনকালে কোনও সময়ের জন্যেই বাড়ির বাইরে বা ভিতরে লাল রং করা হয়নি।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

২. লাল রং করার আগে বাড়ির রং ছিল সবুজ।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার জীবনকালে কখনই বাড়ির বাইরের রং সবুজ ছিল না।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৩. গীতারা থাকত একতলায়।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. কান্থাবেন।

আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছে তিনতলার ফ্ল্যাটে।

এই ভুলকে কীভাবে ঢাকা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন আয়েন স্টিভেনসন, একটু দেখুন। স্টিভেনসন বলছেন, "The error is a natural one for a small girl who played much of the time in the downstairs area, returning to the family apartment mainly to eat and sleep."

অর্থাৎ একটা ছোট মেয়ের পক্ষে এ ধরনের ভুল করাটা স্বাভাবিক, কারণ সারা দিনের বেশির ভাগ সময়ই ও একতলায় খেলত। সাধারণত নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরত খেতে ও ঘুমোতে।

অতএব 'সাত খুন মাপ'। রাজুল মুখে ভুল বললেও আসলে ঠিকই বলেছিল।

প্যারাসাইকোলজিস্টদের এমনি সব কুযুক্তির হেলায় একশভাগ ভুলও একশভাগ ঠিক হয়ে যায়।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৪. উনুনে রান্না হত। দুধ গরম হত।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন থ্যাকার।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

রান্না ও দুধ গরম হত স্টোভে। এখানেও স্টিভেনসনের মত প্যারাসাইকোলজিস্টদের অদ্ভুত যুক্তি—এতটুকু মেয়ে কি উনুন ও স্টোভের পার্থক্য বোঝে? অতএব এ'ক্ষেত্রেও রাজুলের বক্তব্য একশভাগ ঠিক।

ভারি বিচিত্র ওঁদের একশভাগের হিসেব!

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৫. গীতার মায়ের নাম 'শান্তা' অথবা 'কান্থা'।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. সুশীলাবেন শাহ (হিম্মৎলালের স্ত্রী), ৩. কান্থাবেন।

আমি কী পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. ভজু শাহ'র কথামত, রাজুল জানিয়েছিল ওর আগের জন্মের মায়ের নাম ছিল 'কান্থা'।

খ. সুশীলাবেনের কথামত, রাজুল জানিয়েছিল ওর আগের জন্মের মায়ের নাম ছিল 'শান্তা'।

গ. গীতার মায়ের নাম 'কান্থাবেন'।

ঘ. ভজু শাহ এ'কথায় স্বীকার করেছিলেন, হ্যাঁ, রাজুল অবশ্য মাঝে-মধ্যেই গীতার মায়ের নাম 'শান্তা' বলত।

ঙ. সুশীলাবেন জানিয়েছিলেন, না, তাঁর কাছে রাজুল গীতার মায়ের নাম 'শান্তা' ছাড়া আর কোনও নাম কখনও বলেনি।

অর্থাৎ, রাজুল গীতার মায়ের নাম ঠিক বলেছিল, কি ভুল বলেছিল—এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই—রাজুল কিন্তু কখনই ওর গত জন্মের বাবার নাম বলতে পারেনি।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৬. রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।

কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. সুধাবেন দেশাই (ভজু শাহর মেয়ে), ২. ভজু শাহ, ৩. গোকুলদাস, ৪. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

ক. রাজুল এ'কথা বলেছিল ওর পিসি সুধাবেনকে। সুধাবেনের কাছ থেকে ভজু শাহ এই তথ্য জেনেছিলেন।

খ. রাজুলের বাবার জন্ম সাল ১৯৩২, গীতার বাবার জন্ম সাল ১৯২৭।

গ. দুজনের বয়সের পার্থক্য ৫ বছর।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৭. গীতার বাবার মিষ্টির দোকান ছিল।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার বাবার কোনও দিনই মিষ্টির দোকান ছিল না।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৮. গীতার একটি ছোট ভাই ছিল।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন, ৩. গোকুলদাস, ৪. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার কোনও ছোট ভাই ছিল না।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

৯. গীতার প্রিয় বন্ধুর নাম জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না থাকত গীতাদের বাড়ির কাছেই।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. হিম্মৎলাল শাহ, ৩. রাজুল, ৪. গোকুলদাস, ৫. কান্থাবেন, ৬. নির্মলা (গীতার দিদি)

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার মা, বাবা ও দিদি তিনজনই জানিয়েছিলেন ওরা গীতার খেলার যতজন সঙ্গীদের চেনেন, তাদের মধ্যে 'জ্যোৎস্না' নামের কেউ ছিল না।

নির্মলা এ'কথাও বলেছে, "বোনের সঙ্গী সকলকেই চিনতাম। ওর প্রিয় সঙ্গী, অথচ চিনতাম না—এমনটা হতেই পারে না।"

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

১০. গীতার মা 'প্যাঁড়া' (ক্ষীরের সন্দেশ) বানাতেন।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন, ৩. রাজুল।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

গীতার মা কান্থাবেন কখনই প্যাঁড়া বানাতেন না। প্যাঁড়া খাওয়ার ইচ্ছে হলে দোকান থেকে কিনে আনতেন।

গুজরাটে প্যাঁড়া জনপ্রিয় মিষ্টি। অনেক বাড়ির মহিলারাও বাড়িতেই প্যাঁড়া তৈরি করেন। রাজুল ওর মা প্রভাবেনকেও প্যাঁড়া বানাতে দেখেছে।

রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল

১১. গীতাদের বাড়ির পুজোয় ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হত প্যাঁড়া।

যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি

১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন, ৩. নির্মলা।

আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য

বাড়ির পুজোয় ফল দেওয়া হত, প্যাঁড়া নয়।

সত্যানুসন্ধানের স্বার্থে স্বীকার করছি রাজুর পূর্বজীবন বিষয়ে কিছু কথা গীতার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। কোন্ কোন্ কথাগুলো মিলে গিয়েছিল একটু দেখা যাক।

এক : গীতা ছোটবেলাতেই মারা যায়।

দুই : বাবা বেশিরভাগ সময় ধুতি পরত। (গুজরাটের হিন্দুদের বেশিরভাগই ধুতি পরেন। রাজুলও তেমনটাই দেখে এসেছে। ফলে রাজুলের পক্ষে এমনটা বলাই স্বাভাবিক।)

তিন : গোকুলদাস স্টিলের বাসনে খেতেন।

চার : গীতারা রাতের খাবার খেত রাতে। (রাজুলের খেলার সঙ্গীদের অনেকেই ছিল হিন্দু। তারা রাতের খাবার রাতে খায়, এটা রাজুলের যে অজানা ছিল না, সে কথা রাজুল নিজেই বলেছে।)

পাঁচ : গীতাদের বাড়ির ঠাকুরের গায়ে থাকত পোশাক।

(রাজুলরা জৈন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের। রাজুল যেমনভাবে জানত ওদের ধর্মের

ঠাকুরের শরীরে পোশাক থাকে না, তেমনিভাবেই জানত, ওর হিন্দু বন্ধুদের ঠাকুর পোশাক পরে। রাজুল বলতে চেয়েছিল, ও গত জন্মে হিন্দু পরিবারে জন্মেছিল। তাই গীতার ঠাকুর পোশাক পরেছিল—রাজুলের বর্ণনায়।)

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই কথাগুলোই বা কী করে মিলল? আসলে, এ'সব মিলিয়ে দেওয়া খুবই সোজা। ধরুন, আপনি বললেন—

১. গতজন্মে আমার নাম ছিল গোপাল।
২. জন্মেছিলাম কলকাতায়।
৩. মারা যাই শৈশবে।
৪. আমার বাবা ছিল।
৫. আমার মা ছিল।
৬. আমার কাকা ছিল।
৭. আমার মামা ছিল।
৮. বাবা প্যান্ট-শার্ট পরতেন।
৯. ঘরে পরতেন পাজামা অথবা লুঙ্গি।
১০. বাবা দাড়ি কামাতেন।
১১. বাবা বাজার থেকে আলু, তরকারি এ'সব নিয়ে আসতেন।
১২. বাবার উচ্চতা ছিল মাঝারি।
১৩. বাবা মাঝে-মাঝে পেটের গোলমালে ভুগতেন।
১৪. বাবা আমাকে বকতেন।
১৫. বাবা আমাকে আদর করতেন।
১৬. মা রান্না করতেন।
১৭. মা খেতেন আমাদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর.
১৮. আমরা ভাত খেতাম।
১৯. মাঝে-মাঝে রুটি খেতাম।
২০. আমি মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি।
২১. মা-বাবার সঙ্গে দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখেছি।
২২. আমাদের পাড়ায় দুর্গাপুজো হত।
২৩. আমার মা গয়না পরতেন।
২৪. মা সিঁদুরের টিপ দিতেন।
২৫. বাবা মাঝে-মাঝে মাকে বকতেন।
২৬. মামা-মাসিরা বেড়াতে এলে মা'র খুব আনন্দ হতো।
২৭. আমি সেলুনে চুল ছাঁটতাম।
২৮. আমি স্কুলে পড়েছি।
২৯. আমার বই খাতা ছিল।

৩০. আমার নীল রঙের একটা শার্ট ছিল।

আপনার এই তিরিশটা মন্তব্য মিলে যাওয়া একগাদা গোপাল আপনি পেয়ে যাবেন। ধরুন আপনার বয়স এখন তিরিশ। একত্রিশ বছর আগে থেকে ঘাঁটতে থাকুন কলকাতা কর্পোরেশনের মৃত্যু নিবন্ধিকরণের খাতা। এক বছরের পাতা ওল্টালেই বহু গোপালের মৃত্যুর হদিস পেয়ে যাবেন। পাঁচ-দশ বছরের খাতা ঘাঁটলে এত গোপালের মৃত্যু দেখতে পাবেন যে তখন বলতে ইচ্ছে হবে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। এ'বার ওইসব গোপালদের ঠিকানা নিয়ে তিরিশ দফা মন্তব্য মেলাতে শুরু করুন। তাতেও পেয়ে যাবেন বহু গোপাল।

আপনি গোপাল ছেড়ে নিজেকে আগের জন্মের ফতেমা ঘোষণা করুন, তাতেও অসুবিধে নেই। বলতে শুরু করুন—

১. আমি কলকাতায় থাকতাম।
২. অল্প বয়সে মারা যাই।
৩. আমার বাবা ছিল।
৪. আমার মা ছিল।
৫. আমার বাবার দু'বিয়ে।
৬. আমার ভাই-বোন ছিল।
৭. আমার মা শাড়ি পরতেন।
৮. বেড়াতে গেলে শাড়ির ওপর বোরখা পরতেন।
৯. মা'র কালো রঙের বোরখা ছিল।
১০. আমি বোরখা পরতাম না।
১১. আমি সালোয়ার-কামিজ পরতাম।
১২. আমার কালো রঙের জরি বসানো সালোয়ার-কামিজ ছিল।
১৩. আমার সুন্দর রঙিন চটি ছিল।
১৪. বাবা লুঙ্গি পরতেন।
১৫. বাবা শার্ট ও পাঞ্জাবি দুইই পরতেন।
১৬. বিশেষ বিশেষ দিনে বাবা টুপি পরতেন।
১৭. আমাদের বাড়ি আতর আসত।
১৮. আমাদের বাড়ি সুর্মা আসত।
১৯. আমরা ভাত ও রুটি দুই খেতাম।
২০. মা রান্না করতেন।
২১. মা মাঝে-মাঝে মাংস রাঁধতেন।
২২. আমি বিরিয়ানি খেয়েছি।
২৩. আমার কাকা ছিল।
২৪. আমার বই ছিল।
২৫. আমার খাতা ছিল।

এমনি আরো অনেক কিছুই সামান্য মাথা খাটিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে পারেন। একজন প্যারাসাইকোলজিস্ট পাকড়ে যদি তাঁকে এ'সব কথা শোনাতে পারেন, তাহলে একগাদা ফতেমার খোঁজে আপনাকে আর দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না। বরং এত ফতেমা নিয়ে পাগল হবার জোগাড় হবেন সেই প্যারাসাইকোলজিস্ট। অবশ্য যদি তিনি শিক্ষানবিশ হন, তবেই। পাকা মাথা হলে এক ফতেমার খোঁজ পেতেই প্রচার-মাধ্যমগুলো তোলপাড় করে ছাড়বেন। কোন্ তথ্য হাজির করবেন, কোনটা চেপে যাবেন, এ'সব করেই তো মাথা পেকেছে। তারপর এ'গুলো খাওয়াবেন প্রচার-মাধ্যমগুলোকে। আর এ'ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেরই অবস্থা, "এই কাঙাল, তুই ভাত খাবি?" "নুন নিয়ে তো বসেই আছি।"

আসুন, এবার 'রাজুল' নাটকে যবনিকা ফেলার আগে জরুরি আর দু'একটি তথ্য আমরা জেনে নেই।

রাজুলের জন্ম ১৯৬০-এ আগস্টে। রাজুলের বাবা ১৯৬০-এর ডিসেম্বর থেকে থাকতে শুরু করেন 'কেশর'-এ। ঠাকুরদা থাকতেন 'ওয়াঙ্কানের'-এ। রাজুল থেকেছে কেশর ও ওয়াঙ্কানের-এ। দুটি স্থানই গীতার শহর জুনাগড়ের কাছেই। জুনাগড় থেকে কেশরের দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটারের পথ। আধঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে। ওয়াঙ্কানেরও জুনাগড়ে র কাছেরই এক শহর। এই তিন শহরের লোকজনদের মধ্যে যাতায়াত আছে, আত্মীয়তা আছে, পরিচিতি আছে। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি—আছে। রাজুল ওর বন্ধু বা অন্য কারও কাছ থেকে গীতার বিষয়ে কিছু কিছু কথা শুনে থাকতে পারে। এটা সম্ভব। তারপর শিশু রাজুল তার আবেগ ও কল্পনার সাহায্যে একসময় নিজের অজান্তে নিজেকে পূর্বজন্মের 'গীতা' বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সেই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত কথার কিছু কিছু মিলে যেতেই কেউ কেউ আবেগতাড়িত হয়েছেন, উত্তেজিত হয়েছেন। আঁকড়ে ধরা প্রাচীন বিশ্বাসকে সত্যি হয়ে উঠতে দেখার উত্তেজনা।

অতি আবেগের স্রোতে অনেক সময়ই যুক্তি ভেসে যায়। এখানেও অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে। তাঁরা 'না মেলা' বিষয়ে অনেক সময়ই সচেতন বা অচেতনভাবে নীরব থেকেছেন। সোচ্চার হয়েছেন 'হ্যাঁ মেলা' নিয়ে। রাজুলকে 'গীতা' বলে চালিয়ে দিয়ে ভুলু শাহ পরিবারের কোনও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কারণ রাজুলদের পরিবার গীতাদের পরিবারের তুলনায় বিত্তবান। গীতারা নেহাতই মধ্যবিত্ত।

সমস্ত দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার পর একথা বলতে পারি—রাজুলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে কোনও প্রতারণার ষড়যন্ত্র ছিল না, ছিল রাজুলের মানসিক অবস্থা।

জাতিস্মর তদন্ত ৭ ঃ রিনা গুপ্ত

১৯৬৮-এর জুলাইতে খবর পেলাম, দিল্লিতে একজন জাতিস্মরের জন্ম হয়েছে। খবরটা দিলেন একটি বাম রাজনৈতিক দলের নেতা। তাঁর ইচ্ছে—সময়-সুযোগ মতো আমি যেন এ বিষয়ে একটা অনুসন্ধান চালাই।

খবরটা এই ধরনের।

নয়াদিল্লির রানী ঝাঁসি রোডে এক দম্পতি থাকেন। সন্তোষকুমার গুপ্ত ও প্রেম গুপ্ত। সন্তোষবাবু চাকরি করেন তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরে উঁচু পদে। প্রেম স্কুল শিক্ষিকা। মেয়ে রিনার জন্ম ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৮ সালে সংবাদ মাধ্যমের কাছে খবর আসে রিনা নাকি জাতিস্মর। রিনা গত জন্মে এক শিখ পরিবারে জন্মে ছিল। ওর স্বামী ওকে ছুরি মেরে হত্যা করেছিল।

সাংবাদিকরা এমন একটি শিখ পরিবারের খোঁজ পেয়েছেন, যে পরিবারে একজন স্ত্রী স্বামীর হাতে খুন হন। খুনের তারিখ ও সালটা ছিল ১৯৬১-র ২ জুন।

রিনার খবরটা এক সময় ভুলেই যাচ্ছিলাম নানা কাজের চাপে। সময়টা উত্তাল। কাজেই চাপও ছিল অনেক বেশি। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি খারাপ মনকে চাঙ্গা করতে নয়াদিল্লি গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্রামের, কিন্তু তা হল না। সাংবাদিক মোহিতজী জানালেন রিনার পূর্বজন্মের অনেক খবর। নয়াদিল্লির অশোক নগরে সর্দার কিষেণ সিং সপরিবারে থাকেন। তাঁর মেয়ে গুরদীপ খুন হন জামাই সুরজিৎ-এর হাতে। তখন সুরজিৎ-এর বয়স ছিল বছর তিরিশেক। গুরদীপের তখন ২৭-২৮ বছর বয়েস। গুরদীপই নাকি মৃত্যুর পর রিনা হয়ে জন্মেছে।

আমার যাওয়ার মাস তিনেক আগে (১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে) প্যারাসাইকোলজিস্ট ড. হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লিতে এসেছিলেন। অনুসন্ধান চালিয়ে ঘোষণা করেছেন, রিনা সত্যিই জাতিস্মর। অনুসন্ধান চালাতে কথা বলেছেন রিনার বাবা সন্তোষকুমার গুপ্ত, মা প্রেম গুপ্ত, ঠাকুরদা ডা. হরিশ্চন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে। কথা বলেছেন পূর্বজন্মের বাবা (গুরদীপের বাবা) সর্দার কিষেণ সিং, পূর্বজন্মের মা কারতার সিং, আগের জন্মের দাদা পাপেন্দ্র সিং, ছোট বোন সুর্ণো এবং স্বামী সুরজিৎ সিং-এর সঙ্গে।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় রিনাকে জ তিস্মর প্রমাণ করতে যে সব যুক্তি হাজির করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—

(১) রিনা বছর দুয়েক বয়স থেকে মা-বাবা-ঠাকুরদা, মাসি ও মায়ের বন্ধুদের কাছে বক্‌বক্‌ করত—আমার বর আমাকে পেটে ছুরি মেরেছিল। আমি মরে গিয়েছিলাম।

(২) গত জন্মে ওর চার ছেলে-মেয়ে ছিল।

(৩) বর পেটে ছুরি মেরেছিল, তার দাগ এখনও পেটে আছে।

(৪) নয়াদিল্লিতে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। এক শিখ স্বামী তার স্ত্রীকে ছুরি মেরে হত্যা করে জেলে যায়। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৬১-র ২ জুন। তখন স্বামী সুরজিতের বয়স ছিল ৩০-৩২ বছর। গুরদীপ ছিল সুরজিতের থেকে বছর তিনেকের ছোট।

(৫) রিনা জানিয়েছিল স্বামী মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধত। সুরজিৎ চুলে ঝুঁটি বাঁধত।

(৬) রিনার খবর পৌঁছয় গুরদীপের বাবা কিষেণ সিং-এর কাছে। ১৯৬৪ সালের ২৭ মে তিনি সপরিবারে রিনাকে দেখতে আসেন সন্তোষকুমার গুপ্তের বাড়ি।

(৭) রিনা সেদিন তার বাবা, মা, দাদা ও বোনকে দেখিয়ে ঠিক-ঠাক পরিচয় দিয়েছিল। অর্থাৎ তাঁদের শনাক্ত করেছিল।

(৮) রিনা তার পূর্বজন্মের মেয়ে ও ছেলের নাম ঠিক-ঠাক বলেছিল।

(৯) রিনা কিষেণ সিং-এর বাড়ি যায় মা-বাবার সঙ্গে। সেটা ছিল ২৯ শে মে ১৯৬৮-এর ঘটনা। সেখানে গুরদীপের ছবি দেখে চিনতে পারে।

(১০) গুরদীপের স্বামী সুরজিৎ সিং ১৯৭১-এ জেল থেকে ছাড়া পায়। গুরদীপ রিনা হয়ে নয়াদিল্লিতেই জন্মেছে শুনে রিনার বাড়িতে আসে।

রিনা ওকে দেখেই ভয় পেয়ে কান্না শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে জানায়—এই লোকটাই আমার স্বামী ছিল। আমাকে খুন করেছিল।

(১১) বিয়ের পর সুরজিৎ স্কুটার স্টার্ট দিতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিল বলে জানায় রিনা। সুরজিৎ সত্যিই পায়ে চোট পেয়েছিল।

রিনার পূর্বজন্মের স্মৃতিকথা দিনের পর দিন নোট করে সম্পর্কিত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রিনা সত্যিই আগের জন্মে গুরদীপ ছিলেন। রিনার পক্ষে গুরদীপের গল্প শুনে মানসিকভাবে গুরদীপ ভাবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, গুরদীপের পরিবার ও রিনার পরিবারের কোনও 'কমন ফ্রেন্ড' ছিলেন না, যাঁর কাছ থেকে রিনা গুরদীপ হত্যার গল্প শুনতে পারে।

আমি সত্যানুসন্ধানে যা পেলাম

একজন 'যুক্তিবাদী'র হওয়া উচিত যুক্তির দিকে নমনীয় থাকা। মুক্ত মনে সত্যানুসন্ধান করা। সে ভাবে সত্যানুসন্ধানে নেমে আমি যা পেয়েছি—

রিনা যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
১। আমার স্বামী খুব খারাপ। আমাকে খুন করেছিল পেটে ছুরি মেরে। পেটে কাটা দাগ আছে।	ক। সন্তোষকুমার গুপ্ত (বাবা), খ। প্রেম গুপ্ত (মা), গ। পুষ্পা (মাসি), ঘ। ডা. হরিশচন্দ্র গুপ্ত (ঠাকুরদা), ঙ। কিষেণ সিং (গুরদীপের বাবা), চ। কারতার সিং (গুরদীপের মা), ছ। পাপেন্দ্র সিং (গুরদীপের দাদা), জ। সুরজিৎ সিং (গুরদীপের স্বামী)।	রিনার মা, বাবা, মাসি, ঠাকুরদা জানান, রিনা বছর দুয়েক বয়স থেকে তাঁদের বলত, স্বামী খুব খারাপ লোক। পেটে ছুরি মেরে খুন করেছিল। পেটে একটা কাটা দাগ আছে। গুরদীপের বাবা, মা, দাদা ও স্বামী সুরজিৎ জানান, গুরদীপের শরীরে ছুরি দিয়ে অনেকগুলো আঘাত করা হয়েছিল। অর্থাৎ শুধু পেটেই আঘাত করা হয়নি। আমার প্রশ্নের উত্তরে রিনা ও তার মামা-বাবা জানান, শরীরে আর কোনও আঘাতের চিহ্নটা জন্ম-চিহ্ন নয়। ঠাকুরদা ডা. গুপ্ত জানিয়েছিলেন, রিনা বছরখানেক বয়সে পড়ে গিয়েছিল এবং পেটে ভাঙা কাঁচ ফুটে গিয়েছিল।
২। স্বামী একদিন স্কুটার স্টার্ট করতে গিয়ে পায়ে খুব চোট পায়।	মাসি পুষ্পা জানান, এই কাহিনি তিনি রিনার কাছে শুনেছেন। মাসি উচ্চশিক্ষিতা। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে সংস্কৃতে ডক্টরেট।	সুরজিৎ তার সাক্ষ্যে জানান, স্কুটার ছিলই না। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।
৩। আমি পূর্বজন্মের বাবা-মা-দাদা, বোন প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিলাম ও চিনিয়ে দিয়েছিলাম।	পূর্বজন্মের তথাকথিত বাবা-মা-ভাই ও বোন স্বর্ণ ওরফে সুর্ণো। এজন্মের বাবা-মা-ঠাকুরদা।	ঠাকুরদা ডা. গুপ্ত জানান, গুরদীপের বাবা-মা-দাদা ও বোন ২৭ মে, ১৯৬৪-তে আমাদের বাড়ি আসেন খবর দিয়ে। রিনার মা-বাবা জানান,

রিনা যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		গুরদীপের বাবা-মা-দাদা ও বোনের আসার খবর আমরা জানতাম। রিনাও আমাদের কথা শুনেছিল। গুরদীপের বাবা ঘরে ঢুকে ডা. গুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত ও প্রেম গুপ্তকে নিজের পরিচয় দেন, "আমি সর্দার কিষেণ সিং, গুরদীপের হতভাগ্য বাবা" তারপর নিজের পরিবারে সকলের সঙ্গেই পরিচয় করি দেন। তখন ওই ঘরে রিনা হাজির ছিল। নিরপেক্ষতার সঙ্গে দেখা হয়নি যে রিনা আদৌ গুরদীপের পরিবারের সকলকে চিনতে পারছে কিনা? আগত চার জনের পরিচয় জানার পর তাদের পরিচয় আবার কারও বলার মধ্যে কোনও আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা নেই।
৪। স্বামীকে দেখেই চিনতে পারি ও কাঁদতে থাকি। ভয় হচ্ছিল ও আবার আমাকে যদি খুন করে?	রিনা, রিনার বাবা-মা ও সুরজিৎ সিং।	সুরজিতের কথামত রিনাকে দেখতে যাই ১৯৭৪-এর ২৪ ডিসেম্বর। শুনেছি গুরদীপ আবার জন্মেছে রিনা হয়ে। তাই কৌতূহল মেটাতে গিয়েছিলাম। দরজা খুলে দিয়েছিলেন রিনার মা। পিছনেই ছিল রিনা। আমি রিনার মাকে আমার পরিচয় দিই। জানাই আমি গুরদীপের হাজব্যান্ড সুরজিৎ সিং। রাগের মাথায় গুরদীপকে মেরে এখন বুঝতে পারি কত

রিনা যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		বড় ভুল সেদিন করেছিলাম। আমি রিনার দিকে ঝুঁকে দেখতে যাই। ওর হাত ধরতে যেতেই কেঁদে ওঠে। আমি সুরজিতের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আপনাকে দেখে রিনা কি চিনতে পেরেছিল? উত্তরে সুরজিৎ জানিয়ে ছিলেন, "না আমাকে দেখে চিনতে পারেনি।" সুরজিতের আদৌ মনে হয়নি যে রিনাই গুরদীপ।
	রিনার মা-বাবা-ঠাকুরদা বিজেন্দ্র।	সাক্ষীদের প্রত্যেকেই বলেছেন, গুরদীপের বাবা সর্দার কিষেণ সিং-এর পরিবারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের কোনও রকম পরিচয় ছিল না। অতএব এই তথ্য খাটে না যে রিনা তার পরিবার বা পরিচিত কারও কাছ থেকে গুরদীপের খুনের নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা শুনেছিল এবং অবচেতন মনে তা গেঁথে গিয়েছিল। তারপর একনাগাড়ে গুরদীপের কথা ভাবতে ভাবতে রিনার মস্তিষ্ক-কোষের কাজ-কর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে রিনা নিজের সত্তার মধ্যে গুরদীপের সত্তাকে অনুভব করেছিল---এই মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব রিনার বেলায় খাটে না বলে মনে করেন ডা. গুপ্তের পরিবার।

রিনা যা বলেছে	এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি	আমার মন্তব্য
		গুরদীপের গল্প রিনার শোনার সম্ভাবনা ছিল কি না—এটা এই সত্যানু- সন্ধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রিনার মা প্রেম গুপ্তের পারিবারিক বন্ধুও ছিলেন বিজেন্দ্র। তিনি প্রেমকে জানিয়েছিলেন, তাঁরই আত্মীয় সুরজিৎ সিং নিজের স্ত্রী গুরদীপকে ছুরি মেরে খুন করেন। গুরদীপের গল্প ডিটেলে বলেছেন বিজেন্দ্র। প্রেম সেই গল্প করেছেন রিনার বাবা সন্তোষের কাছে। রিনাও তা শুনেছে। বিজেন্দ্র রিনার বাড়ি এলে রিনার কৌতূহল মেটাতে আবার সেই গল্পের অবতারণা করেন বিজেন্দ্র। এত সব তথ্য হাতে আসার পর আমরা কখনই' ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি না যে, রিনা একজন জাতিস্মর, পূর্ব জন্মে ছিল গুরদীপ। বরং আমার তথ্য-প্রমাণ একথাই বলে, ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মানসিক রোগীকে চিকিৎসার সৎ পরামর্শ না দিয়ে জাতিস্মর বানাবার লোভে তাকে আরও বেশি করে মানসিক রোগী করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

জাতিস্মর তদন্ত ৮ : রাজেশ কুমার

IBN7 ও Z news দুটি সর্বভারতীয় জনপ্রিয় 'নিউজ চ্যানেল'। ১৩ জুলাই, ২০০৭ শুক্রবার, সকাল থেকে একটা খবর—চমকে দেওয়ার মতো একজন জাতিস্মর এই মুহূর্তে তাদের ক্যামেরাবন্দি।

জাতিস্মরের নাম রাজেশ। উত্তরপ্রদেশের সাহরণপুর গ্রামের ছেলে। বয়স ১৪ বছর। পড়ে ক্লাশ নাইনে, গ্রামেরই একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। রাজেশের মাতৃভাষা হিন্দি।

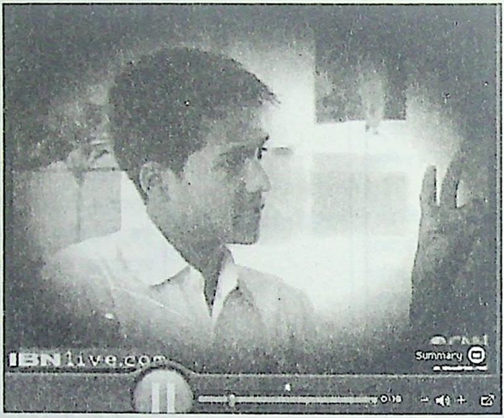

রাজেশ কুমার

IBN7 ও Z news-এর খবর অনুসারে ২০০৫ সালের মাঝামাঝি থেকে গ্রামবাসীরা, স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা লক্ষ্য করেন রাজেশ হঠাৎই কেমন পাল্টে গেছে। যে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে হোঁচট খেত সে এখন আমেরিকান উচ্চারণে নিখুঁত ইংরেজি বলে। মাস তিন-চার আগে যে রাজেশ পড়াশুনা নিয়ে প্রায়ই বকুনি খেত, সে এখন ইলেভেন-টুয়েলভ-এর ছাত্রদের পড়াচ্ছে। হেডমাস্টার থেকে স্কুল টিচারদের বিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছে দাপুটে ইংরেজিতে। টিচারদের টিচারের ভূমিকায় রাজেশকে আমরা দেখলাম দুটি চ্যানেলের ক্যামেরাতেই।

১৪ বছর বয়সের রাজেশ এত বদলে গেল কেন? ওকি জাতিস্মর? আমেরিকার কোন বিজ্ঞানী বা জ্ঞানী মানুষ কি মৃত্যুর পর রাজেশ হয়ে জন্মেছে? জাতিস্মররা জন্মেই অতীত জন্মের দোষ-গুণের অধিকারী হয় না, এ'সব দোষ-গুণ কোনও এক সময় স্ফুরিত হয়। রাজেশের ক্ষেত্রে কি এমনই কিছু ঘটেছে?

রাজেশ টিভি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, আমি গ্রামে জন্মেছি, গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া। এখন আমি হঠাৎ করে হিন্দিতে কথা বলতে ভুলে গেছি। ইংরেজি ছাড়া কথা বলতে পারি না।

টিভি চ্যানেল দুটির সাংবাদিকদের কথা মতো, রাজেশের বক্তব্য ইংরেজিতে হলেও এমন ইংরেজিতে কোনও ভারতীয়ের পক্ষে কথা বলা অসম্ভব। তার পাণ্ডিত্য সংশয়াতীত। হঠাৎ করে রাজেশ বিভিন্ন বিষয়ে বিশাল পণ্ডিত হয়ে উঠল কী করে?

সাংবাদিকরা এ'বিষয়ে জানতে রাজেশকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মনে করো যে তুমি একজন আমেরিকান, মৃত্যুর পর রাজেশ হয়ে জন্মেছ?

রাজেশের উত্তর—আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি, জন্মান্তরে বিশ্বাস করি না।

রাজেশের এই উত্তরে প্রমাণিত হয়, একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীই রাজেশ হয়ে জন্মেছেন। তাই জন্মের পরও জন্মান্তর তত্ত্বকে অস্বীকার করছেন। —এ কথা বললেন সাংবাদিকরা।

রাজেশকে নিয়ে ভারত জুড়ে একটা পাগলামো শুরু হল। আমার মোবাইলে আর ল্যান্ডলাইনে ঝাঁকে-ঝাঁকে ফোন পেয়েছি। Z-news দেখুন। IBN7 দেখুন। এ'বার কী বলবেন? রাজেশ যা করছে, যুক্তিতে তার কোনও ব্যাখ্যা আছে কি? আপনি গিয়ে রাজশকে পরীক্ষা করছেন না কেন? Z-news বা IBN7 এ বিষয়ে আপনাকে কেন ডাকেনি? আপনি কি news চ্যানেলের আমন্ত্রণ পেয়েও চুপ করে বসে আছেন? আপনি যদি রাজেশের ব্যাপারে চুপ থাকেন, তাহলে ধরে নেব আপনার বই বিক্রি বাড়াবার স্বার্থে, নাম কেনার ধান্ধায় 'জাতিস্মর নেই' বলে মিথ্যে প্রচার করে চলেছেন! চুপ করে বসে থাকবেন না, যুক্তিবাদের স্বার্থে কিছু করুন!

রাজেশের খবরটা আমাকে প্রথম দিয়েছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির সংযুক্ত সম্পাদক ও হিন্দি দৈনিক 'ছাপতে ছাপতে' কলমিস্ট সন্তোষ শর্মা। সন্তোষকে বললাম, "খেয়াল করে দেখ রাজেশ ভুল ইংরেজি ব্যাকরণে কথা বলছে কি না? ওকে যেসব প্রশ্ন করা হচ্ছে, সে'সবের ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছে কি না? তুই আগেই দেখবি-শুনবি, ওর ইংরেজি উচ্চারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছিস কি না। স্পষ্ট না বুঝলে মিডিয়ার প্রচারের চাপে তোর মনে হতেই পারে—রাজেশ দারুণ বলছে। ওই সব ফালতু চাপ নিবি না। মনে রাখবি, ওপর-চালাক সাংবাদিকের অভাব এদেশে নেই। ওপর-চালাক 'বোকা' সাংবাদিকদের মিথ্যে প্রচারে আদ্রার মৌসুমী চক্রবর্তী ১৯৮৯-এ ভারত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ৭ বছরের মৌসুমীর বিদ্যে-বুদ্ধি নাকি এম এস-সি লেভেলের। বহু ভাষা জানে। আর কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবে। 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার হয়ে গিয়ে দীর্ঘ সত্যানুসন্ধানে জানিয়েছিলাম, গোটাটাই বোকা বনে যাওয়া সাংবাদিকদের ভুল প্রচার। কিছু সাংবাদিক তাতে খুব চটে গিয়েছিলেন। সত্যি বলার ফ্যাসাদ অনেক (বিস্তৃত জানতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক ২য় খণ্ড পড়তে পারেন।)

"রাজেশের আমেরিকান ইংরেজি বলার গল্প শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। তখন আমার বয়স চার-পাঁচ। স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি। থাকতাম আদ্রার বড় পলাশখোলায়। বাবা রেলে চাকরি করতেন। বাবার আরদালি বা চাপরাশি গোপাদা থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছেই আদিবাসী পল্লীতে। আমি একবার বাবার কোনও একটি ইংরেজি বই হাতে নিয়ে ও পাড়ায় গিয়েছিলাম। বয়স্ক কয়েকজন জিজ্ঞেস করেছিলেন—ইটা কী বই বটেন? বলেছিলাম, ইংরেজি বই। ওঁদের কৌতূহল মেশান প্রশ্ন ছিল—পইড়তে পার?

"অস্পষ্ট হাউহাউ গলায় মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজি শব্দ বলে আবোল-তাবোল উচ্চারণ করে গিয়েছিলাম। তাতেই আদিবাসীরা বেজায় অবাক। রাজেশের 'হাউইটি' উচ্চারণে কথায় সাংবাদিকরা ওই ধরনের অবাক হচ্ছেন না তো? মৌসুমী এই ধরনের উচ্চারণে সাংবাদিকদের সামনে নানা ভাষায় গড়গড় করে বলে যেত। ওর প্রতারণায় মুগ্ধ সাংবাদিকের অভাব ছিল না। আরও একটু স্পষ্টভাষী হলে আমাকে বলতেই হবে, সাংবাদিকরা রাজেশের কথায় অবাক হচ্ছেন, কারণ : (১) ওঁরা হয়তো চেতনে বা অবচেতনে বিশ্বাস করেন—আত্মা অবিনশ্বর, কেউ কেউ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। (২) রাজেশের জড়ানো অস্পষ্ট উচ্চারণের বাধা ডিঙিয়ে ওঁরা হয়তো পরিপূর্ণ অর্থ উদ্ধার করতে পারছেন না।

"তুই দেখতে থাক। লক্ষ্য কর। প্রয়োজনে নোট নে। Z-news ও IBN7-এর ফোন নম্বর জোগাড় করে তোর চোখে যা যা ফাঁক-ফোকর ধরা পড়েছে, তা জানা। আমি এখন বাড়ির বাইরে। টিভি দেখার সুযোগ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরার চেষ্টা করছি। ফিরে দেখে তোকে ফোন করব।"

বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, জাতিস্মর রাজেশের নানা করিশ্মা। সে সব করিশ্মার কথা আগেই লিখেছি। Z-news-কে ফোন করলাম। জানালাম, আপনারা রাজেশের এমন কর্মকাণ্ডের পিছনে আন্তরিক ভাবে সত্য খুঁজে পেতে চাইলে এমন করুন : (১) আমেরিকান ইংলিশে অভ্যস্ত এমন কারও সাহায্য নিন। দিল্লিতে এমন লোক খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। তাঁর মতামত নিন—রাজেশ কি সত্যিই বিশুদ্ধ ইংরেজি বলছে? নাকি মানুষ ঠকাচ্ছে ভুল-ভাল বলে?

(২) বিজ্ঞানের প্রশ্ন সাংবাদিকদের কাছ থেকে আসাটা অভিপ্রেত নয়। কারণ বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের গভীর জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কোনও সাংবাদিক ওপর-চালাকি করে 'বুঝেছি' ভাল করলে 'মিথ্যে'টাই 'সত্যি' হয়ে যাবে। এতে আপনার চ্যানেলের বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ পর্যন্ত ধাক্কা খেতে বাধ্য। স্টুডিওতে বিজ্ঞানীকে হাজির করুন।

(৩) রাজেশের চরিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিন।

(৪) আমি এবং যুক্তিবাদী সমিতি নিশ্চিত যে এটা কোনও জন্মান্তরের ঘটনা নয়। যদি দেখেন আমার দেওয়া সাজেশনগুলো গ্রহণ করেও সত্য খুঁজে পাচ্ছেন না, বা রাজেশকে জাতিস্মর বলেই মনে হচ্ছে, তবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে তৈরি। নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি—প্রমাণ করে দেবই, রাজেশ হয় প্রতারক, নতুবা মানসিক রোগী। এমনও হতে পারে—রাজেশের মানসিক সুস্থতার অভাব আছে। দ্রুত নাম কেনার প্রবণতা আছে। রাজেশের বিষয়ে ডিটেলে খবর নিন। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থা, পরিবারের কেউ মানসিক রোগী কি না, নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির ঘাটতির জন্য কখনও জনসমক্ষে অপমানিত হয়েছিল কি না? রাজেশ যদি অনুশীলনের মাধ্যমে এমন উচ্চারণে কথা বলা অভ্যেস করে থাকে, তবে তাতে উচ্চারণের স্টাইলটা ঠিক হলেও গ্রামারে ভুল হবেই। রাজেশ কি অনুশীলনের জন্য স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ছিল কিছু মাসের জন্য? খবর নিন। এ'সব উত্তরের মধ্যেই সত্য লুকিয়ে আছে।

ফোন করেছি সাড়ে ১১টা নাগাদ। ১২টার মধ্যে Z-news রাজেশকে নিয়ে এল তাদের স্টুডিওতে। প্রশ্নকর্তা হিসেবে স্টুডিওতে আনা হয়েছে জ্যোতিষী-কাম-আধ্যাত্মবাদী, মনোরোগ চিকিৎসক, আমেরিকান ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞ ও একজন বিজ্ঞানীকে।

জ্যোতিষী-কাম-অধ্যাত্মবাদী গীতা থেকে জাতক কাহিনি টেনে এনে প্রমাণ করতে চাইল, রাজেশ খাঁটি জাতিস্মর। বাদ সাধলেন বাকি তিনজন। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রশ্নের দিতে গিয়ে রাজেশ বারবার হোঁচট খেতে লাগল। এতে বোধহয় হোঁচট খেলেন Z-news-এর সঞ্চালকও। তিনি রাজেশকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীর কথা শেষ করার আগেই নিজের কথায় চলে যাচ্ছিলেন।

সঞ্চালক দর্শকদের জানালেন, পদার্থবিদ্যা থেকে গণিত—সবেই রাজেশের জ্ঞান মাস্টার ডিগ্রির বেশি।

এমন কথা শুনে আলটপকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী। রাজেশকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন,

$6{\cdot}67 \times 10\ S_{cm} = ?\ 1{\cdot}6 \times 10^{-11} = ?$

রাজেশ একদম ভ্যাবলা।

ইতিমধ্যে আমেরিকান উচ্চারণে অভ্যস্ত ভদ্রলোক দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন—ও ইংরেজি বলতেই পারে না। মাথামুণ্ডু যা বলে যাচ্ছে, তা শুনলে মনে হচ্ছে হলিউডের কোনও চরিত্রের কণ্ঠস্বরের অক্ষম নকল শুনছি। এই বহিরঙ্গ ছেড়ে ভিতরে ঢুকলে দেখা যাচ্ছে ও শুদ্ধ ইংরেজিতে একটা বাক্যও বলতে পারে না।

মনোরোগ চিকিৎসক বললেন, ও নিজেকে যেভাবে প্রজেক্ট করতে চাইছে, যে ভাবে চ্যানেলও ওকে জাতিস্মর বলে প্রচার করতে চাইছে। এটা ঠিক হচ্ছে

না। রাজেশ একজন 'মানসিক রোগী' এমনটা ভাববার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। ওকে আরও বেশি করে মানসিক রোগী করার চেষ্টায় না মেতে আমাদের উচিত ওর ঠিকঠাক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

স্টুডিওতে টানা ৫ ঘণ্টা জেরার পর ভেঙে পড়ল রাজেশ। ওর কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। ২০০৫-এর ২৬ জানুয়ারি স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে ছাত্ররা মঞ্চে উঠে ভাষণ দিচ্ছিল। রাজেশ ভাষণ দেওয়ার সময় এক শিক্ষক তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। বলেন, "ইংরেজি বলা তোমার দ্বারা হবে না।" সবার সামনে এমন বলায় রাজেশের আত্মসম্মানে লাগে। বাড়িতে ফেরে খারাপ মেজাজ নিয়ে। বাবার সঙ্গে জোর ঝগড়া হয়। বাবা কী করেন এই নিয়ে প্রশ্নের সূত্র ধরে রাজেশ বলে, বাড়িতেই থাকেন। মানসিক রোগী। রাজেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুর্গেশ ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। ইংরেজিতে ভাল। রাজেশ দুর্গেশকে বলে, দু-চার মাসের মধ্যে ভাল ইংরেজি বলা শিখে তারপর স্কুল যাবে। এ ব্যাপারে দুর্গেশের সাহায্য চায়। দুর্গেশ জানায় দু-চার মাসে ভাল ইংরেজি শেখা অসম্ভব। তবে একটা কাজ করতে পারিস। কোনও একটা হলিউডের সিনেমা বারবার দেখে তাদের উচ্চারণভঙ্গি ও ডায়লগ বলে টিচারদের অবাক করে দিতে পারিস। হিন্দি টিচারদের সাধ্য হবে না, হলিউডি ইংরেজির মর্মোদ্ধার করা। কথাটা রাজেশের মনে ধরে।

তারপর তিন মাস স্বেচ্ছানির্বাসন পর্ব চলে রাজেশের। এই তিন মাসে 'টোটাল রিকল' নামের ফিল্মটি ১০০ বারের উপর দেখে। নির্বাসন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দি ছেড়ে হলিউডি ইংরেজিতে সবার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

এ'ভাবেই চলছিল। তারপর কে বিষয়টা নিয়ে টিভি চ্যানেলের দ্বারস্থ হয়। "তাদের জন্যেই আমি আজ স্টুডিওতে বসে।" আক্ষেপ করল রাজেশ।

"আমি ভেবেছিলাম, আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হাতের মুঠোয়। এখন দেখছি আমার বদনাম হয়ে গেছে। আমি আমার পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে চাই।"

Z-news-এর জন্মান্তর তত্ত্ব আর প্রচার করা হল না, আমাদেরই চেষ্টায়।

অধ্যায় : পাঁচ

জাতিস্মর কাহিনির দ্বিতীয় পর্যায়

এতক্ষণ বিভিন্ন জাতিস্মর কাহিনি বা 'কেস' নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এ'বার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার পালা। সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে যে'সব ঘটনার আলোচনায় যাব, যেগুলো গুরুত্বের দিক থেকেও দ্বিতীয় পর্যায়ের। গুরুত্বের মাপকাঠি ঠিক করল কে বা কারা? না, আমরা বিলকুল এ'সব ব্যাপারে নেই। তাত্ত্বিকভাবেই আমরা জানি, অতি স্পষ্টভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গেই জানি—'আত্মা'='চিন্তা' বা চিন্তার কারণ', যাই হোক না কেন তা অবশ্যই মরণশীল। এরপর মৃত্যুর পর আত্মার বেঁচে থাকা এবং জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের চোখে 'জাতিস্মর' ব্যাপারটা প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বহীন ও অবাস্তব।

তবু এর পরও জাতিস্মর-কাহিনি শুনলেই আমরা যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে বারবার ছুটে গেছি ঘটনাস্থলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে ফাঁক আর ফাঁকি আছে, এটা হাতে-কলমে প্রমাণ করতেই ছুটে গেছি। অধ্যাত্মবাদের 'প্রতারক' চরিত্রটিকে বে-আব্রু করতেই ছুটে গেছি। ফলও পেয়েছি। আমাদের লাগাতার ঐকান্তিক ও নিখুঁত চেষ্টার ফসল হিসেবে আজ বহু সাধারণ মানুষও এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—"যে যত বড় প্যারাসাইকোলজিস্ট সে তত বড় প্রতারক (ওই, 'যত বড় জ্যোতিষী তত বড় প্রতারক'-এর মত ব্যাপার আর কি।" "জাতিস্মর? তার মানে, ও হয় প্রতারক, নয় মানসিক রোগী।")

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচ্য জাতিস্মর কাহিনিগুলোর ক্ষেত্রে গুরুত্বের মাপকাঠির নির্ধারক প্যারাসাইকোলজিস্টরা।

আসুন এ'বার আমরা ঘটনায় ঢুকি।

জাতিস্মর তদন্ত ৯ : জ্ঞানতিলক

ঘটনাস্থল মধ্য শ্রীলংকার ছোট্ট গ্রাম হেদুনাউয়া। জল-জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশ। আর পাঁচটা বাড়ির মতই পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে তৈরি কুঁড়েতে থাকেন শ্রী ও শ্রীমতী বাডডিউথানা। শ্রীবাডডিউথানা পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। গ্রামেই একটা ছোট্ট দোকান ওঁর। শ্রীমতী ঘর সামলান।

১৯৫৬ সালে শ্রীমতী বাডডিউথানা জন্ম দিলেন একটি মেয়ের। মেয়েটি

জ্ঞানতিলক

আগাছার মতই বেড়ে উঠতে লাগল। বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। সব কিছু গোলমাল করে দিল ওর ছোট্ট মেয়েটি যার নাম, এখন জ্ঞানতিলক বা জ্ঞানতিলখা। হঠাৎই ও বলতে শুরু করল, আগের জন্মে ও জন্মেছিল তালাওকেল-এ। সে জন্মে ছিল ছেলে। বাড়িতে মা ছিল, বাবা ছিল, ভাই ছিল, বোন ছিল। মা রান্না করতেন। রান্না হত কাঠের আগুনে। গ্রামের আশে-পাশে ছিল প্রচুর সবুজ গাছ। ছোটবেলায় বোন আমাকে মেরেছিল। দিদি ভালোবাসত। দাদা আমাকে মেরেছিল। আমি স্কুলে যেতাম। স্কুলে মাস্টারমশাই পড়াতেন। মাস্টারমশাই আমাকে ভালোবাসতেন। ট্রেন দেখেছি। ট্রেনে করে রানি গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। মা শাড়ি পড়তেন। গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। বাবা কাজে যেতেন। আমি বাবার সঙ্গে দোকানে গেছি। বাবার সঙ্গে পোস্টঅফিসে গিয়েছি। সমুদ্র

দেখেছি। সমুদ্রের জল নীল। সমুদ্রের পাড়ে বালি থাকে, নারকেল গাছ থাকে। আমি ছবি আঁকতাম। আমার নীলরঙের পাজামা ছিল।

জ্ঞানতিলকের কথায় প্রথম প্রথম ওর মা তেমন মাথা ঘামাননি। কিন্তু তারপর এক সময় সন্দেহের দোলায় দুলেছেন—সত্যিই কি আমাদের জ্ঞানতিলক জাতিস্মর? সত্যিই কি ঈশ্বর জন্মান্তরের অস্তিত্ব কলিযুগে আবার প্রমাণ করতেই জ্ঞানতিলককে পাঠিয়েছেন? প্রমাণ সংগ্রহে কৌতূহলি মা জ্ঞানতিলকের বাবাকে সব কথা জানালেন। তারপর একদিন দু'জনে মেয়েকে নিয়ে গেলেন তালাওকেল-এ। সময়টা ১৯৬০ সাল। জ্ঞানতিলক তখন চার বছরের শিশু। তালাওকেল শহর ছোট্ট শহর। বা বলা যায়, আধা-শহর, আদ্ধা-গাঁ। বাসস্ট্যান্ড থেকে পোস্ট অফিসে যাওয়ার পথেই নাকি ছিল ওদের বাড়ি। তিনজনে প্রায় সারা দিন ঘুরেও বাড়ির হদিস না পেয়ে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে জ্ঞানতিলকের খবর তালাওকেল-এ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ওর মা-বাবা বাড়ির খোঁজ করতে, সম্ভাব্য পরিবারটির খোঁজ করতে অনেককেই বলেছেন তাঁদের অদ্ভুত সমস্যার কথা। মানুষ অদ্ভুত কিছুর প্রতি সাধারণত এক বাড়তি আকর্ষণ অনুভব করে। এ'ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তালাওকেলের অধিবাসীদের অনেকেই ভেবেছেন, ঠিক-ঠাক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে হয়তো দেখা যাবে জ্ঞানতিলক এক দুর্লভ জাতিস্মর, তালাওকেলের গর্ব। পরিবেশগতভাবে এদের অনেকেই এমনটা ভেবে থাকতেই পারেন—জ্ঞানতিলক জাতিস্মর প্রমাণিত হলে এও প্রমাণিত হবে জাতককাহিনি নেহাতই গল্পকথা নয়। হিন্দুরাও একই ভাবে মনে করতেই পারেন—জ্ঞানতিলকের কথার সত্যতা প্রমাণিত হলে, নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে আত্মার অবিনশ্বরতা তত্ত্ব।

যাই হোক, দাবানলের মতই গোটা শ্রীলংকাতেই জ্ঞানতিলকের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর কাগজে ছাপার অক্ষরে খবর প্রকাশের আগেই এই কাহিনি শুনলেন কলম্বোর বিদালনকারা কলেজের বৌদ্ধ-দর্শনের অধ্যাপক পিয়দাসী থেরা। শুনলেন ক্যান্ডি কলেজের অধ্যাপক এইচ. এস. নিশাংকা। জ্ঞানতিলকের মুখ থেকে সব কিছু শুনতে পিয়দাসী ও নিশাংকা গেলেন হেদুনাউয়াতে। সেখানে সব শুনলেন। 'নোট' করলেন। এ'বার জ্ঞানতিলকের বর্ণনা মত সত্যিই কেউ তালাওকেলে ছিল কি না—তার খোঁজ করার পালা। অনুসন্ধানে নেমে পড়লেন স্থানীয় শ্রীপদ স্কুলের অধ্যক্ষ অশোকা কৌতমাদেসা, শিক্ষক সুমিথাপালা ও অনিরুদ্ধ স্কুলের শিক্ষক তিলক সমরিংঘে।

ওঁরা খুঁজেও বের করলেন একজনকে। তিলকরত্ন। জ্ঞানতিলকের জন্মের আগে তিলকরত্ন মারা যায়। জ্ঞানতিলক তার পূর্বজীবন সম্পর্কে যা যা বলেছে তার সঙ্গে তিলকরত্নের জীবনের আশ্চর্য রকমের মিল খুঁজে পেলেন ওঁরা। আরো অনেকের সঙ্গেই খোঁজার চেষ্টা করলেই মিল পেতেন। কিন্তু পাকা মাথা তো...

এ'বার পিয়দাসী থেরা ও তাঁর অনুসন্ধান-সঙ্গীরা শ্রীলংকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন, তাঁরা পূর্বজন্মের একটি মহত্ত্বপূর্ণ সত্য ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন এবং বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মঞ্জুরী কমিশন ঘটনাটি জানাল শ্রীলংকার তৎকালীন গভর্নর জেনারেলকে। গভর্নর এই তদন্তের কাজে নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজতে গিয়ে জানতে পারলেন, হাতের কাছেই ভারতে রয়েছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনেক জাতিস্মর খুঁজে বের করার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

১৯৬১-র জুনে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন শ্রীলংকায়। কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান চালালেন। তাঁকে অনুসন্ধানে সাহায্য করলেন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ জয়তিলক। অনুসন্ধান শেষে তাঁরা নিশ্চিত হলেন, মেয়ে জ্ঞানতিলকই পূর্বজন্মে ছিল ছেলে তিলকরত্ন। তিলকরত্ন যে মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তার পূর্বাভাসও নাকি তিলকরত্নই দিয়ে গিয়েছিল। অনুসন্ধানকারীরা জেনেছিলেন, তিলকরত্ন দাদার চেয়ে দিদিকে বেশি ভালবাসত। দিদির সঙ্গে মিশতে বেশি পছন্দ করত। দিদির নেলপালিশ ব্যবহার করত। এ সবই নাকি ওর মেয়ে হয়ে জন্মাবার পূর্বাভাস। (অনেক ছেলেই ছোটবেলায় মা, মাসি, দিদির দেখাদেখি নেলপালিশ ব্যবহার করে, অনেক সময় মা, দিদি, পিসিরা আদরের ছোট ছেলেটিকে শাড়ি পরিয়ে মেয়ে সাজিয়েও মজা পায়। এমন কিছু ঘটলে সে পরবর্তী জন্মে মেয়ে হয়ে জন্মাবে এমন জেনে শিহরিত হচ্ছি! কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! আমি ঘোড়া সেজে ছেলেকে পিঠে নিয়ে অনেক হামাগুড়ি দিয়েছি! পরের জন্মে আমি ঘোড়া... শিহরিত হচ্ছি! বিখ্যাত হরবোলা ঘনশ্যাম পাইন কী হবেন? হাঁস, মুরগি, টিয়া, বাঘ, সাপ, হাতি, ঘোড়া, এত-কিছুর ডাক গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে ডাকেন...উনিও কি তবে রামকৃষ্ণের মত বহুভাগে বিভক্ত হয়ে এতগুলো জীব রূপে জন্মাবেন??)

অনুসন্ধানকারীরা জ্ঞানতিলককে ৬১টি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে ৪৬টি তিলকরত্নের জীবনের সঙ্গে একশভাগ মিলে গিয়েছিল। মিলে যাওয়া জ্ঞানতিলকের কথাগুলো এই রকমের :

১. আমার বাবা ছিল।
২. আমার মা ছিল।
৩. আমার ভাই ছিল।
৪. আমার বোন ছিল।
৫. মা রান্না করতেন।
৬. রান্না হতো কাঠের আগুনে। (ওখানে প্রায় সব বাড়িতেই কাঠের আগুনে রান্না হয়।)
৭. মা জ্বালানি কাঠ কিনতেন।
৮. গ্রামের আশে-পাশে প্রচুর গাছ ছিল।
৯. সবুজ গাছ।

১০. ছেলেবেলায় বোন আমাকে মেরেছিল।
১১. দিদি ভালোবাসত।
১২. দাদা আমাকে মেরেছিল।
১৩. আমি স্কুলে যেতাম।
১৪. স্কুলে মাস্টারমশাই পড়াতেন।
১৫. মাস্টারমশাই আমাকে ভালবাসতেন।
১৬. ট্রেন দেখেছি।
১৭. ট্রেনে করে রানি গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। (রানি এলিজাবেথের শ্রীলংকা ভ্রমণের কথা ও বলেছিল।)
১৮. মা শাড়ি পরতেন।
১৯. মায়ের গায়ের রঙ ফর্সা ছিল।
২০. বাবা কাজে যেতেন।
২১. বাবার সঙ্গে দোকানে গেছি।
২২. বাবার সঙ্গে পোস্টঅফিসে গিয়েছি।
২৩. সমুদ্র দেখেছি।
২৪. সমুদ্রের পাড়ে বালি থাকে।
২৫. সমুদ্রের পাড়ে নারকেলগাছ আছে।
২৬. আমি ছবি আঁকতাম। (সাধারণভাবে সব বাচ্চারই ছবি আঁকে।)
২৭. আমার নীল রঙের পাজামা ছিল। ইত্যাদি... ইত্যাদি...।

মধ্য শ্রীলংকায় যে শিশু বড় হচ্ছে, সে এ'ধরনের কথা বলতেই পারে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে, কিন্তু এই কথাগুলো কখনই একজনকে জাতিস্মর বলে চিহ্নিত করার পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। একজন শিশু কোনও কারণে নিজেকে জাতিস্মর বলে বিশ্বাস করতে পারে (সে বিশ্বাস সচেতন বা অবচেতন—যাই হোক না কেন।) সে এইধরনের তুচ্ছ ও অকিঞ্চিতকর কিছু কথা বলতেই পারে। এসব তুচ্ছ কথার অনেক কিছুই পূর্বজন্মের জীবনের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। একটি শিশুর তথাকথিত জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক : 'জন্মান্তর আছে', এই বিশ্বাস তার অবচেতন বা সচেতন মনে রয়েছে। শুনেছে একজনের জীবনের কিছু কথা ও তার মৃত্যুর খবর। নিজের অজান্তে নিজেকে মৃত মানুষটি ভাবতে শুরু করেছে। দুই : কোনও বিশেষ কারণে শিশুকে শেখানো হয়েছে—সে জাতিস্মর। পূর্বজন্মের নাম; ঠিকানা ও কিছু তথ্য তার মাথায় ঢোকান হয়েছে। তিন : এই ধরনের কোনও শিশুর খবর পেলে তাঁকে নির্ভেজাল জাতিস্মর প্রমাণ করতে এগিয়ে আসে বিক্রি বাড়াতে চাওয়া প্রচার-মাধ্যম, জন্মান্তরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া প্যারাসাইকোলজিস্ট-ধর্মগুরু ইত্যাদিরা। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে রাষ্ট্রশক্তি। কারণ রাষ্ট্রশক্তি জানে, 'এ জন্মের বঞ্চনা পূর্বজন্মেরই কর্মফল' এই তত্ত্ব মানুষের মাথায়

গেঁথে দিতেই জাতিস্মরের অস্তিত্ব মাঝে-মধ্যে 'প্রমাণিত' হওয়া প্রয়োজন।

জ্ঞানতিলকের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে 'তিন' নম্বর কারণটি অবশ্যই ছিল। সঙ্গে ছিল 'এক' অথবা 'দুই' নম্বর কারণ। জ্ঞানতিলক ছোটবেলা থেকেই শুনেছে বুদ্ধের জাতক কাহিনি, যার ফলে পূর্বজন্মে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্ঞানতিলক সমুদ্র দেখেনি। অথচ সমুদ্রের জলের রঙের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে, সমুদ্রের পাড়ে যে নারকেলগাছ থাকে তাও ত বলতে পেরেছে। সমুদ্রকূলে বালির বর্ণনাও সঠিক দিয়েছে। এ'সবই বলতে পেরেছে পূর্বজন্মের তিলকরত্নের সমুদ্র দেখার স্মৃতি উদ্ধার করে।

সমুদ্র না দেখে কি সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়া যায় না? নিউইয়র্ক না দেখতে কি নিউইয়র্কের বিশাল উঁচু উঁচু বাড়ির বর্ণনা করা অসম্ভব? রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি না দেখলেও কি তাঁর চেহারা আমাদের অপরিচিত?

একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, ঘোড়া, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ট্রেন—এইসব নানা ধরনের জিনিসের ছবি দেখিয়ে দেখবেন, আপনার বয়স্ক চোখের চেয়েও ওদের চোখ অনেক বেশি ডিটেল্‌স্‌-এর দিকে নজর রাখে। ছোটদের ছবি আঁকতে একগাদা রঙের মাঝখানে বসিয়ে দিন, দেখবেন, অনেক সময় ওদের ডিটেল্‌সের কাজ আপনাকে অবাক করে দেবে। একটা ছোট শিশুকে নদী, পাহাড়, সমুদ্রের রঙিন ছবি দেখাবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, সে প্রত্যেকটারই সঠিক বর্ণনা দেবে। জ্ঞানতিলক কোনও দিনই কোনও সমুদ্রের ছবি দেখেনি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানতিলকের আঁকা একটা ছবি দেখে প্যারাসাইকোলজিস্টরা নাকি বেবাক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটা রাস্তা, একটা ব্রিজ, একটা বাড়ি, বাড়িতে ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত। এই ছবির মধ্যে ওঁরা খুঁজে পেলেন তিলকরত্নের স্কুলকে। স্কুলের বারান্দায় উঠতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। স্কুলের কাছেই রয়েছে একটি ব্রিজ। আরও একটি বিস্ময়কর তথ্য কী জানেন? নদী-পাহাড়ের দেশ শ্রীলংকায় এমন ব্রিজের ছড়াছড়ি। জ্ঞানতিলকের জ্ঞানে স্থানীয় ব্রিজের ব্যাপক উপস্থিতি অধরা ছিল না। তাই ছবিতে ব্রিজ এসেছে—এটা ওর জাতিস্মরতার পক্ষে প্রমাণ হলো কোথায়? বাড়ি আঁকতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, প্রায় শিশুদের ছবিতেই এর দেখা পাবেন। না জোর করে আমার যুক্তিকে খাড়া করতে এ'কথা বলছি না, ছোটদের বসে আঁকো ধরনের অনেক প্রতিযোগিতাতেই অনেক সময় হাজির থাকতে হয়েছে একটু আধটু ছবি-আঁকি বলে। সেখান থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সূত্রেই এ'কথা বলা। বাড়িতে সিঁড়ির ধাপ দেখে সেটাকে ধরে নেওয়া হল এগুলো স্কুলের সিঁড়ির ধাপ এঁকেছে, অতএব এ জাতিস্মর। সিঁড়ির ধাপ না এঁকে বাড়ির পাশে গরু, কুকুর, বেড়াল, কাক, এমন কি সূর্য আঁকলেও ওই ধরনের ছেঁদো যুক্তি খাড়া করে বলাই যেত— এটা একেবারে একশভাগ তিলকরত্ন স্কুল। কারণ ওর স্কুলের সামনে গরু দেখা যেত। একইভাবে স্কুলের কাছে কুকুর, বেড়াল, কাক কিংবা

সূর্যের ছবির উপস্থিতিও প্রমাণ করে ছাড়াত—ছবিটা স্কুলেরই।

এবার আসুন আমরা দু'একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে রাখি।

জ্ঞানতিলকের গ্রাম হেদুয়াউনা থেকে তিলকরত্নের ছোট্ট শহর তালাওকেলের দূরত্ব মাত্র ১৬ কিলোমিটার।

অনুসন্ধানকারীরা তাঁদের রিপোর্টে জানিয়েছেন, তিলকরত্নের মৃত্যু ৯ নভেম্বর ১৯৫৪। তাঁদের উল্লিখিত ডেথ সার্টিফিকেট অনুসারে—মৃতের পুরো নাম জানা যায়নি। সংক্ষিপ্ত নাম, জি. তিলকরত্ন। নিবাস আবানায়েক। বাবা-মা'র নাম জানা যায়নি। বয়স ১৬ বছর।

অথচ জ্ঞানতিলক বলেছিল, সে থাকত তালাওকেলে (আবানায়েকে নয়)। তালাওকেলের যে তিলকরত্ন শ্রীপদ স্কুলে পড়ত, এবং যাকে বর্তমান জন্মের জ্ঞানতিলক বলে অনুসন্ধানকারীরা চিহ্নিত করেছিলেন, সেই তিলকরত্নর নাম তুরিন তিলকরত্ন। অর্থাৎ সংক্ষেপে টি. তিলকরত্ন, জি. তিলকরত্ন নয়। জি. তিলকরত্নের মৃত্যু ১৬ বছর বয়সে, এবং তুরিন তিলকরত্নের মৃত্যু ১৩ বছর ৯ মাস বয়সে। জি. তিলকরত্নের মৃত্যু জ্ঞানতিলকের জন্মের বছর দু'য়েক আগে হলেও তালাওকেলের তুরিন তিলকরত্ন মারা যায় জ্ঞানতিলকের জন্মের মাত্র পাঁচ মাস আগে।

জ্ঞানতিলকের মা শ্রীমতী বাউডিউথানা স্বাভাবিকভাবেই দশমাস গর্ভ ধারণের পরই জ্ঞানতিলককে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন। মাতৃগর্ভে জ্ঞানতিলকের যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল তিলকরত্নের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস আগে, সেখানে তিলকরত্নের আত্মার শ্রীমতী বাডডিউথানার গর্ভে প্রবেশের প্রসঙ্গই আসতে পারে না।

এই একটি কারণে, শুধুমাত্র এই একটি কারণেই জ্ঞানতিলকের জাতিস্মর হয়ে ওঠার তত্ত্বকে বাতিল করা যায়।

জাতিস্মর তদন্ত ১০ : প্রদীপ

প্রদীপের জন্ম ১৯৮৩-তে। এরই মধ্যে বিভিন্ন হিন্দি পত্র-পত্রিকার কল্যাণে প্রদীপ জাতিস্মর হিসেবে যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। প্রদীপের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার সীতামাই গ্রামে। গ্রামের প্রায় সকলেই গরিব ভূমিহীন কৃষক।

প্রদীপরাও এর বাইরে নয়, প্রদীপের বাড়ি বলতে মাটির চার দেওয়ালের ওপর খড়ের চাল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায়, প্রদীপ হঠাৎই একদিন বলতে শুরু করল, ওর গত জন্মের নাম ছিল কুল্লো লালা। থাকত মেদু গ্রামে। ব্যবসা করত। যথেষ্ট ধনী ছিল।

প্রদীপের কথায় কেউই মাথা ঘামায়নি। বাচ্চা ছেলের খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মেদু সীতামাই থেকে বারো কিলোমিটার দূরে। মেদুর এক ফলওয়ালা ফেরি করে ফল বিক্রি করত। সীতামাইতেও যেত ফলের পসরা নিয়ে। সেখানে প্রদীপের মুখে কুল্লো লালা ও মেদু গ্রামের কথা শুনে চমকে উঠল। সত্যিই তো

মেদু গ্রামে কুল্লো লালা ছিলেন। '৮০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চম্বলের ডাকাতদের গুলিতে মারা গেছেন। কতই বা বয়স তখন কুল্লোর? বছর বত্রিশ।

ফলওয়ালা প্রদীপের কথা জানাল কুল্লোর দাদা মুন্না লালাকে। মুন্নাও ধনী ব্যবসায়ী। নিজের ধান্দাতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রদীপের কথা কানে গেল কুল্লোর স্ত্রী সুধা ও দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশের। প্রধানত সুধা, রবি ও প্রকাশের আগ্রহে মুন্না লালা একদিন ফলওয়ালার সঙ্গে সীতামাই গেলেন। প্রদীপের সঙ্গে দেখা করতেই বিস্মিত হলেন। প্রদীপ মুন্নাকে চিনতে পেরেছিল কুল্লোর দাদা বলে। মুন্না প্রদীপকে মেদুতে নিয়ে এলেন।

মেদুতে এসে আরও অনেক চমক দেখাল প্রদীপ। চিনতে পারল স্ত্রী সুধাকে, দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশকে। কুল্লো লালা ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর পরিচিতেরা অনেকেই এমন এক বিস্ময়কর ঘটনাকে নিজের চোখে দেখতে ছুটে এলেন। প্রদীপ প্রত্যেককে চিনতে পারল। প্রত্যেকে ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক। প্রদীপ একটা তাক থেকে কিছু টাকা বের করল। যে টাকা, মৃত্যুর আগে কুল্লো রেখেছিল। এই টাকার হদিস কুল্লো ও সুধা ছাড়া আর কারোরই জানা ছিল না।

পত্র-পত্রিকায় এই জাতীয় প্রতিবেদন পড়ার পর সাধারণ মানুষ মাত্রেই ধরে নিয়েছিলেন আত্মা যে অমর, পুনর্জন্ম আছে, তারই অব্যর্থ প্রমাণ এই প্রদীপ। প্রদীপের জাতিস্মর রহস্যের উন্মোচন করা ছিল যুক্তিবাদীদের কাছে চ্যালেঞ্জ। যুক্তিবাদী এডামারুকু তথ্যানুসন্ধানে হাজির হলেন মেদু গ্রামে। মুন্না লালা তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলো সত্যি নয়। সম্ভবত রং-চঙে গল্প ফেঁদে পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য ওইসব লিখেছে। নতুবা এমন সব মিথ্যে লেখার কারণ কী থাকতে পারে?

মুন্নার কথায় আসল ঘটনা হল, এক ফলবিক্রেতা প্রায় দিনই এসে ঘ্যান ঘ্যান করত—সীতামাই গ্রামে নাকি কুল্লো আবার জন্ম নিয়েছে প্রদীপ নামে। ও নাকি হলফ করে বলতে পারে প্রদীপই কুল্লো। ফলবিক্রেতার কথায় একটুও বিশ্বাস করিনি, একটুও আমল দেইনি। তবু দিনের পর দিন ও এসেছে। একই কথা বলে গেছে। শেষ পর্যন্ত কুল্লোর স্ত্রী ও ছেলেদের কথায় প্রদীপকে দেখতে গেছি, সঙ্গী হয়েছিল ওই ফলবিক্রেতা।

প্রদীপের বাড়ি গিয়ে ওই ফলবিক্রেতা আমাকে দেখিয়ে বলেছিল আমি কুল্লোর বড় ভাই মুন্না, আমাকে প্রদীপ চিনতে পারছে কি না?

প্রদীপ বলেছিল, চিনতে পারছে। তারপরই এক দৌড়ে খেলতে চলে গিয়েছিল।

প্রশ্ন—প্রদীপকে আপনি মেদুতে নিয়ে আসার পর আপনার কি মনে হয়েছিল ও কুল্লো?

উত্তর—না মশাই, আমি প্রদীপকে আদৌ নিয়ে আসিনি, আমি সীতামাই থেকে ফিরে আসার পর হঠাৎই একদিন প্রদীপকে নিয়ে ওর মা-বাবা ও সেই ফলবিক্রেতা এসে হাজির। সেই সময় ও অবশ্য আমাকে চিনতে পেরেছিল।

প্রশ্ন—ওর পূর্বজন্মের স্ত্রীকে চিনতে পেরেছিল?

উত্তর—না। প্রদীপের বাবা প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো তোমার আগের জন্মের বউয়ের নাম কী?

উত্তরে প্রদীপ জানিয়েছিল—সুধা। ওর মুখে 'সুধা' নামটা শুনে আমাদের পরিবারের সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য মনে হয়েছে—প্রদীপকে হয়তো শেখানো হয়েছিল ওর আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা। কাছাকাছি গ্রাম। সুতরাং এ-সব বাড়ির খবর কারও জানার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই জেনে নিতে পারে।

মুন্না জানিয়েছেন প্রদীপের তাক থেকে টাকা বের করার কথাটা একেবারেই গপ্পোকথা।

মুন্না আরও জানালেন, পত্র-পত্রিকায় যেভাবে লেখা হয়েছে প্রদীপ কুল্লোর ছেলেদের ও পরিচিতজনদের চিনতে পেরেছিল, ব্যাপারটা ঠিক তেমনভাবে ঘটেনি। কুল্লোর পরিচিতজনেরা ও দুই ছেলে প্রদীপকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অনেকেই প্রশ্ন করেছিল—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রদীপ এক সময় উত্তর দিয়েছিল—তোমাদের প্রত্যেককে আমি চিনতে পারছি।

সুধা জানিয়েছিলেন, প্রদীপ তাঁকে সুধা বলে চিনতে পেরেছিল—কথাটা ঠিক নয়। প্রদীপ জানিয়েছিল তার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা।

প্রশ্ন—আপনি কি প্রদীপকে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন?

উত্তর—হ্যাঁ, বিয়ের রাতে আমার স্বামী আমাকে যে আংটিটা দিয়েছিলেন, সেটা দেখিয়ে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো এটা কবে আমাকে দিয়েছিলে?

প্রশ্ন—কী উত্তর দিল?

উত্তর—আমার আংটিটা দেখে কোনও উত্তর না দিয়ে বলল—পরে বলব। কিন্তু আর বলেনি।

রবিকান্ত ও প্রকাশ জানালেন—তাঁদের দুজনকে প্রদীপ চিনতে পারেনি। কুল্লোর দুই ছেলের নাম বলেছে। এ তো সামান্য চেষ্টাতেই আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব। প্রদীপ আগের জন্মে বাবা ছিল, এমনটা মেনে নিতে দু'জনেরই ঘোরতর আপত্তি আছে।

প্রতিবেদন সীতামাই গ্রামে প্রদীপের বাড়ি হাজির হয়েছিলেন মিথ্যে পরিচয়ে—কুল্লো লালার আত্মীয়।

প্রদীপকে যখন প্রশ্ন করা হল, "তোমার আগের জন্মের নাম কী ছিল?"

"কুল্লো লালা, তাই নয়?" বলে প্রদীপ ওর মায়ের দিকে তাকাল।

"তোমার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম কী ছিল?"

"সুধা বলো সুধা।" মা ও বাবা প্রদীপকে উত্তর যুগিয়ে দিলেন। প্রদীপ বলল, "হ্যাঁ সুধা।"

"যখন তুমি কুল্লো ছিলে তখন কোন্ কলেজে পড়তে মনে আছে? মথুরা

কলেজ, না আলিগড় কলেজে?'

প্রদীপ মায়ের দিকে তাকাল।

প্রতিবেদকের আবার প্রশ্ন—"তুমি আলিগড় কলেজে পড়তে মনে পড়ছে না?"

প্রদীপ উত্তর দিল, "হ্যাঁ মনে পড়েছে। আলিগড় কলেজে পড়তাম।"

বাস্তবে কুল্লো ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন।

ফেরার সময় প্রতিবেদক ১৯৮৭ সালের মডেলের মারুতিতে উঠতে উঠতে প্রদীপকে বলেছিলেন, "মনে পড়ছে, এই গাড়িটা তুমি আগের জন্মে নিজেই চালাতে?"

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

বুঝুন? '৮৭ সালের মডেল '৮০ সালে মৃত কুল্লো চালাতেন?

লালা পরিবারের প্রত্যেকেরই সন্দেহ প্রদীপকে কুল্লো বলে চালাবার পেছনে প্রদীপের পরিবার ও ফলবিক্রেতার গভীর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। সম্ভবত ধনী লালা পরিবারের ধনের লোভেই প্রদীপকে কুল্লো সাজাতে চাইছে ওরা।

জাতিস্মর তদন্ত ১১ : ত্রিশের দশকে কলকাতায় জাতিস্মর

গত শতকের তিনের দশকে কলকাতায় একটি বাঙালি মেয়েকে নিয়ে দস্তুরমত হইচই পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি নাকি জাতিস্মর। পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হল। মেয়েটি জানিয়েছিল, পূর্বজন্মে সে কলকাতা থেকে বহুদূরে একটি অখ্যাত, অজ পল্লীগ্রামে থাকত। মৃত্যু হয়েছিল জলে ডুবে। মেয়েটি তার পূর্বজন্মের নাম, বাবার নাম, ও গ্রামের নাম জানিয়েছিল। জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটির একটা মোটামুটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিল। মেয়েটির বাবা-মা স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, তারা কেউই কোনও দিনই ওই গ্রামে যাননি। এমনকী ওই গ্রামের নাম পর্যন্ত শোনেননি। না, মেয়েটি তাঁর পূর্বজন্মের বাবার যে নাম বলেছে তাঁর সঙ্গে কোনও রকমন পরিচয় বা-যোগাযোগ মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! ওইটুকু মেয়ে কীভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে?

সত্য যাচাই করতে কলকাতা থেকে এক উৎসাহী সাংবাদিক গেলেন গ্রামটির সন্ধানে। আরও অনেক বিস্ময় সাংবাদিকটির জন্য অপেক্ষা করছিল। সত্যিই ওই নামের একটি গ্রাম খুঁজে পেলেন। জানতে পারলেন, মেয়েটি পূর্বজন্মের যে নামটি জানিয়েছিল সেই নামের একটি লোক ওই গ্রামেই থাকত এবং পনেরো বছর আগে মারা যায় জলে ডুবেই। মৃতের বাবার নামও—মেয়েটি যা বলেছিল তাই।

মেয়েটির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কেন ঘটল? যতদূর জানা যায় তাতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাংবাদিকরা একথা বলতেই পারেন, বালিকাটির পক্ষে মৃত মানুষটির বিষয়ে এত কিছু জানার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল না। আর ঘটনাটি এমন টাট্‌কা নয় যে, পত্রিকায় মৃত্যুর খবরটা পড়েছিল।

মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ চিকিৎসকরা জন্মান্তরকে অস্বীকার করার তাগিদে অবশ্য জোর করে একটা তথ্য হাজির করার চেষ্টা করতে পারেন—মেয়েটি জলে ডোবা মানুষটির বিষয়ে শুনেছিল এবং দুর্ঘটনার খবরটি তাকে আকর্ষণ করেছিল, ফলে মেয়েটির চিন্তায় ওই মৃত মানুষটি বার বার হানা দিত। বালিকার কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ মনে স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম থাকার দরুন কল্পনাবিলাসী মন এক সময় ভাবতে শুরু করে আমিই সেই মৃত মানুষটি। এই ভাবনাই কোনও এক সময় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। মনোবিজ্ঞানীদের এমন ব্যাখ্যার পেছনে জানার সুযোগ চাই। এক্ষেত্রে সে সুযোগ তো অনুপস্থিত। অতএব?

এই 'অতএব'-এর রহস্য সন্ধানের জন্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু-কে অনুরোধ করে একটি সংবাদপত্র। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতের মনোরোগ চিকিৎসা এবং মনোসমীক্ষণের অন্যতম পথিকৃৎ। ডাঃ বসু ঘটনাটির কারণ বিশ্লেষণের জন্য বালিকাটিকে পরপর ক'দিন পরীক্ষা ও মনোসমীক্ষা করেন।

একদিনের ঘটনা। ডাঃ বসু মেয়েটির বৈঠকখানায় বসে আছেন। হঠাৎই চোখে পড়ল ঐ ঘরের আলমারিতে কতকগুলো পুরনো বাঁধানো সাময়িকী ও পত্রিকার ওপর। আলমারি খোলা। সময় কাটাতে, নিছকই খেয়ালের বশে বাঁধানো সাময়িকীগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, পাতা উলটোতে লাগলেন। একটা সাময়িকীর একটা পৃষ্ঠায় এসে ডাঃ বসু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঐ পৃষ্ঠাটিতে জনৈক গ্রামীণ সংবাদদাতা একটি জলে ডোবার ঘটনা জানিয়েছেন। গ্রামের নাম, মৃতের নাম ও তার বাবার নাম ও বিস্তৃত ঘটনাটি পাঠ করতে করতে ডাঃ বসুর চক্ষুস্থির। মেয়েটি এতদিন এই ঘটনার কথা আর এসব নামই বলছিল। সাময়িকীটি পনেরো বছরের পুরনো। মেয়েটি যে ডাঃ বসুর মতোই কোনও এক অবসর সময়ে বাঁধানো বইগুলো টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে এই ঘটনাও পড়ে ফেলেছিল এতে আরও কোনও সন্দেহ নেই। তারপর ঐ ঘটনাটি নিয়ে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনে সেই জলে ডোবা মানুষটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিল।

ডাঃ বসু মেয়েটিকে ওই পৃষ্ঠাটি দেখানোর পর মেয়েটির স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। ও জানায় লেখাটি আগে পড়েছিল। তবে লেখাটি পড়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। মনে ছিল শুধু ঘটনাটি। তাই এতদিন অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভুল বলেছিল—জলে ডোবার ঘটনাটি জানে না। মেয়েটি ডাঃ বসুর আকস্মিকভাবে পাওয়া যোগসূত্রের কল্যাণে 'জাতিস্মর' নামক মানসিক রোগী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়।

তবে স্বভাবতই সব সময় এমন আকস্মিক যোগাযোগ অনুসন্ধানীদের নাও জুটতে পারে। এই না জোটার অর্থ এই নয় যে, জাতিস্মরের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব।

অধ্যায় : ছয়

অবতারদের পুনর্জন্ম

এই তৃতীয় পর্যায়ে আমরা আলোচনায় নিয়ে আসবো আক্ষরিক অর্থে আন্তর্জাতিক পরিচিতির অধিকারী ধর্মগুরুদের ঘিরে গিয়ে ওঠা জাতিস্মর কাহিনিকে। এঁরা হলেন—সত্য সাঁইবাবা, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দলাই লামা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দ।

সত্য সাঁই ও দলাই লামা নিজেদের জাতিস্মর বলে দাবি করেন, এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। রামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবিতকালেই স্পষ্ট করে বলে গিয়েছিলেন, সপার্যদ তিনি আবার জন্ম নেবেন এই বাংলার বুকেই। জন্ম নেবার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত। রামকৃষ্ণদেবের কথা সত্যি হলে ওঁরা তিনজন তো বটেই, আরও অনেকেই এখন এই বঙ্গেই বেঁচে-বর্তে রয়েছেন। পূর্বজন্মে রামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, এমন দাবি করার মানুষও মিলেছে। এইসব রোমাঞ্চকর জাতিস্মর কাহিনি নিয়েই আমরা আলোচনা করব তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে।

জাতিস্মর তদন্ত ১২ : সত্য সাঁইবাবা

বাঙ্গালোরের কাছে ছোট্ট গ্রাম পুট্টাপরথি। এই গ্রামেই জন্মেছে সত্যনারায়ণ রাজু। জন্মের সাল ১৯২৬। তারিখ, ২৩ নভেম্বর। ছোট্ট রাজুর ছোটবেলা থেকেই ম্যাজিকের প্রতি বাড়তি টান। দিন কাটছিল, সময় গড়াচ্ছিল। শিশু রাজু কিশোর হলো। কিশোর রাজুর যখন বয়স চোদ্দো বছর, তখন একদিন গ্রামবাসীদের সামনে শূন্য হাতে মুহূর্তে নিয়ে আসছিল ফুল অথবা মিষ্টি। কিন্তু বিষয়টা সেদিন নেহাত আর জাদুর কৌশল রইল না। কারণ রাজু ঘোষণা করেছিল, এমনটা যদিও অনেক জাদুকরই করে দেখায় কিন্তু তার এই শূন্য থেকে সৃষ্টি কোনও জাদু নয়, নির্ভেজাল অলৌকিক ঘটনা। রাজু এও জানাল, ও এই অলৌকিক ক্ষমতা হঠাৎ করে অর্জন করেনি। গত জন্মেও ওর এইসব অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। গত জন্মে ও ছিল 'সির্দির সাঁইবাবা'।

সির্দির সাঁইয়ের জন্ম সির্দিতে নয়। তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদ স্টেটের মধ্যবিত্ত এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। জন্ম ১৮৫৬ সালে। ছোটবেলাতেই সাঁই ঘর ছাড়েন

এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে সির্দিতে আসেন ১৮৭২ সালে। ১৯১৮-তে যখন মারা যান, তখনও পর্যন্ত তিনি সির্দিতেই ছিলেন। প্রধানত দক্ষিণ ভারতে তাঁর অনেক ভক্ত ছিলেন ও আছেন, যাঁরা মনে করেন সির্দির সাঁই ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নাকি ছিলেন এক কল্পতরু মানুষ। তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা নিয়ে যেত সবই পূর্ণ হত। কেউ কোনও দিন বিফল হয়ে ফেরেননি। (তাত্ত্বিকভাবেই এমনটা সম্ভব নয়, যদিও আমাদের এই তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারতের বহু মানুষ আজও বহু জীবিত ও মৃত তথাকথিত অবতারের এমন কল্পতরু হওয়ায় শক্তিতে বিশ্বাস করেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা একবার ভাবুন তো, কোনও মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষ একই সঙ্গে সির্দির সাঁইয়ের মত কল্পতরু ক্ষমতার অধিকারীর কাছে মামলায় জয়ী হওয়ার প্রার্থনা করলে দু'জনের প্রার্থনা একই সঙ্গে তিনি পূরণ করবেন কী করে? তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব নয়। যখন নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটি মাত্র দলই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, একাধিক দল নয়; তখন একাধিক দলের প্রার্থনা তাত্ত্বিকভাবেই পূর্ণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে না কোনও কল্পতরু অবতারেরই।)

এখনও সির্দির সাঁইয়ের ভক্তরা বিশ্বাস করেন—সাঁইয়ের করুণায় যে কোনও রোগী নীরোগ হতে পারে, অন্ধ ফিরে পায় দৃষ্টি, বোবা বলে কথা, নিঃসন্তান লাভ করে সন্তান। একই সঙ্গে বহু জায়গায় নিজের শরীর নিয়ে হাজির হতেন ভক্তদের আহ্বানে।

যাই হোক, রাজু নিজেকে পূর্বজন্মে সির্দির সাঁই বলেই শুধু ঘোষণা করল না, সির্দির সাঁইয়ের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের নামও বলে দিল। (এমন বলতে পারাটা জাতিস্মরতার প্রমাণ হলে মহা বিপদ! যে কেউ যখন তখন আকবর কি কার্ল মার্কসের ঘনিষ্ঠ দু-চারজনের নাম বলে দিলে আমরা তাদের আকবর কি মার্কস বলে ধরে নিলে কী হবে, একবার ভাবুন তো!)

যাই হোক, ভক্ত 'পাবলিক' সির্দির সাঁইয়ের ওই সব অদ্ভুতুড়ে ক্ষমতাতেই শুধু বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা রাজুকেই সির্দির সাঁই বলে ধরে নিলেন। এবং ধরে নিলেন সির্দির সাঁইয়ের যে সব অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, সে সবই রাজুর মধ্যেও আছে। রাজুর নতুন নাম হলো 'সত্য সাঁই' (কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন'-এর মত ব্যাপার আর কি!)

আমাদের বাংলার তথা ভারতের গর্ব (!) ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সত্য সাঁইকে জাতিস্মর বলে মেনে নিয়েছিলেন। অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ঘোষণা করেছিলেন, 'সত্য সাঁই-ই আগের জন্মে ছিলেন 'সির্দির সাঁই। কী সেইসব পরীক্ষা? সত্যি সে বড়ই কঠিন পরীক্ষা। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, সত্য সাঁইও সির্দির সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর যোগ্য উত্তরাধিকারী কি না? তারপর পরীক্ষা অন্তে জ্ঞানতাপস ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কি মত পোষণ করেছিলেন, তা জ[illegible]সুন

সাঁইবাবা

আমরা 'জন্মান্তরবাদ ঃ...' বইয়ের ২০২ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে চোখ বোলাই।

"প্রতি দিন হাজার হাজার ভক্ত তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয় বহু দাবী ও বাসনা নিয়ে; তিনি তাদের সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন, অন্ধকে চক্ষুদান করেন, সন্তানহীনাকে সন্তান, স্বল্পায়ুকে দীর্ঘ জীবন দেন।"

গ্রন্থে এ'কথাও বলা হয়েছে, সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতাগুলো সত্যিই আছে কি না, এ'জানার জন্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা দরকার এবং তার পরেই কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যেতে পারে। সত্য সাঁইয়ের ক্ষেত্রে পরামনোবিজ্ঞানীকে সিদ্ধান্তের জন্য বিভিন্ন ঘটনা, জনশ্রুতি, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের

সত্য সাঁই সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিচার করে দেখতে হয়।

প্রশ্নটা এখানেই! কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করবেন? যিনি নির্বাচন করবেন তিনি যদি নিজেকে বার বার 'বিশ্বাস-অযোগ্য' বলে প্রমাণ করেন, তবে?

যাই হোক, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক প্যারাসাইকোলজিস্টই সত্য সাঁইকে পূর্বজন্মের সির্দির সাঁই বলে ঘোষণা করেছিলেন। এমন ঘোষণার পিছনে প্রধান যুক্তি ছিল—সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতা।

কিন্তু মুশকিল কি জানেন? সত্য সাঁইয়ের জীবন বাঁচাতে কয়েক শত বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক-দেহরক্ষী এবং জেড্ ক্যাটাগরির কমান্ডোকে নিজের চোখে তৎপর দেখার পর সাধারণভাবেই সাধারণ ভাত-রুটি খাওয়া মানুষের মাথায় যে প্রশ্ন উঠে আসে, তা হলো—যিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তকে রক্ষা করছেন, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম?

যাই হোক, প্যারাসাইকোলজিস্টদের দাবি ও সত্য সাঁইয়ের ক্ষমতা খোলা মনে দেখতে একটি খোলা চিঠি সত্য সাঁইয়ের কাছে পেশ করছি। 'সর্বত্রগামী' 'সর্বদ্রষ্টা', 'সর্বভাষাবিদ্' সত্য সাঁই বাবা বাস্তবিকই এই বিশেষণগুলির যোগ্য হলে খোলা চিঠির মর্ম উপলব্ধি করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসবেন।

ভগবান শ্রীসত্যসাঁইবাবা
প্রশান্তিনিলায়ম
পুট্টাপরথি
জেলা—অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারি, ১৯৯৩

প্রিয় সত্য সাঁইবাবা,

ভক্ত ও শিষ্য সংখ্যার বিচারে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়তম জীবন্ত ধর্মগুরু, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে অনেক কিছুই পড়েছি এবং আপনার কিছু ভক্তের কাছে আপনার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছি। শুনেছি আপনি অন্ধকে চক্ষুদান করেন, সন্তানহীনাকে সন্তান দান। এবং এ'সবই করেন অলৌকিক ক্ষমতায়। এও শুনেছি এবং পড়েছি, আপনি সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন।

আমার একটি তীব্র ইচ্ছে রয়েছে। আপনার কাছে ইচ্ছে পূরণের আবেদন রাখছি। আশা রাখি আপনার ভক্তদের কথা ও লেখাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে আমার ইচ্ছে পূরণ করবেন।

আমার ইচ্ছে : আমার চিহ্নিত পাঁচটি অন্ধের যে কোনও একজনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন আপনার অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। আপনি এই খোলা চিঠির প্রার্থনা মঞ্জুর করে চিঠির তলায় দেওয়া ঠিকানায় একটি খবর পাঠান রেজিস্ট্রি ডাকে, 'অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড' সহ। অথবা আপনি প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে আমার

প্রার্থনা মঞ্জুরের খবর দিন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সর্বত্রগামী নই, সর্বদ্রষ্টাও নই। তবু আমাদের সমিতির যে অতি সামান্য নেট-ওয়ার্ক আছে, তারই সাহায্যে খবরটা আমার কাছে আসবেই। তারপর প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের সামনেই পাঁচ অন্ধকে হাজির করব কলকাতায়। সর্বত্রগামী আপনি মাত্র একজনের দৃষ্টি দান করলেই আমার ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে।

আপনি যদি আমার ইচ্ছে পূরণ না করেন, তবে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যে; আপনি যেসব ঘটনা 'অলৌকিক' বলে দেখান সেগুলো নেহাতই কৌশলের দ্বারা ঘটিয়ে থাকেন। সত্য প্রকাশের ভয়ে আপনি পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছেন।

শুভেচ্ছা।
প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৩৪এ, শশীভূষণ দে স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০ ০১২

এর আগেও সত্য সাঁইবাবার 'বিভূতি' নিয়ে একটি সত্যানুসন্ধান চালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনও সহযোগিতা তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

সাঁইবাবার নামের সঙ্গে 'বিভূতি'র ব্যাপারটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সাঁইবাবা বললেই তাঁর অলৌকিক বিভূতির কথাই আগে মনে পড়ে। সাঁইবাবা অলৌকিক প্রভাবে তাঁর শূন্য হাতে সুগন্ধি পবিত্র ছাই বা বিভূতি সৃষ্টি করে ভক্তদের বিতরণ করেন। বছরের পর বছর মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভক্তেরা দেখে আসছেন সাঁইবাবার বিভূতি সৃষ্টির অলৌকিক লীলা।

১৯৮৪'র ১ মার্চ, ২ এপ্রিল, ২ মে ও ১ জুন সাঁইবাবাকে চারটে চিঠি দিই। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি চিঠিরও উত্তর পাইনি। আমার ইংরেজিতে লেখা প্রথম চিঠিটির বাংলা অনুবাদ এখানে দিলাম।

ভগবান শ্রীসত্যসাঁইবাবা	২৮৭ দমদম পার্ক
প্রশান্তিনিলায়ম	কলকাতা—৫৫
পুট্টাপরথি	পিন—৭০০ ০৫৫
জেলা—অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ	১.৩.১৯৮৪

প্রিয় সত্যসাঁইবাবা,

ভক্ত ও শিষ্য সংখ্যার বিচারে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়তম ধর্মগুরু। বিভিন্নপত্র-পত্রিকায় আপনার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সম্বন্ধে

অনেক কিছু পড়েছি এবং আপনার কিছু ভক্তের কাছে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। আপনার অলৌকিক খ্যাতি প্রধানত 'বিভূতি' সৃষ্টির জন্য। পড়েছি এবং শুনেছি যে, আপনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যে হাত নেড়ে 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করেন এবং কৃপা করে কিছু-কিছু ভাগ্যবান ভক্তদের তা দেন।

আমি অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। অলৌকিক কোনও ঘটনা বা অলৌকিক ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির বিষয় শুনলে আমি আমার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্যকে জানার চেষ্টা করি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একটিও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্য জানার প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতোই আশা করি আপনিও স্বাগত জানাবেন; সেই সঙ্গে এ-ও আশা করি যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আপনার পোশাক ও শরীর পরীক্ষা করার পর আপনি আমাকে শূন্যে হাত নেড়ে, 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করে দেখালে আমি অবশ্যই মেনে নেব যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং অলৌকিক বলে বাস্তবিকই কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে।

আপনি যদি আমার চিঠির উত্তর না দেন, অথবা যদি আপনার বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তবে অবশ্যই ধরে নেব যে, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যে এবং আপনি 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করেন কৌশলের দ্বারা, অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা নয়।

শুভেচ্ছান্তে
প্রবীর ঘোষ

সাঁইবাবাকে লেখা পরের চিঠিগুলোর বয়ান একই ছিল, তবে সেগুলোতে আগের যে যে তারিখে চিঠি দিয়েছিলাম এবং উত্তর পাইনি, সেই তারিখগুলোর উল্লেখ ছিল।

শূন্যে হাত নেড়ে ছাই বের করাটা ঠিকমতো পরিবেশে তেমনভাবে দেখাতে পারলে যুক্তিহীনদের কাছে অলৌকিক ক্ষমতা-প্রসূত মনে হতে পারে।

১৬.৪.৭৮ তারিখের 'সানডে' সাপ্তাহিকে জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র জানান তিনি সাঁইবাবার সামনে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে একটা রসগোল্লা নিয়ে আসেন। সাঁইবাবা এই ধরনের ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন।

ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কি না ঘোরতর সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ—এক: শ্রী সরকার যে ধরনের লাগাতার মিথ্যে বলেন স্টান্ট দিতে, তার পরিচয় একের

পর পাওয়ার পর এটাকে স্টান্ট বলেই মনে হয়। দুই : সত্য সাঁইবাবা স্বেচ্ছাসেবী দেহরক্ষীদের দ্বারা যে ভাবে সুরক্ষিত, তা একবার নিজের চোখে দেখে আসার পর শ্রীসরকারের দাবিকে আর একটি বাড়তি মিথ্যে 'স্টান্ট' বলেই মনে হয়। এমন মস্তানি করার সাহস শ্রী সরকার দেখাতে গেলে সত্য সাঁই ভয় পেয়ে চিৎকার করে পালাতেন না, শ্রী সরকারের প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকত; যেমনটা এর আগেও ঘটতে দেখেছি আমরা।

শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ছোটখাট কিছু নিয়ে আসা, এটা জাদুর ভাষায় পামিং। পামিং যেমন হাতের কৌশল, তেমনই আর একটা কৌশলকে জাদুর ভাষায় বলে 'লোড' নেওয়া। জাদুকর যখন শূন্য থেকে হাঁস-মুরগি-খরগোশ-ফুল-ফল-লাড্ডু ইত্যাদি বের করতে থাকে তখন অনেক ক্ষেত্রে এগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয় পোশাকের আড়ালে। প্রয়োজনের সময় এগুলোকে মুহূর্তে আড়াল থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে দর্শকদের চম্‌কে দেন জাদুকর।

যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য-সদস্যারা গ্রামে-গঞ্জে হরবখত এমনি বিভূতি তৈরি করে দেখাচ্ছেন। এ'ক্ষেত্রে আমরা দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করি।

এক : ছাই বেটে ছেঁকে মিহি করে তার সঙ্গে ঘন মাড় মিশিয়ে ছোট ছোট গোল গোল লাড্ডু তৈরি করি। ছাইয়ের লাড্ডু আটকে রাখি জামা, পাঞ্জাবি বা কোটের ভিতর দিকে। লাগিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা হয় এমন ভাবে, হাত একটু পোশাকের ভিতর দিয়ে হানা দিলেই নাগালে ছাইয়ের লাড্ডু। হাতের মুঠোয় একটা লাড্ডু মানেই একটু চাপে অনেক ছাই। লাড্ডুতে একটু সেন্ট স্প্রে করে নিলে তো কথাই নেই! একেবারে সুগন্ধী বিভূতি।

দুই : যে বিভূতি বের করে দেখাবে, তার ডান বগলে বাঁধা থাকে রাবার বা নরম প্লাসটিক জাতীয় জিনিসের ছোটখাটো ব্লাডার। ব্লাডার ভর্তি করা থাকে সুগন্ধি ছাই। ব্লাডারের মুখ থেকে একটা সরু নল হাত বেয়ে সোজা নেমে আসে হাতের কব্জির কাছ বরাবর। পোশাকের তলায় ঢাকা পড়ে যায় ব্লাডার ও নল। এবার ছাই সৃষ্টি করার সময় ডান হাত দিয়ে বগলের তলায় বাঁধা ব্লাডারটায় প্রয়োজনীয় চাপ দিলেই নল বেয়ে হাতের মুঠোয় ছাই চলে আসবে। বাঁ হাত দিয়েও ছাই বের করতে চান? বাঁ বগলেও একটা ছাই-ভর্তি ব্লাডার ঝুলিয়ে নিন। দেখলেন তো, অবতার হওয়া কত সোজা!

সত্য সাঁইয়ের ছবি থেকে ঝরে যে বিভূতি

সত্য সাঁইবাবা সম্বন্ধে এও শুনেছি যে, অনেকের বাড়িতে রাখা সাঁইবাবার ছবি থেকে নাকি পবিত্র ছাই বা বিভূতি ঝরে পড়ে। গত শতকের আটের দশকের শেষ ভাগ থেকে ন'য়ের দশকের গোড়ায় কোলকাতায় জোর গুজব ছড়িয়ে দিল যে, অনেকের বাড়ির সাঁইবাবার ছবি থেকেই নাকি বিভূতি ঝরে পড়ছে। প্রতিটি

মিথ্যে গুজবের মতোই এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয়নি, ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁদের মুখেই এইসব গুজব শুনেছি তাঁদেরই চেপে ধরেছি। আমার জেরার উত্তরের প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে, তাঁরা নিজের চোখে বিভূতি ঝরে পড়তে দেখেননি। যাঁরা সত্যিই বাস্তবে ছবি থেকে বিভূতি পড়তে দেখেছেন, তাঁরা শতকরা হিসেবে সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা দেখেছেন ভক্তদের বাড়ির ছবি থেকে বিভূতি পড়তে বা ছবির তলায় বিভূতি জমা হয়ে থাকতে। এই বিভূতি বা ছাই সৃষ্টি হয়েছে দু'রকম ভাবে। (১) কোন সাঁইবাবার ভক্ত অন্য সাঁই ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার মানসিকতায় সাঁইবাবার ছবির নিচে নিজেই সুগন্ধী ছাই ছড়িয়ে রাখে। (২) সাঁইবাবার ছবির কাচে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ছাইয়ের মতো ঝরে পড়তে থাকে।

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাঁইবাবার ওপর অনুসন্ধানের জন্য ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাম দেওয়া হয় Saibaba Exposure Committee। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার উপাচার্য ড: নরসিমাইয়া ছিলেন এই কমিটির উদ্যোক্তা। সাঁইবাবার সহযোগিতার অভাবে কমিটি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাতে ব্যর্থ হন।

শূন্য থেকে হিরের আংটি

মেয়েদের একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটা হিরের আংটি সৃষ্টি করে নাকি পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়েছিলেন। শূন্য থেকে হিরে সৃষ্টির ঘটনা একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে যে কোন জাদুকরই শূন্য থেকে আংটি এনে দিতে পারেন। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেই কি ওই জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হবে? শূন্য থেকে হাতি বা জিপ-কার সৃষ্টি করেন। জাদুকরদের এই সৃষ্টির মধ্যে থেকে কৌশল। সাধু-বাবাজিদের সৃষ্টির মধ্যে এই ধরনের কোনও কৌশল থাকলে চলবে না। কোনও বাবাজি যদি শূন্য থেকে এই ধরনের বড়-সড় মাপের কোনও কিছু সত্যিই সৃষ্টি করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে অলৌকিক বলে কিছু আছে, এবং তাবৎ বিশ্বের যুক্তিবাদীরাও আর এইসব নিয়ে কচ্‌কচানির মধ্যে না গিয়ে অলৌকিক বলে কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে নেবে।

এত কিছুর পরও কি মনে হয় সত্য সাঁই পূর্বজন্মে সির্দির সাঁই ছিলেন? মনে কি হয়—সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতাই তাঁর জাতিস্মরতার প্রমাণ? তবে বলি, সত্য সাঁই কোনও দিনই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার দাবি প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যেমন নেই কোনও অবতারেরই।

জাতিস্মর তদন্ত ১৩ : দলাই লামা

'দলাই লামা' শূন্য থেকে সৃষ্টি হননি। একটু একটু করে তৈরি হয়েছেন। এখন যিনি 'দলাই লামা', তিনি চতুর্দশ দলাই লামা। প্রথম দলাই লামা'র সৃষ্টি জানতে আসুন আমরা একটু পিছনের দিকে তাকাই।

তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীতে। শুরুতে বৌদ্ধধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল রাজপরিবার ও কিছু উচ্চবর্ণের মধ্যে। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে তিব্বতে এলেন বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক অতীশ। অতীশই প্রথম বৌদ্ধ ভাবনাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।

তিব্বতের জনপ্রিয় ধর্মনেতা ৎসং থাপা'র নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা নিজেদের নিয়ে একটি নতুন সম্প্রদায় তৈরি করে, 'গোলুগপা'। গোলুগপা'রা সাধারণ ভাবে 'হলদে টুপি' নামে পরিচিত ছিল। ৎসং-এর জীবনকাল ১৩৫৭ থেকে ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ। তিনিই প্রথম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করে 'হলদে টুপি'র নেতৃত্বে আনার চেষ্টা করেন।

ৎসং থাপার মৃত্যুর পর 'হলদে টুপি' বা 'গোলুগপা'র ধর্মীয় নেতার পদে বসেন তাঁরই ভাই টুপ্পা গেড়ুন। টুপ্পার জন্ম ১৩৯৯ সালে। পণ্ডিত হিসেবে টুপ্পার খ্যাতি যেমন ছিল, তেমনই ছিল জনপ্রিয়তা। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন টুপ্পা তথাগত বুদ্ধের অবতার। (এই বৌদ্ধদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অবশ্য মনে করেন টুপ্পা ছিলেন অবলোকিতেশ্বরের অবতার, বুদ্ধের অবতার নন। অবলোকিতেশ্বর এক অর্ধনারীশ্বর, আধা তারা আধা শিবের রূপ)।

১৪৭৫ সালে টুপ্পা গেড়ুন মারা গেলেন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেছিলেন, তথাগত বুদ্ধ ভক্তের রক্ষার্থে ও পৃথিবীর কল্যাণে বারবার ওঁদের ধর্মগুরু রূপে জন্ম নেবেন। ফলে ওঁরা বিশ্বাস করলেন টুপ্পা আবার জন্ম নেবেন। এই বিশ্বাস থেকে খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা পেলেন গেড়ুনকে। গেড়ুনকে তুলে এনে করলেন 'গ্যাটসো' বা ধর্মগুরু।

গেড়ুন গ্যাটসো একদিন সময়ের কাছে হার মেনে মৃত্যুকে বরণ করলেন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধরা এ'বারও ধরে নিলেন, গেড়ুন গ্যাটসো তাঁদের ধর্মীয় নেতৃত্ব দিতে নবকলেবরে আবার জন্ম নেবেন। শুরু হলো খোঁজ। খুঁজে পেলেন শিশু সোনামকে। ওঁরা বিশ্বাস করলেন, গেড়ুনই জন্ম নিয়েছেন সোনাম রূপে।

সোনাম গ্যাটসো ছিলেন বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। ১৫৭৮ সালে সোনাম মঙ্গোলিয়া যান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। মঙ্গোলিয়ার রাজা আলতান খাঁ পরিবার ও অমাত্যবর্গসহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা আলতান খাঁ সোনামকে 'দলাই লামা' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'দলাই' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র'।

মজাটা হলো, সোনাম গ্যাটসো যদিও প্রথম 'দলাই লামা' উপাধি পান এবং 'দলাই লামা' নামে পরিচিত হন, কিন্তু এই 'দলাই লামা' উপাধি সোনামের দুই পূর্বসুরী ধর্মগুরু

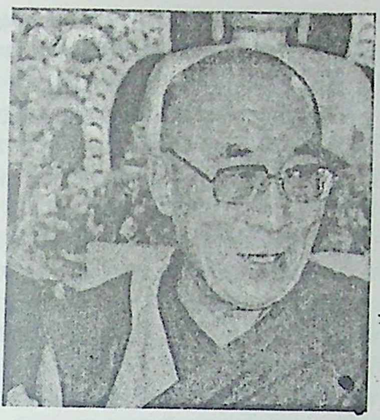

দলাই লামা

গেডুন গ্যাটসো এবং গেডুন টুপ্পার উপরও প্রযুক্ত হয়। সোনামের ইচ্ছেতেই প্রযুক্ত হয়। ফলে সোনাম হলেন তৃতীয় দলাই লামা। গোড়ায় দলাই লামারা ছিলেন গোলুগপা বা 'হলদে টুপি' ধর্মসম্প্রদায়েরই ধর্মপ্রধান। ১৬৬২ সালে তিব্বতের অধিপতি মঙ্গোলিয়ার রাজা গুরসি খাঁ অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের লামা বা ধর্মগুরুদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেই সময়কার দলাই লামাকে (পঞ্চম দলাই লামা) গোটা তিব্বদের প্রধান ধর্মগুরুর পদে বসান। পঞ্চম দলাই লামার নাম ছিল নাগাওয়া লোলজান।

১৯৬৫-তে রাজা গুরসি খাঁ মারা গেলেন। তাঁর বংশধরেরা রাজনীতি অতটা বুঝতেন না। সেই সুযোগে দলাই লামাই হয়ে উঠলেন তিব্বতের সর্বেসর্বা—কী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কী সামাজিক ক্ষেত্রে। এই ক্ষমতা ভোগ করে গেছেন ত্রয়োদশ দলাই লামা থুমটেন। থুমটেনের জন্ম ১৮৭৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩৩ সালে।

ত্রয়োদশ দলাই লামা দেহ রাখতেই তাঁর পুনর্জন্মের খোঁজ শুরু হয়ে গেল। এই খোঁজার পদ্ধতিটি বড়ই বিচিত্র। মৃত দলাই লামার দেহ 'পোটালা' ভঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখা হয়। 'পোটালা' ভঙ্গির অর্থ বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলোতে প্রচলিত আসনে উপবিষ্ট ভঙ্গি। কত দিন ধরে এই নির্বিকল্প সমাধিতে দালাই লামা থাকবেন, সেটা পুরোপুরি দলাই লামারই ইচ্ছাধীন (এখানকার বালক ব্রহ্মচারীর নির্বিকল্প সমাধির মতই ব্যাপার)। তারপর হঠাৎই একদিন দেখা যায় দলাই লামার মৃতদেহ পুব থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। এমনটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রাজজ্যোতিষীকে গণনা করে জানাতে বলা হয়, কোথায় বুদ্ধ-অবতার দলাই লামা এখন জন্ম নিয়েছেন, বা নিতে চলেছেন। রাজজ্যোতিষী ভর-গ্রস্ত হন। (তাঁর উপর কে ভর করে? মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের গোলমাল, না বদমাইসি? কে জানে? তিব্বতের

হতদরিদ্র সাধারণ মানুষ যখন রোগমুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে দলাই লামার শুকনো গু খেয়েছেন, তখন রাজজ্যোতিষী-রাজপরিবার-রাজঅনুগৃহীত ধনীরা অসুখ সারাতে গু ছেড়ে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়েছেন। এই দ্বিচারিতাই স্পষ্ট করে দেয় ওঁরা মুখে দলাই লামাকে বুদ্ধের অবতার বলে যতই শোরগোল তুলুক, নিজেরা কিন্তু সে'কথায় একটুও বিশ্বাস করেন না। কেন করেন না? সবচেয়ে দামী প্রশ্ন এটাই! কারণ ওঁরা জানেন, বুদ্ধের অবতারের পূনর্জন্মের ব্যাপারটা কী বিশাল রকম ভাঁওতা।)

ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যুর পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। অনুসন্ধান চলল দু'বছর ধরে। বহু শিশুকেই পরীক্ষা করে দেখা হলো। কারুকেই তেমন মনে ধরল না ধর্মের গুরুদের অর্থাৎ লামাদের। এই খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে যেহেতু বিশাল প্রভাব ও অর্থের প্রশ্ন জড়িত, তাই খুঁজে পাওয়াটা দর কষাকষির মধ্য দিয়ে এগোবে—এটাই স্বাভাবিক।

তিব্বতের মানুষদের মধ্যে বেশির ভাগই বিশ্বাস করেন 'চো-খোরগাই' হ্রদের জলের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের অনুরোধে রাজা বেরোলেন হ্রদের জলে আগামী দলাই লামার হদিস পেতে। তারপর লাসার রাজপ্রাসাদে ফিরে ঘোষণা করলেন, তিনি দেখতে পেয়েছেন দলাই লামা জন্মেছেন একটি কুঁড়েঘরে। হ্রদের জলে অলীক দর্শন না হলেও এ ছাড়া আর কী বা বলতে পারতেন প্রজাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চাওয়া রাজা! এমন দেখলে-টেখলে প্রজাদের কাছে রাজার সম্মান বাড়ে। রাজাও এক লাফে আধা-অবতার বনে যান।

অনুসন্ধানের কাজে নতুন উদ্দমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লামারা। বহু দলে বিভক্ত হয়ে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লেন ওঁরা। প্রত্যেক দলের সঙ্গেই একজন করে রাজকর্মচারী ও ত্রয়োদশ দলাই লামার ব্যবহৃত কিছু জিনিস।

একটি দল গিয়ে হাজির হলো চিনের চিখাইং প্রদেশের অমদোং জেলায়। প্রথম দলাই লামা'র দাদা এবং 'গোলুগপা' বা 'হলদে টুপি' ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ৎসং থাপা এখানেই জন্মেছিলেন।

এই জেলাতে পৌঁছে অনুসন্ধানকারীরা সেইসব পুরুষ শিশুদের পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, যাদের জন্ম ১৯৩৪ সালের পর।

এরই মধ্যে পাওয়া গেল একটি শিশুকে। গরিব কৃষক পরিবারের ছেলে। জন্ম ১৯৩৫-এর ৬ জুলাই। শিশুটি যে ত্রয়োদশ দলাই লামারই নবকলেবর, অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষা করার পর নাকি এ বিষয়ে অনুসন্ধানকারীরা প্রায় নিশ্চিত হলেন। সাংকেতিক লিপিতে এ'খবর পাঠালেন রাজধানী লাসায়। লাসা থেকে উত্তর এলো—তোমরা শিশুটির বাবার সঙ্গে কথা বলে ওদের আর্থিক দাবি-দাওয়া মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা কর—তবে খুবই গোপনে। একই সঙ্গে ওই অঞ্চলে তোমাদের

অনুসন্ধান কাজ প্রকাশ্যে চালিয়ে যাও। এতে শিশুটির বাবা ও পরিবার চাপে থাকবে এবং তোমাদের সঙ্গে টাকা-কড়ি লেনদেনের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। মিটে গেলে শিশুটি ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে রওনা দেবে লাসার উদ্দেশে। লাসায় আরও কিছু শিশু ও হাজির হবে ইতিমধ্যে। এঁদের ভিতর থেকেই আমরা খুঁজে নেব আমাদের চতুর্দশ দলাই লামা'কে।

শেষ পর্যন্ত চার লক্ষ চিনা মুদ্রায় রফা হল। এই মুদ্রা নিলেন শিশুটির পরিবার ও চিখাইং প্রদেশের শাসনকর্তা। তারপর ১৯৩৯ সালের গোড়ায় অনুসন্ধানকারীর দল শিশুটিকে ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে রাজধানী লাসার উদ্দেশে রওনা হলেন। এই দলে ছিলেন চারজন লামা, একজন সরকারি কর্মচারী ও তাদের ডজন দু'য়েক চাকর-বাকর।

তারপর এই শিশুই পেল রাজার স্বাক্ষর সম্বলিত সরকারি স্বীকৃতিপত্র—ইনিই চতুর্দশ দলাই লামা, তিব্বতের ভাগ্যনিয়ন্তা! ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারির নববর্ষে চতুর্দশ দলাই লামার অভিষেক হল। পরীক্ষকরা ইতিমধ্যে নাকি নানা ভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন ইনিই পূর্বজন্মের ত্রয়োদশ দলাই লামা থেকে প্রথম দলাই লাম পর্যন্ত সবই। ইনিই বারবার নবকলেবরে ফিরে এসেছেন তিব্বত-বাসীদের রক্ষ করতে, বিশ্ববাসীকে শান্তি দিতে।

চতুর্দশ দলাই লামাকে অভিষেকের সময় বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়; যেমন : 'অখন্ডজ্ঞানী', 'সর্বদুঃখের পরিত্রাতা', 'সর্বরোগের পরিত্রাতা' 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'সর্বোত্তম', 'পবিত্রতম', 'পরমকরুণাময়' ইত্যাদি। চতুর্দশ দলাই লামাও কিন্তু অতিমাত্রায় সচেষ্ট ছিলেন, যাতে জনগণ মনে করেন একই সঙ্গে বুদ্ধের অংশ ও অবলোকিতেশ্বরেরও অংশ। তাঁর মধ্যে এই দু'য়ের অংশের সহাবস্থানের কথা তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু তিনি কি বাস্তবিকই যা জনগণকে বিশ্বাস করাতে চাইতেন, তাতে আদৌ নিজে বিশ্বাস করতেন? তিনি সত্যিই কি নিজেকে তথাগত বুদ্ধ বলে বিশ্বাস করতেন? মনে করতেন অবলোকিতেশ্বর বলে?

এ'বিষয়ে যাচাই করার মত যে কিছু তথ্য আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি, আসুন সেগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

'সর্বরোগের পরিত্রাতা' দলাই লামা নিজের রোগমুক্তির জন্য আপন বিশ্বনিয়ন্ত্রক শক্তি প্রয়োগে বিরত থাকতেন। চিকিৎসার জন্য বিদেশেও দৌড়তেন। এই তথ্য প্রমাণ করে দলাই লামা জানতেন, বিশেষণগুলো নেহাতই বিশেষণমাত্র। বাস্তবে তাঁর ওইসব ক্ষমতা নেই।

সুখের চলছিল তিব্বতের মানুষদের বোকা বানিয়ে রেখে বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের ধর্মরাজ্য। গোলমাল পাকালো চিনের কমিউনিস্ট সরকার। তিব্বতে লামাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং রাজতন্ত্রের আলঙ্কারিক ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়ে

কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। ইউ.এন.ও মেনে নিয়েছে তিব্বত চিনের অংশ। ভারতও মেনে নিয়েছে—তিব্বত চিনেরই।

গত শতকের পাঁচে দশকে শেষ ভাগে সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারত। রাশিয়া তখন ভারতের অভিভাবক। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার চলছে জোর ঠান্ডাযুদ্ধ। রাশিয়ার কথায় ভারত নাক গলালো তিব্বতে। চিন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে লামাদের উৎসাহিত করলো। ১৯৫৯ সালে লামাদের বিদ্রোহ দমন করে চিন সরকার। দলাই লামা এক লক্ষের বেশি ভক্তদের নিয়ে চলে আসেন ভারতে। সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন ৮০ বস্তা রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রা। তখন ভগবানের বয়স ২৩ বছর।

'বিশ্বনিয়ন্তা' তিব্বতি জনগণের পরিত্রাতা কেন নিয়ন্ত্রণ হারালেন তাঁর লীলাক্ষেত্র তিব্বতের উপর থেকে? দলাই লামার এই পালিয়ে আসা কি প্রমাণ করে না যে, তিনি এতদিন ভগবান সেজে তিব্বতবাসীদের প্রতারিত করেছেন?

ভারতবাসীর ভাগাবেগকে উস্কে দিল মিডিয়াগুলো। আর মিডিয়াগুলোকে এই এই কাজে চালিত করতে সেই সময়কার ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। চিনের বিরুদ্ধে আমরা দেখলাম দেশবাসীদের গণউন্মাদনা। দিল্লির চিনা দূতাবাস থেকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিতে অবস্থিত কন্‌সোলে অফিসে আছড়ে পড়তে লাগাল এই বিক্ষোভ। বম্বের কন্‌সোলেট অফিসের দেওয়ালে সাঁটা মাও জে দং-এর পোস্টারে পচা ডিম ও পচা টমেটো ছুড়ে দলাই লামার প্রতি অদ্ভুত এক সমর্থন জানাল উন্মত্ত জনতা।

এক লক্ষ শরণার্থী-সহ দলাই লামাকে দেশের অতিথি হিসেবে ভারত গ্রহণ করল। অতিথিদের রাজার হালে রাখার দায়-দায়িত্ব নিল ভারত সরকার। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আজ পঞ্চাশ বছর হল বর্ধিত সংখ্যার তিব্বতিদের খরচ জুগিয়ে চলেছে ভারত সরকার। দলাই লামাকে ভারতে নির্বাসিত সরকার গঠনের অনুমতি দিলেন হেনরু। হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় তিব্বতের রাজধানী করে কাজ চালাচ্ছেন দলাই লামা।

'পঞ্চশীল চুক্তি' থেকে বেরিয়ে আসা ১৯৫৯ সালে নেহরুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আজ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর পক্ষেও এই চুক্তিকে মানি না বলাটা অসম্ভব।

রাশিয়ার কথায় নেচে নেহরু প্রচুর জল ঘোলা করলেন। ১৯৬২-তে চিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বুঝলেন, নিজের শক্তি-সামার্থ্য ঠিক মত পরিমাপ না করে রাশিয়ার ভরসায় যুদ্ধ করে খুব ভুল করেছেন। এই যুদ্ধ ছিল একতরফাভাবে ভারতীয় সেনাদের পশ্চাত অপসারণের ইতিহাস। দলাই লামাকে নিয়ে চিনকে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে সেদিন বিশাল মূল্য দিতে হয়েছিল ভারতকে। ২০০৮ সালে আমেকিার কথায় নেচে চিনের অর্থনীতিতে ধাক্কা দিতে গিয়ে আবার বিশাল মূল্য চুকাতে হবে না তো?

চিনের অর্থনীতি ধ্বংসে দাবার ঘুঁটি দলাই লামা

২০০৮ আগস্টে বসেছিল বেজিং অলিম্পিকের আসর। পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণময়, সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ খেলার আসর। আসর বসাতে সম্ভাব্য খরচ ভারতের মতো একটা দেশের সামগ্রিক সরকারি বাজেট।

আসর জমজমাট করে বসাতে পারলে টিভি প্রচার শর্ত থেকে এবং বিভিন্ন খাতে মোট সম্ভাব্য আয়, ব্যয়ের দেড়গুণ তো বটেই। কোনও কারণে অলিম্পিকের আসরকে যদি ভেস্তে দেওয়া যায়, বর্ণহীন করে দেওয়া যায় তবে চিনের অর্থনীতিতে একটা বিশাল ধাক্কা দেওয়া যায়। এজন্য প্রয়োজন একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে অলিম্পিক বয়কটকারী দেশের তালিকা দীর্ঘ করা। তার মধ্যে ক্রীড়াজগতের সুপারস্টার দেশগুলোকে এককাট্টা করতে পারলে চিনের অর্থনীতিকে পেড়ে ফেলা যায়। এই কাজে আমেরিকার দাবার ঘুঁটির ভূমিকায় নামলেন দলাই লামা।

প্রতিপক্ষ যখন আমেরিকা

প্রতিপক্ষ যদি আমেরিকা হয়, তবে চিনের পক্ষে টক্কর দেওয়া কঠিত হতে বাধ্য। চিন ক্রমশই অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে আমেরিকার অন্যতম প্রধা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ের চিনের তৈরি ইলেকট্রিকাল গুড্স বাজার দখল করেই চলেছে। এটা আমেরিকার মাথা ব্যথা ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বেজিং অলিম্পিকের দায়িত্ব চিন পাওয়ার পর আমেরিকা স্পষ্টতই বুঝে গেছে এই অলিম্পিক সাফল্যের মুখ দেখলে চিনের অর্থনীতি আরও শক্তি অর্জন করবে। ব্যর্থ হলে চিনের অর্থনীতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব, কিছু কর, করে দেখাও।

তিব্বতই তাস হতে পারে

"তিব্বত নিয়ে বিশ্ব জুড়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলে অলিম্পিককে কোণঠাসা কর" —এই নীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমেরিকা। উপযুক্ত দোসর হিসাবে ভারতকে পেয়ে গেল। কীভাবে কী করতে হবে, দলাই লামাকে বোঝাতে 'হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা'-য় এলেন ন্যান্সি পেলোসি। ন্যান্সি পেলোসি (Nancy Peolosi) হলে ইউনাইটেড স্টেটসের হাউজ স্পিকার। তিনি তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফরকালে ভারত সরকার ও 'জীবন্ত ভগবান', 'জন্মান্তরিত বুদ্ধ' দলাই লামার সঙ্গে কিছু গোপন মত বিনিময় করেন।

শুরু হয়ে গেল স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে পৃথিবী জুড়ে প্রচারমাধ্যমের রমরমা। নাড়া পড়ে গেল। অলিম্পিক থেকে নাম প্রত্যাহারের চিত্রনাট্য ও ক্ষেত্র তৈরি হল।

লড়াই স্বাধীনতার জন্য

লড়াইটা প্রধানত হচ্ছে ভারতে। বিশেষ করে দিল্লিতে। বড় বড় রঙিন পোস্টার, শরীরের বিভিন্ন অংশে ট্যাটু আঁকা, কপালে রুমাল বা স্বাধীন তিব্বতের পতাকা নিয়ে দিল্লির রাজপথে আন্দোলনে নেমেছেন ভারতে বসবাসকারী তিব্বতিরা। এঁরা

সবাই দলাই লামার ভক্ত-শিষ্য। এঁদের হিংস্রতা দেখতে দেখতে কারও যদি মনে হয়, এর বুদ্ধের বাণীতে অবিশ্বাসী কিছু ভাড়াটে আন্দোলনকারী—তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ওরা স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে একটু বেশিরকম সোচ্চার। ওরা সবাই কি তিব্বতি শরণার্থী? আমাদের দেশের অতিথি?

শরণার্থী, বিদেশি অতিথি হলে ভারতে 'বন্ধু দেশ' চিনের বিরুদ্ধে ওরা এমন সোচ্চার রাজনীতি করার অধিকার ও সাহস পায় কোথা থেকে? বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা আমাদের দেশের শরণার্থী ছিলেন এই বছর-ই। বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তসলিমাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন—বিদেশি মদ থেকে চিতল মাছের মুইঠা খেতে পারেন, কিন্তু কোনও রাজনীতি করতে যাবেন না।

আপনার ইচ্ছে মতো মানুষজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। আমরা অনুমতি দিলে তবেই আমাদের হাজির করা লোকটির সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

ভারত সরকার শরণার্থী নীতির ক্ষেত্রে এমন স্ববিরোধী কেন? ইউ. এস.-এর স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তবে কি ভারত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়েই দলাই লামার সঙ্গে তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার পরিকল্পনা করেছিলেন?

দলাই লামা আন্দোলনে জল ঢাললেন

তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন এদেশে জোরদার ভাবে চলছে, সিকিম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল ইত্যাদি অঞ্চল থেকে মঙ্গোলিয় চেহারার মানুষদের প্লেনে-ট্রেনে-বাসে হাজির করার কাজে প্রশাসন ব্যস্ত, ঠিক তখন বেয়াড়া, বেফাঁস কথা মিডিয়ার সামনে বারবার বলে গেলেন দলাই লামা। জানালেন, আমি তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেই। আমি চাই তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি পাক। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন চললে আমি পদত্যাগ করব।

খুব খারাপ লাগছে এটা ভাবতে যে তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের সর্বময়কর্তা ভগবান দলাই লামা জানেন না যে, তিব্বত চিনের একটি স্বশাসিত অঞ্চল। তিব্বত ছাড়াও চিনে আরও চারটি স্বশাসিত অঞ্চল আছে।

হে দলাই লামা, ওরফে ভগবান বুদ্ধ আপনি তো মিডিয়া বা ইন্টারনেটের সাহায্য না নিয়ে আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাতেই জেনে নিতে পারতেন স্বশাসন চালু থাকার খবরটা। কী কেলেঙ্কারি কান্ড! যুক্তিবাদী মানুষরা এরপর আপনার ভগবানত্ব নিয়ে টনাটানি না করেন!

তিব্বত এখন কেমন

তিব্বত এত দ্রুত পাল্টে গেছে যে মনে হয় গল্পকথা। স্কুল, কলেজ, আধুনিক হাসপাতাল, সিনেমা হল, শপিংমল—কী নেই! ঝাঁ চক্চকে তিব্বত দেখলে অবাক হতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নতির স্পষ্ট চিত্র তিব্বত জুড়ে। ট্রেন, প্লেন সবাই এখন তিব্বতের পিঠে জুড়ে দিয়েছে উন্নতির ডানা।

তিব্বতবাসীরা এখন আর অন্ধকার যুগের মানুষ নন। আলোকিত, উজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছ্বল মানুষ।

'পরমকরুণাময়' দলাই লামার সাধ্য নেই গোটা পৃথিবীর নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষদের করুণা করেও বঞ্চনামুক্ত করার। গোটা বিশ্বের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তিনি কি পেয়েছিলেন তিব্বতের জনগণের শোষণ মুক্তি ঘটাতে? না পারেননি। কারণ তিনি স্বয়ং এক আড়ম্বরপ্রিয়, ভোগসর্বস্ব এবং একই সঙ্গে বঞ্চনাকারী ও বঞ্চনাকারীদের হাতিয়ার। তিব্বতের জনগণের উন্নতি ঘটিয়েছেন চিন সরকার।

'এবার একটু 'অখণ্ডজ্ঞানী' দলাই লামার জ্ঞানের বহরের দিকে তাকানো যাক। ১৯৯৪ সালের ১২ অক্টোবর, বুধবার 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়।

এতদিন পর্যন্ত প্যারাসাইকোলজিস্টদের মাথাজাত কলমের মধ্য দিয়ে যে সব পুনর্জন্ম হয়েছে, সে সবই মানুষ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুদের চিন্তায় আমরা যেসব পুনর্জন্মের কথা পাই, সে'সব জায়গায় মনুষ্যেতর বিভিন্ন জীব রূপে জন্ম নেওয়ার কথা থাকলেও জড় রূপে জন্মের একটিও দৃষ্টান্ত মেলেনি। সেদিক থেকে দলাই লামা একটা দারুণ তত্ত্ব আমাদের জানালেন—জীব থেকে জড় পদার্থ হয়ে প্রাণীর জন্ম। অর্থাৎ প্রাণী প্রাণ নিয়ে জন্মালেও প্রাণ থাকবে না, জড় থাকবে। একেবারে দারুণ রকম অদ্ভুতুড়ে তত্ত্ব! কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ হয়, এই তত্ত্ব প্যারাসাইকোলজিস্টরা খাবেন কি না!

কিন্তু দলাই লামার এমনতর কথাই কি প্রমাণ করে না,

দলাই লামা পূর্বজন্মে কখনই তথাগত বুদ্ধ ছিলেন না! বুদ্ধ যদি পাথর হয়েই জন্মে থাকেন, তবে তো চতুর্দশ দলাই লামা হয়ে জন্মাননি!

হে চতুর্দশ দলাই লামা, আপনার প্রিয় ও বিশ্বস্তদের কাছ থেকে জেনেছি, আপনার একান্ত ইচ্ছে 'ইনস্টিটিউট অফ টিবোটিয়ান প্যারাসাইকোলজি' নামে একটা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের। এও জেনেছি এই ইনস্টিটিউট কাজ করবে আপনারই নেতৃত্বে এবং আপনারই পরামর্শে। ইনস্টিটিউট কাজ শুরু করলে ব্যাপারটা দারুণ জমবে। এতাবৎকালের প্যারাসাইকোলজিস্টদের সঙ্গে আপনার মতাবলম্বী প্যারাসাইকোল-জিস্টদের দস্তুরমত ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যাবে।

মজাটা কি জানেন, প্যারাসাইকোলজিস্টদের হুদো-হুদো, গাদা-গাদা বইতে দেখতে পাবেন—দলাই লামাদের চোদ্দো জনই এক্কেবারে খাঁটি জাতিস্মর। নিক, এবার জাতিস্মরের হাতের মার সামলাক প্যারাসাইকোলজিস্টরা।

দলাই লামাকে স্বপ্নাদেশ

পাথরে পুনর্জন্ম নিয়েছেন বুদ্ধ

জগদীশ ভাট, ডিসেপা (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে) : প্রস্তরখণ্ডে পুনর্জন্ম নিয়েছেন বুদ্ধ! এক ঝটকায় অলীক কুসংস্কার ছাড়া কিছুই মনে হয় না। কিন্তু যখন স্বয়ং দলাই লামার কণ্ঠেও একই বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয় তখন বিষয়টি কৌতূহল জাগায়' বইকি।

ঘটনার সূত্রপাত মাস তিনেক আগে। কেলং থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে গোম্পাতে ভাষণ দিতে আসার কথা দলাই লামার। গোম্পার শতকরা নব্বুইজন মানুষই বৌদ্ধ। তাছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত-সহ বিদেশ থেকে বেশ কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আসার কথা রয়েছে। তাই আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে বানানো হচ্ছে বিশাল মঞ্চ। মঞ্চ তৈরির কাজ মসৃণভাবে এগোচ্ছিল। একদিন ঘটে গেল এক ঘটনা। মঞ্চ বানানোর জন্য আনা একটি পাথরকে কিছুতেই স্বস্থানে রাখা যাচ্ছিল না।

বিষয়টি নিয়ে সেখানকার মানুষ ততটা মাথা ঘামাননি। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ঘটল আসল চাঞ্চল্যকর বিষয়টি। গোম্পায় এসে দলাই লামা ঘোষণা করলেন, গতরাতে তিনি একটি রহস্যময় স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে গৌতম বুদ্ধ তাঁকে জানিয়েছেন তিনি জন্ম নিয়েছেন পাথর রূপে। সে কারণেই সিমেন্ট দিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা করেও সবাই ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি লামাকে নির্দেশ দেন, পাথরটিকে অবিলম্বে একটি পরিষ্কার জায়গায় স্থাপন করার জন্য।

ঘুম থেকে উঠেই দলাই লামা মঞ্চের কাছাকাছি গেলেন। পাথরটিকে সেখান থেকে তুলে এনে নিজের কক্ষে পরিচ্ছন্নভাবে রাখলেন দলাই লামা। এখন সেটিকে একটি মন্দির বানিয়ে স্থাপন করার তোড়জোড় চলছে।

জাতিস্মর তদন্ত ১৪ : সপার্ষদ রামকৃষ্ণ

> রামকৃষ্ণদেবের কথা সত্যি হলে, রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন
> সারদা মা'র কথা সত্যি হলে, রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন
> অন্নদাঠাকুরের কথা সত্যি হলে, রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন

শ্রীশ্রীসারদা মা স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী'কে বলেছিলেন, "ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলেছিলেন যে একশো বছর পরে আবার আসবেন। এই একশ বছর (রামকৃষ্ণদেবের তিরোধান ও আবার জন্মগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়) ভক্তহৃদয়ে থাকবেন।" [শ্রীশ্রীমায়ের কথা লেখক : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী, প্রকাশক : উদ্বোধন কার্য্যালয়, প্রথম প্রকাশ ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫৯]

আর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীসারদা মা বলেছেন, ঠাকুরের থাকবে "সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানা দাড়ি। বললেন, 'বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ্যে করবে, ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে'।"

"বর্ধমানের রাস্তা কেন?" প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, "এইদিকে দেশ (জন্মস্থান)।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃষ্ঠা-৩০১)

গ্রন্থটির প্রকাশক যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনেরই 'উদ্বোধন কার্য্যালয়' তাই স্বাভাবিক কারণেই রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ-ভক্ত ও রামকৃষ্ণ মিশন-ভক্তদের কাছে সারদা মা যে এ'কথাগুলো বলেছেন তা নিয়ে সামান্যতম সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়েছে ১৮৮৬ সালের ১৩ আগস্ট। সারদা মা'র কথা সত্যি বলে ধরলে রামকৃষ্ণদেব আবার জন্মেছেন ১৯৮৬ সালে। হয়তো বা ১৬ আগস্টই। অর্থাৎ নবকলেবরে রামকৃষ্ণদেবের বর্তমান বয়স ২২ বছর (এই গ্রন্থটির পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশকালে)।

আদ্যাপীঠের আদ্যামা'র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও আদ্যাশক্তি মহামায়ার পরম ভক্ত শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থে লিখছেন, "ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) প্রফুল্ল বদনে যেন আমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বললেন, 'অন্নদা! তুমি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য এরূপ কঠোর ভার বহন করতে প্রস্তুত, তখন বলি শোন; তোমার ভয় নেই। আমার দেহরক্ষার বত্রিশ বছর পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি। সেই দেহরক্ষার সত্তর বছর পরে আমি আবার যাব; এইভাবে আমি আরও এগারো বার অবতীর্ণ হব। যতদিন না বাংলার জনসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন আমায় এইভাবে যেতে হবে।" [স্বপ্নজীবন, অন্নদাঠাকুর প্রকাশক: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ, সুলভ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২২০]

শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের কথা সত্যি বলে ধরলে রামকৃষ্ণদেব জন্মেছেন ১৮৮৬+৩২ =১৯১৮ সালে। অর্থাৎ, বর্তমানে রামকৃষ্ণদেবের বয়স ৯০ বছর।

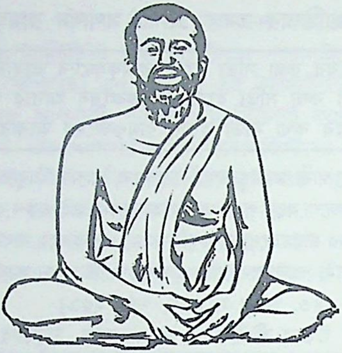

রামকৃষ্ণদেব

একটু মুশকিলে পড়েছি আমরা সব্বাই। শ্রীশ্রীসারদা মা আর শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর দু'জনেরই বিপুল সংখ্যক ভক্ত। দু'জনেই ভক্তদের কাছে 'সত্যের প্রতীক'। কিন্তু দু'জনের কথাই তো একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না! সারদা মা'র কথা সত্যি হলে রামকৃষ্ণদেবের বয়স এখন ২২ বছর। অন্নদাঠাকুরের কথা সত্যি হলে এখন বয়স ৯০ বছর।

যাই হোক, এ'জন্মে রামকৃষ্ণদেবের বর্তমান বয়স কত, এই বিতর্কে না গিয়ে আমরা শুধু এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি সারদা মা ও অন্নদাঠাকুরের কথা মত রামকৃষ্ণদেব নবকলেবরে এই বাংলায় জন্মেছেন। কিন্তু আমাকে যা বিস্মিত করেছে, তা হল—এত বছর হয়ে গেল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব জন্মালেন, তাঁকে খুঁজে বের করতে রামকৃষ্ণ মিশন উদ্যোগের কুটোটি পর্যন্ত কেন নাড়ল না? তবে কি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ রামকৃষ্ণদেবের কথায় বিশ্বাস করে না? তবে কি ওঁরা অন্নদাঠাকুরের কথায় বিশ্বাস করেন না? তবে কি 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থের লেখকের কথায় মিশন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন না? এমন নয় তো, জ্ঞানের নতুন, উন্মেষে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ আত্মার অমরত্বে এবং জন্মান্তরে আর বিশ্বাস করে না? যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলেই মনে করে থাকেন, তবে এখনও এমন লেখা কর্তৃপক্ষ ছেপে ও বিক্রি করে চলেছেন কেন? সারদা মা'র প্রতি রামকৃষ্ণদেবের এই ধরনের বক্তব্যকে বর্তমানে মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে অসার মনে হয়ে থাকলে মিশন কর্তৃপক্ষের কি নৈতিক দায়িত্ব ছিল না, এই বিষয়ে তাঁদের মতামত স্পষ্টভাবে ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করা? নাকি রামকৃষ্ণদেবের নবকলেবরে আবির্ভাব বিষয়ে নীরবতার পিছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অর্থ ও কর্তৃত্ব হারাবার শঙ্কা?

১৯৮৯-এর ২৭ আগস্ট আমি বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দের কাছে

উপরের প্রশ্নগুলোই তুলেছিলাম। উত্তর পাইনি। সম্ভবত উত্তর দেওয়ার মত কিছু ছিল না বলেই পরিবর্তে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন, এবং তাঁর সচিব আমার উপর উন্মত্তের মত ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, যুক্তির ঘাটতি মেটাতেই হাজির হয়েছিল উন্মত্ত ক্রোধ।

হায়! রামকৃষ্ণ মিশনের মহান আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ, এই প্রসঙ্গে আপনারা কোনওভাবেই নিজেদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলেন না। মিশন কর্তৃপক্ষ যদি বিশ্বাস করতেন রামকৃষ্ণ, সারদা ও অন্নদাঠাকুর সত্যভাষী, যদি বিশ্বাস করতেন জন্মান্তর সত্যিই সম্ভব, যদি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি একটুও আন্তরিকতা বা শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে ওরা স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ পালনের রাজসূয় যজ্ঞের চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্ব দিতেন রামকৃষ্ণকে সসম্মানে নিয়ে আসার প্রচেষ্টার উপর।

যাঁরা মনে করছেন বিবেকানন্দ অনেক বেশি যুগোপযোগী বলেই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে এ'বার এমন প্রমাণ হাজির করব, যা শুনলে বাক্যহারা হবেনই। স্বামী বিবেকানন্দও কিন্তু জন্ম নিয়েছেন এবং তা বর্ধমানেই। না, না, এ'সব আমার মত ভক্তিরস ও বিশ্বাসরসে বঞ্চিত মানুষের কথা নয়, এ'কথা বলেছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীসারদা মা এবং শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর। ওঁদের কথামত রামকৃষ্ণদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়েই জন্মেছেন। জন্মেছেন স্বয়ং সারদা মা'ও। রামকৃষ্ণদেব যখন সারদাকে বলছেন তিনি আবার জন্মাবেন তখন সারদা মা বলছেন, "আমি বললুম, 'আমি আসতে পারব না।' লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাক কাটা করলেও আর আসব না।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'যাবে কোথা? কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।" [শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃষ্ঠা ২৫৯] অন্নদাঠাকুর তার 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থেই লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেবের ১৮ জন ভক্ত ১২৮ অংশে আসবেন। তাঁর মধ্যে বিবেকানন্দ জন্মাবেন তিনটি অংশে। একটি ব্রাহ্মণ, একটি কায়স্থ, একটি বৈদ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে মিশন কর্তৃপক্ষের কি উচিত ছিল না, মৃত বিবেকানন্দের স্মৃতি নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ না করে জীবিত তিন বিবেকানন্দকে খুঁজে বের করে মিশনে নিয়ে আসা?

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেবের পুনরাবির্ভাব নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। যোগী যোগানন্দ সর্বতীর্থ বর্ধমানে একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ১০ জুলাই ১৯৮৭ সালে এক এফিডেফিট করে দাবি করেছেন, "যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লীলা সংবরণ করার পর পুনরায় নবকলেবরে সপার্ষদ একশত বৎসর গতে অবতীর্ণ হওয়ার বৃত্তান্ত আমি অপ্রাকৃতিক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাদের বর্তমান স্থূল শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বা সংস্থা গ্রহণ করলে আমি তাঁহাদের শনাক্ত করিতে সক্ষম, ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।"

শুধু এই এফিডেবিট করেই থেমে থাকেননি যোগী যোগানন্দ। তিনি যে বাস্তবিকই সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেছেন, তাঁর এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি পাঠালেন রামকৃষ্ণ মিশনের গম্ভীরানন্দজীকে, 'ইসকন'-এর সেক্রেটারিকে এবং তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে।

মৌনী যোগী যোগানন্দ সর্বতীর্থ ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় বেশ প্রচার পেয়েছেন তান্ত্রিক হিসেবে। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা চালাচালি হয়েছে। অর্থাৎ, আমি কথা বলেছি মুখে, যোগানন্দ লিখে।

যোগী যোগানন্দের কথায়, ১৯৮৫ সালে হিমালয়ে থাকাকালীন তিনি দৈব আদেশ পান, এবং তার শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা অনুসারেই তিনি আদালতে এফিডেবিটের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের সপার্ষদ জন্মগ্রহণ করেছেন।

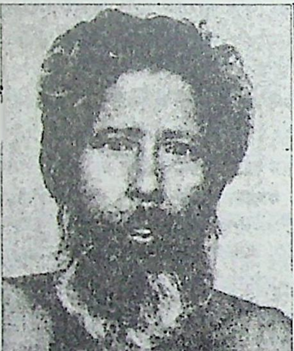

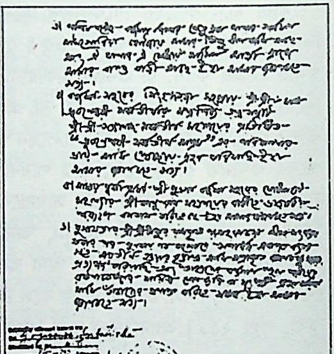

যোগী যোগানন্দ ও কোর্টের এফিডেফিট

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সপার্ষদ মানে, তাঁরা সংখ্যায় কতজন?"

লিখে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর রামকৃষ্ণের আঠারো জন ঘনিষ্ঠ ভক্তই জন্মেছেন।"

অন্নদাঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, "আমার গতবারের আঠারো জন ভক্ত এক'শ আঠাশটি শরীর চালনা করে তোমার কাজের সহায়তা করতে আবার বাংলায় যাচ্ছে"। সারদা মা'ও একই কথা বলেছেন, সে নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

যোগানন্দের কথায়, তিনি গতজন্মে ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত স্বামী

অদ্ভুতানন্দ। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব চার অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিবেকানন্দ তিন অংশে।

অর্থাৎ বিভক্ত হওয়ার একটা নতুন তত্ত্ব আমরা এই আলোচনা থেকে পেলাম। তেমনই জানতে পারলাম রামকৃষ্ণ এ'বার জন্মেছেন চার ভাগে বিভক্ত হয়ে। বিবেকানন্দ জন্মেছেন তিনজন হয়ে।

যোগানন্দ আমাকে লিখিতভাবে বাড়তি জানালেন, তিনি তাঁর জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছেন, আমার (প্রবীর ঘোষের) এই বর্তমান জীবনের আগে আরও দুটি মনুষ্য জীবন আমি লাভ করেছিলাম। প্রথম জন্মে ছিলাম মহাকবি কালিদাস, দ্বিতীয় জন্মে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এমন রোমাঞ্চকর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জেনেও পুলকিত হলাম না দেখে তিনি দুঃখিত হলেন।

দুঃখ রামকৃষ্ণ মিশনও তাঁকে কম দেয়নি। তারই ফলশ্রুতিতে যোগী যোগানন্দ লিখলেন, "বিনীতভাবে জানাই হিন্দু-ধর্মের শাশ্বত অনুশাসন 'ব্রহ্ম বাক্য নিষ্ফল হবে না' কি মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম যদি না হয় তাহা হইলে হিন্দুধর্ম শাস্ত্র ও রামকৃষ্ণ তত্ত্ব মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে।"...

..."গুরু-ভাইবোন ও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে আবেদন, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করুন রামকৃষ্ণ তত্ত্বের সত্যতা যাচাই-এর জন্য।"

যোগানন্দ কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে—আমি যেন যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে এই বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে নামি।

যোগানন্দের গুরুভাই তান্ত্রিক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যও একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অফ কালচার-এর সম্পাদক, আদ্যাপীঠের সম্পাদক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ-সম্পাদককে চিঠি দিয়ে সপার্ষদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে খুঁজে বের করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার অনুরোধ জানান; আর একদিকে এ বিষয়টিকে নিয়ে সত্যানুসন্ধানের কাজে এগিয়ে আসতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিকে অনুরোধ জানান।

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য বামাখ্যাপার গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুন্ডির আসনে বসেই আমরণ তাঁর তন্ত্র-সাধনা চালিয়ে গেছেন সঙ্গে সপার্ষদ রামকৃষ্ণ খোঁজার সাধনা।

বর্ধমান জেলার আর এক নামী যোগী তিমিরবরণ রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির কাছে এক লিখিত আবেদন রাখেন। আবেদনে তিমিরবরণের স্বাক্ষরের তারিখ ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৭। আবেদনটিতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন, *"হিন্দু ধর্মের আর একটি চিরস্থায়ী সত্য ব্রহ্মবাক্য। অর্থাৎ যে মানুষ ব্রহ্মকে জানিয়েছেন, তাঁহার বাক্য বা শপথ কোন দিনই মিথ্যা হয় না। এমতাবস্থায় হিন্দুধর্মের সর্বশেষ অবতার পুরুষ "ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের" বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা এবং তাহার মূল্যায়ন*

সাপেক্ষ হিন্দু ধর্মের "আত্মা তত্ত্ব" বা "জন্মান্তরবাদ"-এর সত্যতা পরীক্ষার সুযোগ বিশ্ববাসীর বিচারশালায় বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছে।

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে কিছু লিখে যাননি। তাঁহার নিঃসৃত বিভিন্ন বাণী তৎকালীন তাঁহার পার্শ্বচররা যাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির গুরুত্ব বিচারে সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ঠাকুর রামকৃষ্ণ আজ বিশ্ববক্ষে স্বীকৃত একজন মহাপুরুষ। সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি একশত (১০০) বৎসর বাদে পৃথিবীতে পুনরায় আসিবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা মাতা আরও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া গিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল বেশে বর্দ্ধমানের রাস্তা দিয়া যাইবেন এবং সপার্ষদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করিয়াছেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট।

"অপর জায়গায় জানা যায়; ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন, "তাঁর মৃত্যুর পর যেদিন পঞ্চবটীর ডাল ভেঙে আসনে পড়বে সেদিন জানবি আমি জন্মেছি।"

"শোনা যায় এই পঞ্চবটীর ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছিল আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি (৬৫) বৎসর আগে। এমত অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ হইলে তাহার বাক্য নিষ্ফল হইতে পারে না।"

"পঞ্চবটীর ডাল ভাঙিয়া পড়িল; শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সম্বরণ করার সময়কালও একশত বৎসর অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের পুনরাগমন তত্ত্বের উপর কোনও হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কোন রূপ ভ্রূক্ষেপ নাই। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুনরাবির্ভাবের যদি মূল্যায়ণ না হয়, তবে সমালোচনার খাতিরে বলিতে হইবে যে, "হয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ তত্ত্ব মিথ্যা! নয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের এমন কোনও আধিকারিক দিব্য চক্ষুর অধিকারী হইতে সমর্থ হন নাই, যাহার সাহায্যে তাঁহারা ঠাকুরের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন! অথবা হয়ত তাহারা সকল কিছু জ্ঞাত থাকিয়াই গদীর মোহে আকৃষ্ট থাকিবার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরকে লোক সমক্ষে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন না।"

"ঠাকুর রামকৃষ্ণের বক্তব্যের সত্যতা রক্ষা করার দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সমাজের। কিন্তু গত ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসরের মধ্যে তাঁহারা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই, তাই সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ ও সমস্ত শ্রদ্ধাভাজন গুরু শ্রেণীর নিকট আবেদন, হিন্দু ধর্ম্মকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদের যোগশক্তি দ্বারা প্রমাণ করুন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব। আর সেই সঙ্গে সকল হিন্দুর কাছে আবেদন রাখছি, তাঁরা সমভাবে ভাবাপন্ন হইয়া চাপ সৃষ্টি করুন রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের উপর, ঠাকুরের পুনরাবির্ভাবের মূল্যায়ণের জন্য। নতুবা হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইবে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ মিথ্যাবাদী রূপে পরিগণিত হইবেন।"

যোগী তিমিরবরণ তাঁর এই আবেদনে যে পঞ্চবটী'র ডাল ভাঙার সঙ্গে রামকৃষ্ণের পুনর্জন্মকে সম্পর্কীত করেছেন, সে বিষয়ে নজর দিতে আমরা এ'বার

ফিরে তাকাব অন্নদাঠাকুরের লেখা 'স্বপ্নজীবন' বইটির ২২৩ পৃষ্ঠায়। সেখানে আছে অন্নদাঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম নিয়ে কথোপকথনের কিছু অংশ।

অন্নদাঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলছেন, "আপনি আবার আস্‌ছেন। তার কোন প্রমাণ আমরা পাব কি?"

'হ্যাঁ, তার একটা ছোট খাট প্রমাণ আমি বলে দিচ্ছি; শোন—দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বাঁধান সিদ্ধাসনের উপর দিয়ে যে একটি বড় ডাল পড়ে আছে, বাংলায় আমার পুনরাবির্ভাব হওয়ার পর; সেই ডালটি মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার আসন মুক্ত করে দেবে।"

রামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত শিষ্যদের পুনর্জন্ম নিয়ে সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে যাওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ল। বর্ধমান গেলাম ১৯৮৯-এর আগস্টে। এখানে পেলাম দুই ব্যক্তিকে, যাঁদের দাবি, তাঁরা পূর্বজন্মে রামকৃষ্ণ ছিলেন। কথা বলেছি পূর্বজন্মে স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা মা ও নটী-বিনোদিনী ছিলেন—এমন দাবিদারদের সঙ্গে। আসুন, তাঁদের কথা আপনাদের শোনাই।

ভোলানাথ অধিকারী। তখন থাকতেন বর্ধমান শহরের 'বাইলা পাড়া'য়। জন্ম ১৯৩৪ সালে। মাঝারি উচ্চতা। না রোগা, না মোটা। গায়ের রঙও মাঝারি; না

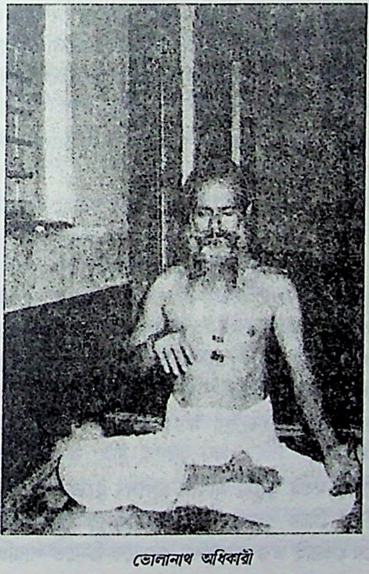

ভোলানাথ অধিকারী

ফর্সা, না কালো। কাঁচা-পাকা একমুখ গোঁফ-দাড়ি। মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। পরনে আধ-ময়লা সাদা ধুতি ও সুতির পাঞ্জাবি। কথায়—গ্রাম্য-ছোঁয়া, একটা আলা-ভোলা ভাব।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে ভোলানাথ জানালেন, "রামকৃষ্ণই যে রামকৃষ্ণ, সেটা আবার রামকৃষ্ণকে প্রমাণ করতে হবে? ভারি মজার তো! রামকৃষ্ণ মিশন! আমার নামে মিশন! ওরা তো সব মরছে গু ঘেঁটে। মরুক ওরা ক্ষমতা আর ভোগ নিয়েই। আমাকে নিয়ে গেলে ওদের সব এক একটাকে..."

এক একটাকে কী করবেন, সেটা ছাপার অযোগ্য ভাষায় বললেন ভোলানাথ।

ভোলানাথ অধিকারী আরও একটি নতুন তথ্য দিলেন। জানালেন রামকৃষ্ণের আত্মার চার অংশের এক অংশ যেমন তাঁর এই স্থূল শরীরে অবস্থান করছে, তেমনই এই শরীরেই রয়েছে সাধক বামাখ্যাপা'র আত্মা। সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী তিনি। সংসারের ঘানি টানছেন, কিন্তু মন পড়ে আছে মা'য়ের চরণে। বিয়ে করেছেন। তিন মেয়ে। দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রী সাধন-সঙ্গিনী। এ'জন্মে নতুন করে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারাপীঠের শ্রীমৎ তারাযোগী মণিবাবা'র কাছে। সংসার চালাতে গয়ের দোকান চালান। কাউকে প্রথাগত দীক্ষা দেননি। বললেন, "দীক্ষা আমি দেবার কে? আমার সঙ্গে বিভোর হয়ে নাম গান যে করে, 'তিনিই' তার দীক্ষা দেন। নাম গান বলতে—"জয় তারা জয় রাম/হরে কৃষ্ণ হরে রাম"।

আমার সঙ্গে কথা বলতেই ভোলানাথের ভাবসমাধি হলো। দু'হাতে রামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত মুদ্রা। মিনিট পাঁচ-সাত পরে সমাধি ভাঙতে বললেন, "গত জন্মের ভাব-সমাধির ব্যারামটা এ'জন্মেও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।"

—"মা'কে (কালী) চাক্ষুস কখনও দেখেছেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

—"এতো সব সময়ই দেখছি।"

—"সে তো মনের চোখে। এই যেমন আপনি আমাকে দেখছেন, সেভাবে কখনও দেখেছেন।"

—"হ্যাঁ, তাও একবার দেখা গিয়েছিল বেটিকে।"

—"ঘটনাটা যদি একটু বলেন।"

—"সে বছর কয়েক আগের কথা। গেছি মাছের বাজারে। হঠাৎ এক মেছুনির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। আরে! এ'তো মেছুনির বেশে মা।"

—"দেখতে কেমন, মনে আছে?"

—"যুবতী সাঁওতাল মেয়েছেলের মত।"

—"তারপর কি হল?"

—"বাচ্চা ছেলের মতই দুষ্টুমী মাথায় চাপল। ইচ্ছে হল, মায়ের দুধ খাব। মা'য়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললাম—'মা তুই অসুর কাটা ছেড়ে মাছ কাটতে বসেছিস?' আমি যে তোরই ভক্ত রামকৃষ্ণ, আমাকে চিনতে পারছিস না। আমাকে

তোর কোলে নে মা।' বেটী তো রসিক কম না। বললো এই বয়সে আমার কোলে চেপে করবি কি?' টপ্ করে বলে ফেললাম, 'তোর মাই খাব'। মা'র পরনে তো, ব্লাউজ ছিল না, বুকের কাপড়টা সরিয়ে মাইটা বার করে বলল, 'নে খা'। আমিও দু'হাতে মাইটা ধরে খেতে লাগলাম।"

ভোলানাথ তাঁর পাশে বসা সাধন-সঙ্গিনী স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে অদ্ভুত রকম লালা-ঝরানো হাসি হেসে বললেন, "বাজার ভর্তি লোক তখন আমাদের লীলা দেখছিল।"

ভোলানাথের এমনতর ব্যবহারকে কী চোখে দেখবেন প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা? শিশুর সারল্য? বদমাইসি? নাকি পাগলামো?

তান্ত্রিক ভোলানাথের চিন্তার যে ঝলক একটুক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত করেছিল তাঁর চরিত্রের একটি দিককে, তাকে আলোয় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বে-আব্রু করেছি।

নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। চেম্বার ছিল বর্ধমানের 'শাঁকারিপুকুর'-এ। দীর্ঘদেহী। এক সময় যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, বোঝা যায়। রামকৃষ্ণের মত দাড়ি-গোঁফ। জন্ম ১৯৪১ সালে।

নীলমণিবাবুর 'গোলহাট'-এর বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। ঘরে দারিদ্রের চিহ্ন প্রকট। একজন পাস করা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের এমন দরিদ্রতা কিছুটা অস্বাভাবিক। তবে কি চেম্বারে বসে না নিয়মিত? অনুমানটা মিলে গেল, যখন নীলমণিবাবু বললেন, "সংসার চালাতে প্রতিটি দিন চেম্বারে গিয়ে বসা,—ইচ্ছে করে না। সংসারের ঘানিতে কলুর বলদের জীবন, ভাল লাগে না। কিন্তু যে জন্য এ'জন্ম নেওয়া, সেকাজই বোধহয় অপূর্ণ থেকে যাবে।"

"এ'জন্ম নেওয়া মানে? আপনি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন, আপনার একটা গতজন্ম ছিল?" প্রশ্ন করেছিলাম।

আমার প্রশ্নে নীলমণিবাবু রাগ করলেন না। বরং বড় করে হেসে বললেন, "এ'তো সেই ধরনের প্রশ্ন হয়ে গেল—আপনার কি জন্মদাতা বাবা ছিল? আমি যে গতজন্মে রামকৃষ্ণ ছিলাম এ'কথা প্রমাণ করে দিতে পারি। নিয়ে আসুন রামকৃষ্ণ মিশনের মাথাদের, যারা আমার নাম ভাঙিয়ে দিব্বি করে-কম্মে খাচ্ছে। ওইসব ক্ষমতালোভী, অর্থলোভীগুলোকে বিশ্বাস করি না। ওরা কখনোই আসবে না। আমি, বিবেকানন্দ, সারদা—রামকৃষ্ণ মিশনের মাথার চূড়োয় বসলে ওরা যে চূড়ো থেকে গড়াতে শুরু করবে। চূড়ো ছোট্ট জায়গা তো, বেশি লোক আঁটবে কী করে? নিজেদের অবস্থান অটুট রাখতে চাইলে আমাদের খুঁজে নেয় কখনো ওরা। রাজীব গান্ধী, প্রণব মুখার্জি, সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা নারায়ণ চৌধুরীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আপনারা সত্যিই রামকৃষ্ণভক্ত হলে একবার

আসুন। প্রমাণ করে দেব—আমি গত জন্মে রামকৃষ্ণ ছিলাম।"

"কী করে প্রমাণ করবেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এই বাড়ির নিচে ছ'ফুট খুঁড়লে পাওয়া যাবে একটা শিব মন্দিরের চুড়ো। মন্দিরের ভিতরে আছে এক বিশাল শিবলিঙ্গ, লিঙ্গটি বিচিত্র। মাথায় রয়েছে তিনটি ছিদ্র। মন্দিরে আছে মোহর ভর্তি ছ'টা সোনার ঘড়া। ঘড়াগুলি চেন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। মন্দিরে রয়েছে বহু সোনার পাত। পাতগুলোতে রয়েছে বহু বাণী ও ভবিষ্যৎবাণী। বাণীর ভাষা হিব্রু ও সংস্কৃত। এমনই একটা পাতে রয়েছে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের ঠিক আজকের দিনটিতেই এখানে সত্যানুসন্ধানের কাজে আসার ভবিষ্যদ্বাণী। আর একটি পাতে লেখা আছে—নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যয়ই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। এরচেয়ে বড় আর কী প্রমাণ চাই? এমনি বহু সোনার পাতে লেখা আছে চার হাজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু ঘটনার আগাম হদিস।

নীলমণিবাবু হাতে গরম প্রমাণ পেতে আমাকেই খোঁড়াখুঁড়ির দায়িত্বটা নিতে বললেন। আমি অবশ্য ও কাজটা রামকৃষ্ণ মিশনের জন্যেই ছেড়ে এসেছি। সাত ঘড়া সোনার হদিস নিয়ে বসে থাকা এ'জন্মের রামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলাম, "ফিরে গিয়ে আপনার কথা জানাব রামকৃষ্ণ মিশনকে। ওঁরাই এসে খুঁজে দেখুন, এবং আপনার কথা সত্যি হলে সাত ঘড়া সোনা আর আপনাকে নিয়ে যাবে পরম সমাদরে। কিন্তু আপনি এ'সব কথা জানলেন কী করে? নিজে খুঁড়ে দেখেছেন?"

'আত্মা' সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে জানালেন, আত্মা সর্বত্রগামী। ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ মাত্রই আপন আত্মার নিয়ন্তা। নীলমণিবাবুর আত্মা বহুবার গিয়েছিলেন মন্দিরের অভ্যন্তরে। একইভাবে তিনি তাঁর আত্মাকে বিভিন্ন সময়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরেও নিয়ে গিয়েছেন।

এ'জন্মেও সাধনা করেছেন তন্ত্র মতে, মুসলিম মতে ও খ্রিস্ট মতে। ঘরের দেওয়ালে তিনটি ফ্রেমে বাঁধাই ছবি। তিনটি ছবি তাঁরই। একটিতে তিনি মোম জ্বেলে খ্রিস্টের উপাসনায় রত। একটিতে তিনি মসজিদে নামাজরত। আর একটিতে তিনি মায়ের পুজোয় বিভোর। ঘরের দেওয়ালে পাদ্রির পোশাক, বাউলের পোশাক, নামাজের টুপি সবই সাজানো রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "গতজন্মের কোনও পার্ষদের খোঁজ পেয়েছেন ইতিমধ্যে?"

হাসলেন নীলমণিবাবু। বললেন, "কলমীর দল। একটা ধরে টানলেই সব এসে পড়বে। যাবে কোথায়? ওদের অনেকে তো আমার সংসারে এসে উঠেছে।"

সংসার বলতে বউ, তিন মেয়ে ও দু'ছেলে। জিজ্ঞেস করলাম, "এঁদের মধ্যে কে কে আপনার পার্ষদ ছিলেন?"

উত্তরে নীলমণিবাবু জানালেন, এ জন্মের বড় ছেলের কাছেই তিনি গতজন্মে ইসলাম ধর্ম মতে সাধনার পাঠ নিয়েছিলেন। ছোট ছেলে হল সঞ্জয় গান্ধী। সঞ্জয়

গান্ধীকেও এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীলমণিবাবু। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি সঞ্জয়। তাঁর এখানে আসার ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল। আর সেই ইচ্ছেই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। গতজন্মের স্ত্রী সারদা এ'বার জন্মেছেন কন্যা রূপে।

—"আর আপনার পত্নী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ও ছিল গতজন্মে নটী বিনোদিনী।" নীলমণিবাবু বললেন।

জিভের ডগায় যে প্রশ্ন সুড়সুড় করে এসে পড়েছিল, তাহলে, "গতজন্মে আপনি কি নটী বিনোদিনীকে দেখে পত্নী রূপে মনে মনে গভীরভাবে কামনা করেছিলেন? তারই ফলশ্রুতিতে কি বিনোদিনী এ জন্মে আপনার পত্নী, এবং তাঁর গর্ভে আপনার পাঁচটি সন্তান?"

সেদিন নীলমণিবাবুকে যে প্রশ্ন না করেই বেরিয়ে এসেছিলাম, যাঁরা নীলমণিবাবুর দাবিকে সত্য বলে মনে করেন, তাঁরা গবেষণা করে দেখতে পারেন। প্যারাসাইকোলজিস্টরা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন, যেহেতু তাঁরাও মৃত ব্যক্তির ইচ্ছে, অনিচ্ছের সঙ্গে পরবর্তী জন্মের অনেক কিছুকেই জুতে দেন।

ডাঃ হেমাঙ্গশঙ্কর উপাধ্যায়

ডাঃ হেমাঙ্গশঙ্কর উপাধ্যায়। থাকেন বর্ধমান শহরের শাঁখারীপুকুর, চণ্ডীতলায়। জন্ম ১৯২৮ সালে। মাঝারি উচ্চতা, আঁটো-সাঁটো চেহারা। গায়ের রঙ ফর্সা। টিপ্‌টপ্‌ থাকতে ভালবাসেন। চোখ আর হাসি, দুটিই ঝকঝকে। অনেকেই বলেন, উনি নাকি পূর্বজন্মে বিবেকানন্দ ছিলেন। সরকারি কর্মচারী যে ছিলেন, সে কথাও

জানালেন। অবসর নিয়েছেন '৮৫-তে। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত দৈব (!) চিকিৎসা করেন। সঙ্গে এ'নিয়ে গবেষণাও। এই বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কারক তিনি স্বয়ং। চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'ডিভাইনোথেরাপি'। এ এমনই এক সর্বরোগহর চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে ফুসকুড়ি থেকে এইডস সবই সারে।

কথায় এমনই মিষ্টি যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচ্‌খচ্ করছিল। অনর্গল সুন্দর বাচনভঙ্গিতে কথা বলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি কি নিজেকে বিবেকানন্দের অংশ বলে মনে করেন?"

হেমাঙ্গবাবু এক রহস্যময় হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রেখে উত্তর দিলেন, "কোনো কোনো লোক আমার সম্বন্ধে এ'কথা বলেন, জানি। এদের কথাকে সত্যি বা মিথ্যে কোনওটাই আমি বলছি না। আমি জানি, পূর্বজন্মে আমার পরিচয় কী ছিল। কিন্তু সে পরিচয় দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। যেদিন সময় আসবে, সেদিন আপনিই প্রস্ফুটিত হব।

"এখন আমি এই জীবনে জীবে প্রেমকেই ঈশ্বর সেবার প্রতীক করে নিয়েছি। ানুষের শরীর ও মনকে সমস্ত রোগ ও গ্লানি থেকে মুক্ত করতে যে 'ডিভাইন রিসার্চ ꠱নস্টিটিউট' তৈরি করেছি, সেই ইনস্টিটিউটও একদিন বিশ্বজয় সমাধা করবে।"

বলতে না চাওয়া মুখোশের আড়ালে ঠারে-ঠোরে হেমাঙ্গবাবু এ'কথাই বোঝাতে চাইছিলেন—তিনিই গতজন্মের বিবেকানন্দ।

'ডিভাইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট' দেখেছি। হেমাঙ্গবাবুর ছোটখাট পাকা বাড়িটির একটি ছোট্ট ঘরেই ইনস্টিটিউটের কাজ-কর্ম চলে। কাজ চালান একজনই। তিনি হলেন, ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর ডাঃ হেমাঙ্গশঙ্কর উপাধ্যায়।

বিবেকানন্দের পুনর্জন্ম কোথায়, কবে হয়েছে, সে নিয়ে একটা পাকা খবর দিয়েছেন বহু মানুষের চোখে 'শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী নেতা', 'সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছান যোগী', 'শ্রেষ্ঠ সাধক', 'অবতার', 'অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী' নিগূঢ়ানন্দ।

নিগূঢ়ানন্দ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ও যোগবলের সাহায্যে জানতে পেরেছেন, বিবেকানন্দ জন্মেছেন উত্তর কলকাতায়। বয়স : এই বইটির প্রথম প্রকাশকালে বছরখানেক।

আরও দুটি তথ্য নিগূঢ়ানন্দ আমাদের সামনে হাজির করেছেন। এক : স্বামী বিবেকানন্দের আত্মা এ জন্মেও পূর্বজন্মের কোনও সাদৃশ্য নিয়েই জন্মাবেন। দুই : এই অবক্ষয়ী ধরণীতে নতুন কোনও যুগ সৃষ্টিকারীর ভূমিকা নেবেন।

এ সবই নিগূঢ়ানন্দ লিখে প্রকাশ করেছেন তার 'জাতিস্মর' গ্রন্থের (প্রকাশক: নবপত্র, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪;) ১০৩ পৃষ্ঠায়।

এইসব পাকা খবর রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভক্তদের খুব কাজে

লাগতে পারে ভেবেই এখানে হাজির করলাম। মিশন এই খবরটি গ্রহণ করে বিবেকানন্দকে নিয়ে এসে সসম্মানে নেতৃত্বে বসাবেন, কী খবরটিকে 'ফালতু' বলে বর্জন করবেন, সেই শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী মিশনের বর্তমান নেতৃত্ব। বহু ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তদের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব আরও বহুগুণ বেশি হবার সম্ভাবনাই প্রবল। এইসব ভক্তিবাদে বিশ্বাসী, অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী মানুষদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য নীতিগতভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের উচিত নীরবতা ভঙ্গ করে স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের মতামত জানান। তাঁরা স্পষ্ট করে বলুন—নিগূঢ়ানন্দর কথা সত্যি? না, নিগূঢ়ানন্দ মিথ্যে বলে জনগণকে প্রতারণা করছেন? নিগূঢ়ানন্দ ভক্তদেরও উচিত, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় নীরবতার গূঢ় রহস্য জনগণের কাছে উন্মোচন করা।

৪ অক্টোবর, ১৯৯৪ মহালয়ার দিন কলকাতার কাছেই বালি রবীন্দ্রভবন-এ একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল 'প্রেক্ষণ' নামের একটি সংগঠন। আলোচনার শিরোনাম ছিল 'বিবেকানন্দের সমাজ চেতনা'। আলোচক ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের অধিক্ষক স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দ, বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে দুই বক্তা। আমার ভূমিকা ছিল, সভা পরিচালকের।

আলোচনা তুমুল জমজমাট হয়েছিল। এই আলোচনাসভা চলাকালীনই আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দ'কে। প্রশ্নটি করার আগে মার্জনা চেয়ে নিয়েছিলাম আমার জিজ্ঞাসা আলোচনার সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় সম্পর্কিত না হওয়ার কারণে। বলেছিলাম, "আজকে আমরা বিবেকানন্দকে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে নেমেছি, আপনার মত অনেকেই বোঝাচ্ছেন বর্তমান সমাজে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীতা। আপনারা গত বছর সেপ্টেম্বরেই বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা'র শতবর্ষ পালন করলেন কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে। আপনারা 'শ্রীশ্রী মায়ের কথা' বইতে ছাপছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা মা-সহ আরও অনেক রামকৃষ্ণ সঙ্গীদের আবার পৃথিবীতে জন্ম নেবার কথা। সে জন্ম নেবার সময় তো অতিক্রান্ত, আপনাদের বইয়ের কথা অনুসারেই অতিক্রান্ত। তবে কেন আপনারা তাঁদের খুঁজে বের করতে সর্বশক্তি দিয়ে সচেষ্ট হচ্ছেন না? অথচ এটাই তো হওয়া উচিত ছিল আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ। এমন স্বাভাবিক ও উচিত কাজে আপনাদের এই ধরনের অদ্ভুত ধরনের নীরবতা ও নিস্পৃহতা কেন? এর পিছনে দুটি মাত্র কারণ থাকতে পারে। (এক) আপনারা রামকৃষ্ণ, সারদা ও বিবেকানন্দের চিন্তা ও ভাবধারার প্রসারের কথা মুখে বললেও কাজে উল্টোটা চান। কোনও ভাবেই নিজেদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্ব হারাতে ইচ্ছুক নন। তাই শত ঠেলাতেও ওঁদের বর্তমান জন্মের আধারগুলোকে খুঁজে বের করতে এতই অনীহা।

"(দুই) আপনারা জানেন, 'আত্মা অবিনশ্বর'। এই সেকেলে চিন্তার স্থান হওয়া উচিত আঁস্তাকুড়ে। আপনারাই বলেন—আত্মা মনে চিন্তা। আপনারা জানেন মৃত্যুর পর চিন্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অর্থাৎ আত্মা নশ্বর। আপনারা জানেন, 'জন্মান্তরবাদ' আর 'অজ্ঞানতাবাদ' সমার্থক শব্দ। আপনারা মঠের নেতারা তাই জানেন রামকৃষ্ণ যতই উচ্চরবে ঘোষণা করুন, তিনি আবার সপার্ষদ জন্মাবেন—বাস্তবে কোনও দিনই তা সত্যিই হয়ে উঠবে না। অতএব সপার্ষদ রামকৃষ্ণকে খুঁজে বের করার চেষ্টাই নেহাতই পাগলামি।

"স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী, আপনি কি আপনাদের এই নীরবতার পিছনে এই দুটি বাইরে অন্য কোনও কারণ দর্শাবেন? অথবা বর্তমানে আপনারা নীরবতা ভঙ্গ করেছেন, এমন কোনও তথ্য দেবেন?"

স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী জবাব দিলেন। এবং বিচিত্র সেই জবাব। "আজকাল কত জায়গা থেকে কত কিছু ছেপে বেরোচ্ছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বইতে নাকি আছে রামকৃষ্ণ সপার্ষদ জন্ম নেবেন। কিন্তু এই বইটির প্রকাশক কারা? যে কেউ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বলে একটা বইতে যা খুশি তাই ছেপে দিলে আমাদের কী করার থাকতে পারে?"

তাঁর জবাব কেড়ে নিয়েই আমাকে বলতে হল, "আমি যে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বইতে রামকৃষ্ণদেবের সপার্ষদ আবার জন্ম নেবার কথা পড়েছি, সেই বইটির প্রকাশক কিন্তু আপনাদের রামকৃষ্ণ মিশনেরই প্রকাশন বিভাগ—উদ্বোধন কার্য্যালয়। এরপর নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আপনাদের এ বিষয়ে অনেক কিছুই করার আছে।"

স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী এমনতর কথার মুখে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। শ্রোতাদের সামনে প্রসঙ্গ চাপা দিতে বললেন, "ঠিক আছে। বিষয়টা আমার ঠিক জানা নেই। বইটা দেখে নেব। যেমনটা প্রবীরবাবু বললেন, তেমনটা লেখা থাকলে মিশনের তরফ থেকে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব, যাতে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।"

মাননীয় স্বামী অচ্যুৎআত্মানন্দজী, আমরা সকলেই (আমি, আমার সহযোদ্ধা, প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তরা) অধীর আগ্রহ নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পদক্ষেপ জানার অপেক্ষায় আছি। হয় আপনারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন—'আত্মার অবিনশ্বরতা বিষয়ক তত্ত্ব ও জাতিস্মর তত্ত্ব নেহাতই কল্পনা মাত্র, এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই।" নতুবা চিহ্নিত করুন সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেবকে।

আপনারা চিহ্নিত করলে আমরা যুক্তিবাদী সমিতি আবারও সত্যানুসন্ধানে নামব এবং ফাঁস করব ধর্মের নামে জাতিস্মরতার নামে জালিয়াতির এক চক্রান্তকে—চ্যালেঞ্জ রইল।

দুষ্টেরা বলেন, যুক্তিবাদী সমিতির ভয়েই নাকি সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেবকে চিহ্নিত করতে রামকৃষ্ণ মিশন সাহস করছে না। ভয়টা বুজরুকি ফাঁসের।

অধ্যায় : সাত

২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ

'অলৌকিক' ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষীদের প্রতি ২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ

আজ এই বইটি প্রকাশের দিন থেকে আমি প্রবীর ঘোষ, পিতা- মৃত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, নিবাস- ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৪ এই বইটির লেখক নিম্নলিখিত ঘোষণা রাখছি— বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাঁকে ২৫ লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

- **এই ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে :**

১। যোগের সাহায্যে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করার কোনও দাবিদার যদি আমার দেওয়া রোগীকে ১ বছরের মধ্যে রোগমুক্ত করতে পারেন।

২। যোগ পদ্ধতির সাহায্যে টাকে চুল গজিয়ে দিতে হবে।

৩। যোগের সাহায্যে পাখির মতো শূন্যে উড়ে দেখাতে হবে।

৪। যোগের সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে হবে।

৫। যোগের সাহায্যে জরাকে আটকে রাখতে হবে।

৬। যোগের সাহায্যে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দেখাতে হবে। *(ট্রেনে কাটা পড়েও বেঁচে থাকলে বেশ দেখার মতো ব্যাপার হবে।)*

৭। রেইকি ক্ষমতায় অথবা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার তরফ থেকে হাজির করা রোগীকে ১৮০ দিনের মধ্যে রোগমুক্ত করতে হবে। মৃত্যুর দায় পুরোপুরি বহন করতে হবে রেইকি মাস্টার বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে।

৮। অচল টেপ রেকর্ডারকে, রেডিওকে রেইকি ক্ষমতার দ্বারা বা অলৌকিক

উপায়ে সচল করতে হবে যেমনটা দাবি করে থাকেন কিছু রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার।

৯। 'ফেং-শুই'-এর অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে হবে।

১০। 'বাস্তুশাস্ত্র'-এর সাহায্যে লকআউট কারখানা খুলে লাভের মুখ দেখাতে হবে।

১১। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

১২। আমার তরফ থেকে হাজির করা ছবির মেয়েটিকে ১৮০ দিনের মধ্যে বশীকরণ করে প্রমাণ করতে হবে 'ফটো সম্মোহন'-এর অস্তিত্ব।

১৩। আমার দেওয়া কোনও ছেলে বা মেয়েকে 'সরস্বতী কবচ' দিয়ে বা অলৌকিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম করাতে হবে।

১৪। প্রজাপতি কবচে বা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

১৫। আমার তরফ থেকে হাজির করা মামলা জেতাতে হবে।

১৬। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীনাকে জননী করতে হবে। সন্তানহীনাকে হাজির করব আমি।

১৭। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে যৌন-অক্ষমকে যৌনক্ষমতা দিতে হবে।

১৮। আমার দেওয়া চারজন ভারতবিখ্যাত মানুষের মৃত্যু সময় আগাম ঘোষণা করতে হবে।

১৯। প্ল্যানচেটে আত্মা আনতে হবে।

২০। সাপের বিষ কোনও কুকুর বা ছাগলের শরীরে ঢুকিয়ে দেবার পর তাকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করতে হবে।

২১। বিষপাথরের বিষশোষণ ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

২২। কঞ্চি চালান, বাটি চালানের সাহায্যে চোর ধরে দিতে হবে।

২৩। থালা পড়ার সাহায্যে বিষ নামাতে হবে।

২৪। নখদর্পণ প্রমাণ করে চোর ধরে দিতে হবে।

২৫। চালপড়া খাইয়ে চোর ধরে দিতে হবে।

২৬। যোগবলে শূন্যে ভাসতে হবে।

২৭। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখতে হবে।

২৮। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হতে হবে।

২৯। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানতে হবে।

৩০। জলের ওপর হাঁটা।

৩১। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি তোলা যায়।

৩২। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৩৩। মন্ত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে হবে।

৩৪। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

৩৫। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

৩৬। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

- **চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে :**

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন, বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে, আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেইসঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য এগোতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবি প্রমাণ করতে না পারলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত এবং শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৮। পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন যোগী, রেইকি-গ্র্যান্ডমাস্টার, ফেং শুই বিশেষজ্ঞ, বাস্তুবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণিন ও উপাসনা-ধর্মের গুরুরা দাবি করেন। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে দাবি করেন। এরপর আপনাদের কাছে তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা দেখার অভিজ্ঞতা থাকলে জানান। সে'সব তালিকাভুক্ত করব পরবর্তী সংস্করণে।

বিশ শতকের শেষ লগ্নে এই অসাম্যের সমাজ-কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী 'সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাই', 'চিন্তার যুদ্ধ'—ইতিহাস অন্তত এ-কথাই বলে। সাম্যের সমাজ গড়ার আবশ্যিক শর্ত তাই পাল্টা চিন্তার যুদ্ধে নামা। এই যুদ্ধের আর এক নামই 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'—যে নামেই ডাকুন। চিন্তার যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যোদ্ধাদের স্পষ্ট ও গভীর ভাবে বুঝে নিতে হবে 'অসাম্যের সমাজ-কাঠামো' বা 'সিস্টেম'-এর নিয়ন্তা কে? কারাই বা নিয়ন্তার সহায়ক শক্তি? সমন্বয়কারী শক্তিই বা কী? চিরায়ত গ্রন্থ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর এই খণ্ডটিতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও 'মানবতাবাদী নারীবাদ'-এর প্রবক্তা প্রবীর ঘোষ 'সিস্টেম'কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন এই 'সিস্টেম'কে ভাঙার দিশা। 'সিস্টেম' নিয়ে এমন বিশ্লেষণী আলোচনা পৃথিবীর কোনও ভাষায় ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সে দিক থেকে এই রচনা অবশ্যই ঐতিহাসিক। গ্রন্থে এ-ছাড়াও আছে 'যুক্তিবাদ' প্রসঙ্গে আলোচনা। আছে 'অধ্যাত্মবাদ', 'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'পরলোক', 'পুনর্জন্ম'। বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্টদের দ্বারা উল্লিখিত প্রায় সবকটি তথাকথিত 'গুরুত্বপূর্ণ' কেস লেখক বিপুল অধ্যবসায় দ্বারা সত্যানুসন্ধান চালিয়ে রহস্য উন্মোচিত করেছেন। একই সঙ্গে উন্মোচিত করেছেন মিথ্যা প্রচারে ফুলিয়ে বিশাল বানান অধ্যাত্মবাদী নেতাদের মিথ্যাচার, অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে। 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী এই গ্রন্থ প্রকাশকে 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর পথে এক উল্লেখযোগ্য ও অনিবার্য পদক্ষেপ বলে মনে করে।